অবধূত ও তাঁর চব্বিশ গুরু

By Swami Samarpanananda
Transcribed and edited by Amit Ray Chaudhuri

প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি ভাগবতের দুটি অংশ, প্রথম অংশে আসে রাসলীলা, রাসলীলার এই অংশ ভাগবতের প্রাণ আর দ্বিতীয় অংশ হল এই একাদশ স্কন্ধ। স্বামী ভূতেশনন্দজী বলতেন একাদশ স্কন্ধ যেন ভাগবতের আত্মা। একাদশ স্কন্ধের আবার চব্বিশ গুরুর প্রসঙ্গ যেন আরও তার সারভূত। চব্বিশ গুরুর এই অধ্যায় খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। চব্বিশ গুরুর প্রসঙ্গের পুরোটাই আধ্যাত্মিক ব্যাপার কিন্তু অন্যান্য অনেক কিছু যেমন মনোবিজ্ঞানেরও অনেক কিছু এর মধ্যে মিশে আছে। এর যতটা আমরা জীবনে লাগাতে পারব ততটাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আর না লাগাতে পারলেও কোন অসুবিধা নেই, ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখা ভালো। এখানে অবধূতের নাম দত্তাত্রেয়। দত্তাত্রেয়কে অনেকেই ভগবানের অবতার রূপে গণ্য করেন, অনেকে তাঁকে সিদ্ধ যোগী মনে করেন। কিন্তু দত্তাত্রেয় শুকদেবরই মত কোন কিছুতে জড়িয়ে ছিলেন না। দত্তাত্রেয়র চব্বিশ জন গুরু ছিল। কথামৃতে প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর একাধিকবার অবধূতের চব্বিশ গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন। ঠাকুর বলছেন অবধূতের চব্বিশ জন গুরু ছিল, তার মধ্যে চিল ও মৌমাছিকেও গুরু করেছিলেন। এদের থেকে কি শিক্ষা পেয়েছিলেন সেটাও ঠাকুর বলছেন। চিল ও মৌমাছি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রচলিত কাহিনী ঠাকুর তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলেছেন যেগুলো অবধূতের চব্বিশ গুরুর কাহিনীতে একটু অন্য ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে অবধূতের কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটে অধ্যায়কে একত্রে বলা হয় *অবধূতোপাখ্যান*। যে কোন আধ্যাত্মিক পিপাসু ব্যক্তির কাছে অবধূতোপখ্যান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আসুন আমরা অবধূতের চব্বিশ গুরুর সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিই আর অবধূত তাঁর চব্বিশ গুরুর কাছে যা যা শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করি যাতে আমরাও আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে আরও পরিপুষ্ট করে চরম লক্ষ্য পথের যাত্রাকে তরান্বিত করতে পারি। অবধূতোপখ্যানের একটা প্রেক্ষাপট আছে। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই আমরা ধীরে ধীরে আলোচনাকে মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কথা শুনে বলছেন *প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ। সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ।।*১১/৭/১৯। যারা এই লোকের সম্বন্ধে, এখানে লোক মানে স্বর্গাদি লোকের কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যারা শুধু এই লোকের ব্যাপারে বিচার ও চিন্তা-ভাবনা করে। কি রকম চিন্তা-ভাবনা? এই জগৎটা কি? কোথা থেকে আর কীভাবেই বা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে? আমি কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? আমি এখানে কি করতে এসেছি আর কি করছি? এই ধরণের প্রশ্ন নিয়ে যারা বারবার চিন্তাভাবনা করতে থাকে তাদের কি হয়? *সমুদ্ধরন্তি*, তারা এই সংসারের জাল কেটে বেরিয়ে আসে। আচার্য শঙ্কর বলছেন *কস্ত্বং কোহং কুত আয়াতং কা মে জননী কো মে তাতঃ। ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্।।* তুমি কে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কে আমার জননী, কে আমার পিতা – এগুলোকে যদি বারবার চিন্তা করা হয় তখন ধীরে ধীরে জগতের প্রতি আসক্তিটা নাশ হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এই যে বলছেন *লোকতত্ত্ববিচক্ষণাৎ*, লোকতত্ত্বের বিচার, এই জগতে কি আছে এটাকে বিবেকশক্তি দিয়ে বিচার।

লোকতত্ত্বের বিচার শুধু যে বিবেকবান পুরুষরাই করছেন তা নয়, যারা ভোগের মধ্যে আছে, সিনেমার হিরো হিরোইন থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদরা সবাই লোকতত্ত্বের বিচার করছে। তারা বিচার করছে এই

জগৎটাই সত্য, যে করেই হোক, লোক ঠকিয়ে, চুরি করে, কায়দা করে, খুন জখম করিয়ে আমাকে উচ্চপদে পৌঁছে ক্ষমতা অর্জন করে জগৎকে ভোগ করতে হবে। একজন খুব নামকরা লোকসভার সদস্য কোন দুর্নীতিতে ধরা পরার পর পরিষ্কার বলছে 'আমরা যারা লোকসভার সদস্য হয়েছি কেউই রামকৃষ্ণ মিশন আর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী নই যে আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে দেশ সেবা করতে এসেছি। আমরা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি এর থেকে বেশী আমাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে নেই'। এদের কাছে পরিষ্কার আমি এই জগতে কেন এসেছি? লুটপাট করতে। কিন্তু জগতের বাস্তবিক সত্তাকে যদি চিন্তা করতে শুরু করে তখন জগতের সব কিছুর প্রতি তার আসক্তি কমতে শুরু করবে। তার আগে মণীষীরা বলবেন তোমার শরীর, মনের প্রতি তোমাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই দেহ যদি না থাকে তাহলে তো তুমি কিছুই করতে পারবে না। কিছু না করতে পারলে আধ্যাত্মিক সাধনা করবে কি করে! দেহকে সুস্থ সবল রাখতে হলে খাওয়া-দাওয়া চাই, বাসস্থান চাই। তার জন্য আবার অর্থ জোগাড় করতে হবে। অর্থের ব্যবস্থা করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে। বিয়ে করতেও কেউ বারণ করছে না। ঠাকুর বলছেন একটা দুটো সন্তানের পর স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনের মত থাকবে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। জগতে বেঁচে থাকার জন্য ন্যুনতম যেটুকু দরকার সেটুকু পর্যন্ত একটা সীমা টেনে দিতে হয়। কিন্তু যদি অশান্তি চাও তাহলে জগৎ সত্য বলে ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়।

উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে লোকতত্ত্বের কথা বলার পর বলছেন 'হে উদ্ধব! আমিই জগতের সব কিছুর স্রষ্টা। জগতে যা কিছু দেখছ সব কিছুর নির্মাতা আমি। কিন্তু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই একাগ্রচিত্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন'। মানুষ যদি চায় তাহলে যে কোন জিনিসকে একাগ্র চিত্তে চিন্তা করতে পারে আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুদ্ধি সম্পন্ন, যেটা অপ্রয়োজনীয় সেটা কচকচ করে কেটে সার জিনিসটাকে ধারণা করার ক্ষমতা। ঠাকুরও বলছেন মানুষ কি কম গা! সে ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলছেন 'হাতি এত বড় জীব কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারেনা'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে আর আমার যে বাস্তবিক স্বরূপ, যেটা মন বুদ্ধির পারে, সেই স্বরূপকেও তারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারে'।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন এই ব্যাপারে আমি তোমাকে প্রাচীন ইতিহাস থেকে একটা কাহিনী বলছি। আমাদের পরম্পরাতে এটাই খুব মজার ব্যাপার, নিজে যা বলার বলে দেওয়ার পরই বলছেন এই ব্যাপারে প্রাচীন কালের একটা আখ্যায়িকা আছে। অর্থাৎ আমি তোমাকে যা কিছুই বলি না কেন আমার বক্তব্যের পেছনে একটা বিশাল দীর্ঘ পরম্পরা আছে। শ্রীকৃষ্ণও এখানে প্রাচীন ইতিহাস থেকে অবধূত দত্তাত্রেয় আর রাজা যদুর মধ্যে যে সংলাপ হয়েছিল সেটাকে তুলে আনছেন।

যদু নামে এক রাজা ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণেরই পূর্বজ। রাজা যদু একজন খুব বড় ধর্মজ্ঞ ছিলেন। ভাগবতের সময়ে ধর্ম বলতে একসাথে অনেক কিছুকেই বোঝাত, ইদানিং কালে ধর্ম বলতে আমরা যেমন পূজা, অর্চনা বুঝি, তখনকার দিনে ধর্মের পরিধি আরও ব্যাপক ছিল। সেই ধর্মের একটা অঙ্গ ছিল নীতি জিনিসটাকে জানা। দত্তাত্রেয় নামে একজন বড় ঋষি ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা যদু নিজের রাজদরবারে বসে আছেন। রাজা যদু দেখছেন একজন পরম তেজস্বী সন্ন্যাসী রাজদরবারে প্রবেশ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ দত্তাত্রেয়র বর্ণনা দিয়ে বলছেন *অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্। কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ।*।১১/৭/২৫। সন্ন্যাসী মানেই পরম তেজস্বী, যেন জ্বলন্ত আগুন। তিনি তরুণ, বয়স খুব কম। সন্ন্যাসী বুড়ো হলে ঠিক যেন মানায় না, সন্ন্যাসী মানেই তরুণ। সাধুবাবা বা ঋষি যখন বলা হয় তখন বড় বড় লম্বা দাড়ি থাকবে। কিন্তু সন্ন্যাসীকে তরুণ দেখাতে হয়। তরুণ হবে, রাজকীয় চেহারা হবে আর সেই চেহারা সব সময় যেন আগুনের লেলিহান শিখার মত জ্বল জ্বল করছে। আচার্য শঙ্কর, স্বামীজী এনাদের বলা হয় আদর্শ সন্ন্যাসী। এখানে দত্তাত্রেয়কে বলা

হচ্ছে তিনি একজন ত্রিকালদর্শী তরুণ সন্ন্যাসী আর চেহারার মধ্যে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই, অকুতোভয়ে নির্ভিক ভাবে বিচরণ করছেন। আমাদের শাস্ত্রে কবি শব্দের অর্থ ক্রান্তদর্শী বা ত্রিকালদর্শী, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটেকেই একসাথে জানেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে জানা একমাত্র ভগবানই পারেন, ভগবান ছাড়া আর কেউ পারেন না। সেইজন্য ভগবানের আরেকটি নাম কবি। যে ঋষি এই জিনিসটা পারেন তাঁকেও ক্রান্তদর্শী বলা হয়। কোন ঋষিকে কবি বলা মানে তাঁকে উচ্চতম সম্মান দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে উচ্চ সম্মান আর হয় না। কিন্তু কোন তরুণকে যদি কবি বলা হয় তখন খুবই অবাক মনে হবে, একজন তরুণ সন্ন্যাসী কবি হবেন সম্ভবই নয়। স্বামীজী যখন আমেরিকায় গেলেন বা তার আগে যখন ভারতে পরিব্রাজক রূপে পরিব্রাজন করছেন সবাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে, এত কম বয়সে এত কিছু জানেন কি করে! একদিকে তরুণ আবার কবি, দুটোকে একসাথে মেলানো যায় না। দার্শনিকদের মধ্যেও তরুণ পাওয়া যায় না, আমরা তরুণ দার্শনিক এক শঙ্করাচার্যকেই জানি, দার্শনিকরা কেউ তরুণ হন না। দার্শনিক যে অর্থে নেওয়া হয় কবি সেই অর্থেই আসে। কবির একটা বড় গুণ হল বিচক্ষণ, ঈক্ষণ মানে দেখা, জিনিসটা যেমনটি তেমনটি দেখাই বিচক্ষণ, এটা একমাত্র কবি পারেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারাই মানুষ জ্ঞান লাভ করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে জ্ঞান হয় না। গীতা, উপনিষদে যা বলছেন সেটা হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, পরমার্থ জ্ঞান যেখানে আসে সেখানেও অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে। ঠাকুর যে জাগতিক উপমাগুলো আনছেন তাতেও অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে।

রাজা যদু দত্তাত্রেয়কে দেখে তাই চমকে উঠেছেন, তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করছেন – *কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্তুঃ সুবিশারদা। যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ।*/১১/৭/২৬। হে ব্রাহ্মন্! আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি কোন কাজে কর্মে লিপ্ত নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত সুনিপুণ বুদ্ধি কীভাবে অর্জন করেছেন। রাজা যদু দত্তাত্রেয় ঋষির সাথে দু-চারটে কথা বলেই বুঝে গেছেন ইনি কোন সামান্য সন্ন্যাসী নন। কারণ যদুও জানেন, কাজ কর্ম যে করেনি তার কখনই বুদ্ধি হবে না। এই কাজ কর্মের ব্যাপারটা আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের উপনিষদ বলছেন *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি*, তোমরা কাজ কর, গীতাতেও ভগবান বলছেন কাজ করতে, স্বামীজীও বলছেন কাজ করে যাও। মানুষ যখন কাজ করবে তখনই তার বুদ্ধি বিকশিত হতে শুরু হয়, কাজ না করলে বুদ্ধি খুলবেই না, বুদ্ধি না খুললে কোন দিন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে না। আমাদের ভারতবর্ষের এটাই বিরাট দুর্ভাগ্য, ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ, দেশের মানুষের কাছে সন্ন্যাসীরাই গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসীরা গুরু হওয়ার জন্য পুরো দেশ যেটা গৃহস্থের ধর্ম নয় সেই সন্ন্যাসীদের ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছে। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে পূর্ণ ত্যাগের কথা বলছেন, সেখানে তাঁরা এই কথাগুলো সন্ন্যাসীদের জন্য বলছেন। কিন্তু গৃহস্থরা ঐ কথাগুলোকে নিজেদের উপর নিয়ে নিয়েছে। ফলে পুরো দেশটা অধোগতিতে চলে গেছে। যদু এটাই বলছেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি তো কোন কাজ করেন না, কিন্তু এই বুদ্ধি আপনার কি করে হল, আর এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি সমগ্র জগৎ মণ্ডলে বিচরণ করছেন, সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন, সবারই সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। এই সুবিশারদ বুদ্ধি আপনি কোথা থেকে পেলেন?

বেলুড় মঠের একজন মহারাজ তাঁর সময়কার একজন সফলতম Chartered Accountant। মহারাজকে মঠের অডিট ও এ্যকাউন্টের কাজে অনেক জায়গায় যেতে হয়। কাজের সূত্রে অনেক এমবিএ পাশ করা ইয়ং ছেলেমেয়েদের কাছেও যেতে হয়। ইয়ং ছেলেমেয়েরা মনে করে নেড়া মাথা সন্ন্যাসী এদের আর কি বোঝাব, দুটো সন্ন্যাসীকে পেয়েছি, বেশ বোকা বানানো যাবে। কিন্তু একটু কথাবার্তার পর যখন এদেরই কোন মতামতকে তিনি খণ্ডন করে দিচ্ছেন এরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে। মঠের এই কাজ তিনি পঁচিশ বছর ধরে

করছেন আর তাঁর সমবয়সী বন্ধুরা বড় বড় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হয়ে রিটায়ার করে গেছেন। আর ইয়ং ছেলেরা এমবিএ পাশ করে এসে মনে করছে সন্ন্যাসীদের বোকা বানিয়ে বেরিয়ে যাব।

জি কে চেস্টারটন একজন খুব নামকরা লেখক ছিলেন। তাঁর একটা গল্পের চরিত্রের নাম ছিল ফাদার ব্রাউন। ফাদার ব্রাউন একজন ক্যাথলিক ফাদার, ছোট্টখাট্ট চেহারা, গায়ে কোন বল নেই। ফাদার ব্রাউন যত ক্রিমিনালদের ধরে বেড়ায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিমিনালরা ক্রাইম করার আগেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। ধীরে ধীরে ফাদার ব্রাউনের নামডাক হতে শুরু করল। ফাদার ব্রাউনের নাম শুনলেই ক্রিমিনালরা ভয়ে কাঁপতে থাকে, অথচ তাঁর শরীরে কোন শক্তিই নেই। ক্রিমিনালরা যখন সব ধরা পড়ে যাচ্ছে, পুলিশ এক এক করে সব কটাকে যখন জেলে পুরছে তখন তারা ফাদার ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করছে 'আপনি তো একজন খ্রীশ্চান ফাদার আপনি কি করে সব আগে থাকতেই বুঝতে পারেন, আপনার এত বুদ্ধি কি করে হল! একটা ক্রিমিনাল বদমাইশি করার আগেই পৌঁছে যাচ্ছেন, আপনি বুঝলেন কি করে যে সে এই কাজ করতে যাচ্ছে'? ফাদার ব্রাউন বলছেন 'আমি চার্চে বসে ওদের স্বীকারোক্তি শুনি'। মানুষ যখন কোন ভুল কাজ করে তখন ফাদারের কাছে স্বীকারোক্তি করে ফাদার আমি এই অন্যায় কাজ করেছি। চার্চে বসে ফাদার ব্রাউন ক্রিমিনালদের এত কনফেসানস্ শুনেছেন যে, ক্রিমিনালদের ব্যাপারে তিনি সব কিছুই জেনে গিয়েছিলেন। কোন্ ক্রিমিনাল কি করে, ক্রাইম কীভাবে হয় সব জেনে গিয়েছিলেন। সেইখান থেকে তিনি হয়ে গেলেন নিপুণ অপরাধ সমাধানকারী। তিনি কোন পুলিশের লোক নন, এখনও ফাদারের কাজ করে যাচ্ছেন।

রাজা যদু বলছেন 'আমরা তো সমাজে আছি, সমাজে নানা রকম কাজ করছি, আমরা সমাজের সব কিছু বুঝি। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়ে এত বুদ্ধি আপনি পেলেন কোথায়। সব ব্যাপারে আপনার সব কিছু জানা। মানুষ কাজের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে'। যে কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকে সে তো ঠাকুরের ভাষায় কুমড়ো কাটা বঠ্ঠাকুর। 'আর তাই না, *যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং*, আপনি বিদ্বান, আপনার চোখ মুখ বলছে আপনার সাংঘাতিক বিদ্যা আছে, তাও আপনি বাচ্চা ছেলের মত ঘুরে বেড়ান কেন'? সাধারণ ভাবে যেটা হয়ে থাকে, যাঁরা বিদ্বান তাঁরা চান লোকে আমাকে মানুক, জানুক, তার মধ্যে বিদ্যার অহঙ্কার থাকে। 'কিন্তু আপনি সন্ন্যাসীর মত ঘুরে বেড়ান, কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকেন না। দুদিক থেকেই আপনার মধ্যে বৈপিরত্য, যিনি বিদ্বান তিনি একটা জায়গায় বসে থাকেন, তিনি চান যাতে লোকেরা তাঁর কাছে সেখানে এসে দেখা করুক, কিন্তু আপনি বিদ্বান হয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেভাবে আপনি ঘুরে বেড়ান তাতে মনে হয় না যে আপনি কাজকর্ম করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে দুটোই আছে, বিদ্যাও আছে আর বিচক্ষণতাও আছে। যে কারণে একজন মানুষের মধ্যে বিচক্ষণতা হয় সেই কারণটা আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আর বিদ্বান হলে মানুষ যেটা করে সেটাও দেখতে পাচ্ছি না'। রাজা যদুর কথা শোনার পর এবার দত্তাত্রেয় বলবেন কীভাবে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের তিনটি অধ্যায় ধরে রাজা যদু ও দত্তাত্রেয়র সংলাপে দত্তাত্রেয় কি বলেছেন সেটাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন। এই অংশটুকুরই নাম *অবধূতোপাখ্যান*। দত্তাত্রেয় একজন সন্ন্যাসী, তাঁকে অবধূতও বলা হত।

পরের শ্লোকেই রাজা যদু আরও মজার কথা বলছেন *প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং চ মানবাঃ। হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ।*।১১/৭/২৭। মানুষ ধর্ম, অর্থ আর কামে প্রবৃত্ত হয় কোন একটা হেতু বশতঃ। কি হেতু? আমার আয়ু বৃদ্ধি হোক, যশ হোক, লোকেরা আমাকে মানুক, সৌন্দর্য বৃদ্ধি হোক বা আমার সম্পত্তি বৃদ্ধি হোক। এই ধরণের কোন বাসনা থেকেই মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কামে প্রবৃত্ত হয়। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, প্রয়োজনের যদি অভাব থাকে মহামুর্খ লোকও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। কাজে প্রবৃত্তি

মানে কাজ করার ইচ্ছা, কাজে নামা। মহামুর্খও কাজে নামবে না যদি দেখে এই কাজ করে তার কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে না। আমাদের শাস্ত্র সচরাচর মোক্ষকে কাজের সম্পর্ক থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এনারা এখানে মোক্ষকেও নিয়ে এসেছেন, মোক্ষ না বলে বলছেন তত্তজিজ্ঞাসা। বলছেন ধর্ম, অর্থ, কামের পেছনে একটা আশা থাকে, একটা প্রলোভন থাকে। কিসের আশা? আয়ু, যশ, শ্রী, সম্পত্তি এই জিনিসগুলোর আশা নিয়ে ধর্ম, অর্থ আর কামে প্রবৃত্ত হয়। শ্রী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য হয় আবার শ্রী শব্দের অর্থ ধন-সম্পদও হয়। আমরা মোক্ষ বলতে মনে করি অজ্ঞানের নাশ, কিন্তু মোক্ষের আরেকটা ব্যাখ্যা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের পারে যাওয়া। তার মানে তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাঁর আয়ুও চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। এখানে এটাকেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা রূপে নিয়ে এসেছেন। মোক্ষকে যদি নাও নেওয়া হয়, এই তিনটে ধর্ম, অর্থ আর কামের পেছনে মোটামুটি এই কটি জিনিসের প্রত্যাশা থাকে, আয়ু, যশ, শ্রী। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের যা যা চাহিদা ছিল আজও একই চাহিদা আছে, একটুও পাল্টায়নি। এখনও পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাকে ভোগ করার ইচ্ছা করে, পুরুষ চায় কিভাবে কাজ না করে সহজে অর্থ পেয়ে যেতে পারি। আগেকার মানুষরাও সেইজন্য যজ্ঞ করতেন, ধর্ম করতেন যাতে সহজে অর্থ পায়। আজকের দিন মানুষ শেয়ার মার্কেটে নামে, মানি মার্কেটে টাকা লাগায়, লটারি কাটে, জিনিসটা একই, সহজে কিভাবে টাকা আয় হতে পারে। তখনকার দিনেও মানুষ চাইত আমার সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে শিশু হবে, যারা ভালোবাসার মুর্ত রূপ, আজও মানুষ তাই চায়। আগেকার দিনের মানুষরাও চাইত প্রিয়জনদের যেন সব সময় আমার কাছে পাই, তারা যেন সব সময় আমার পাশে থাকে, যারা আমার অপ্রিয় তাদের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করত, মানুষ আজও তাই করে। তখনকার দিনেও মানুষ কাজ করতে চাইত না, সেইজন্য বাড়িতে চাকর-বাকর রেখে তাদের দিয়ে কাজ করাত, আজও সবাই তাই চেষ্টা করে। এখন লোক পাওয়া না গেলে ভ্যাক্যুম ক্লিনার আছে, মাইক্রোভেন আছে, নিজেকে যেন কাজ না করতে হয়। মানুষের মূল স্বভাব চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। আমরা এখন কত কথা বলছি, বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনাতে একটা জোয়ার এসেছে, আমরা সবাই কত পাল্টে গেছি, কিন্তু কিছুই পাল্টায়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়ে আমরা চাইছি আমাদের আয়ু কিভাবে বাড়ানো যায়, আজও চাইছি আমাদের অর্থ বৃদ্ধি, যশ বৃদ্ধি কিভাবে করা যেতে পারে। মানুষের স্বভাব কোথাও পাল্টায়নি, পাঁচ হাজার বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। এটাই মহারাজ যদু এখানে বলছেন, মানুষ যা কিছু কাজে প্রবৃত্ত হয় সবাই এই জিনিসগুলোর জন্যই প্রবৃত্ত হয়।

ত্বং তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোহমৃতভাষণঃ। ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।। ১১/৭/২৮।। মহারাজ যদু বলছেন ‘কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সব রকম কর্ম করতে সক্ষম কারণ আপনি তরুণ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আপনার বুদ্ধি আছে, পাণ্ডিত্য আছে এবং নিপুণ। *সুভগঃ*, আপনার চেহারাতে সৌভাগ্য যেন ঝরে পড়ছে, আপনার সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য দুইই প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনি কাজ তো কিছুই করেন না, অন্য দিকে উন্মত্ত আর পিশাচের মত বিচরণ করে বেড়ান। কোন দিকেই আপনার সৌন্দর্য বোধ নেই। আপনার কোন কর্মও নেই আর মনের মধ্যে কোন চাহিদাও নেই। তা সত্ত্বেও আপনি এত অভিজ্ঞতা কোথা থেকে অর্জন করলেন? সৌভাগ্য আর আনন্দ দুটো এক সঙ্গে চলে। *অমৃতভাষণঃ*, আপনার কথাতে যেন অমৃত ঝরে পড়ছে, আপনি যখন কথা বলেন সেই কথাগুলো কত মধুর লাগে’। জীবনে সফলতম ব্যক্তির যা যা থাকা দরকার সবই দত্তাত্রেয়র মধ্যে বিদ্যমান, কার্যকুশলতা আছে, সৌভাগ্য আছে, সৌভাগ্যবান পুরুষ যখনই যেখানে যাবেন সবটাই তাঁর ঠিক চলবে, ট্রেনে বাসে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না, যে বাসস্থানে থাকবেন সেখানে সব কিছুই ঠিক ভাবে চলে, তার সাথে *অমৃতভাষণঃ*, তাঁর সব কথাই মধুর। শুধু ভাগ্যই নয়, দেখতেও

কী সুন্দর। বলে, যোগী যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে সেই যোগীকে সন্দেহ করতে হয়, যোগী মানেই দেখতে সুন্দর হবে। কারণ সৌন্দর্য আর আনন্দ এক সঙ্গে চলে। সৌন্দর্য যোগীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক, যোগের জন্য যোগীর শরীর মজবুত থাকে, আনন্দের জন্য চেহারাটা খুলে যায়। আর যোগী তো এক জন্মেই হওয়া যায় না, অনেক জন্মের সাধনায় যোগী হয়। সৌন্দর্য সব সময় ঈশ্বরের কৃপাতে হয়, আমাদের কাছে ঈশ্বরের কৃপা মানেই হয়, তার নিজের সুকৃতি আছে। যদি তাঁর নিজের সুকর্ম থাকে তবেই সে যোগী হয়, আর ঐ সুকর্মই তাঁকে সুস্থ শরীর দেয়, সুন্দর চেহারা দেয়।

কেউ যদি আজ থেকে সাধনা করতে শুরু করে দশ পনের দিনের মধ্যেই তার চেহারা পাল্টে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, I never met a Yogi who did not have a beautiful voice। যোগীর কণ্ঠস্বর সব সময় সুমধুর হবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে কণ্ঠস্বরটাও মিষ্ট হয়ে যায়। একজন গৃহস্থ যা যা চায়, টাকা চায়, পাঁচজন লোক মানুক জানুক, নিরাপত্তা চায়, সুস্থ শরীর, সুন্দর চেহারা চায়, যোগীর এর সবটাই স্বাভাবিক ভাবে থাকে। যোগীর যেটা নেই সেটা হল তাঁর চাহিদাটা শুধু থাকে না। একজন গৃহস্থ যে যে জিনিসকে মূল্যবান মনে করে, যোগী না চাইতেই সেগুলো তাঁর কাছে চলে আসে। গৃহস্থ ভালো খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করে, যোগী খেতে ইচ্ছে করুক আর নাই করুক, ভালো খাবার সে সব সময় পেয়ে যাবে। যেটাই গৃহস্থের কাছে মূল্যবান মনে হবে সেটাই যোগীর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। সাধু সন্ন্যাসীদের তাই লোকেরা ঈর্ষা করে, আমরা এত খেটে মরছি তাও কিছু পাই না, আর এরা বসে বসে এত সুখ ভোগ করছে কি করে! আমাদের সমস্যা হল, আমাদের কাছে শরীর মানে বাবা-মার জেনেটিক উপাদানে আমার শরীরটা এসেছে, আর যেমন যেমন খাওয়া-দাওয়া করছি তাই দিয়ে শরীরটা চলে। সবটাই ঠিক, কিন্তু এদের সবার রাজা হয়ে বসে আছে আমাদের মন, মন যখন নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। ফলে শরীরের মধ্যে সব গুণ চলে আসে, যে গুণগুলো মানুষ নিজের ভেতরে বা নিজের প্রিয়তমর ভেতরে দেখতে চায়। এই জিনিস হতে বাধ্য, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না।

বাস্তবে দত্তাত্রেয় এই রকম ছিলেন কিনা আমাদের জানার কোন উপায় নেই, তবে এই ধরণের রচনার মাধ্যমে একটা আদর্শকে সামনে রাখা হয়, সেখানে অনেকগুলো ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে রাখা হয়। একজন যোগী কেমন হবেন? দত্তাত্রেয়কে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন। ভাগবত দত্তাত্রেয়র যে বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে স্বামীজীর সাথে প্রচুর মিল পাওয়া যায়, স্বামীজীও এই রকম ছিলেন। দত্তাত্রেয়র এই গুণগুলো যদি স্বামীজীর উপর নিয়ে আসা হয় একই বর্ণনা হয়ে যাবে, স্বামীজী! আপনার অভিজ্ঞতা আছে, বিদ্যা আছে, বিচক্ষণতা আছে, আপনার চলন রাজার মত, আপনাকে দেখতে এত সুন্দর, আপনার চেহারা থেকে সৌভাগ্য টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। স্বামীজী যখন হাটাচলা করতেন মনে হত যেন রাজা হাটছেন। আমেরিকার এক বন্দরে নতুন একটা জাহাজ লঞ্চ করা হবে, লঞ্চ করার অনুষ্ঠান দেখার জন্য একটা জায়গা পর্যন্ত সবাই যেতে পারত, তারপরেই সিকিউরিটি থাকত। যাঁরা স্বামীজীকে নিয়ে গেছেন তাঁরা বললেন, স্বামীজী এর পর আর যাওয়া যাবে না, স্পেশাল পারমিশান পাস না হলে যাওয়া যাবে না। স্বামীজীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি আরামসে হাটতে হাটতে সিকিউরিটির ব্যারিকেড অতিক্রম করে এগিয়ে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে আটকাতে এগিয়ে এলো না, যে জায়গাটা সাধারণদের জন্য নিষিদ্ধ সেখানে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মেরি লুই বার্ক এই ঘটনার কথা তাঁর নিউ ডিসকভারিজ বইতে উল্লেখ করে বলছেন who would have dare to stop the king, স্বামীজির চলার মধ্যে এমন একটা রাজকীয়তা যে কারুর মাথায় আসছে না যে এই লোকটিকে আটকাতে হবে।

আমরা যখন হাটি আমাদের হাটাই বলে দেয় অনধিকার প্রবেশ। কিন্তু স্বামীজী সারা জগতের মালিক, উনি জানেন এটা আমারই সম্পত্তি। এখানে দত্তাত্রেয়র মধ্যে ঠিক একই জিনিস।

ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ, আপনি তো কোন কাজ করেন না, তাও আপনার মধ্যে এত গুণ। তবুও আপনি জড়, উন্মত্ত ও পিশাচবতের মত থাকেন। ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার পরমহংসের কথা বলতে গিয়ে এই চারটি লক্ষণের কথা বলছেন, জড়বৎ, উন্মত্তবৎ, পিশাচবৎ ও বালকবৎ। ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে বালকবৎ বলছেন, বাকি তিনটে এই শ্লোকে বলছেন। জড়বৎ, জড় বস্তুর মত সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন, উন্মত্তবৎ, পাগলের মত কখন হাসছেন কখন কাঁদছেন, আবার কখন নৃত্য করছেন। পিশাচবৎ, শুচি অশুচির কোন ভেদ নেই আর বালকবৎ, বালকের মত স্বভাব কোন কিছুতে আঁট নেই। মহারাজা যদু বলছেন, আপনাকে দেখে আমার এতদিনের সব ধারণা পাল্টে গেল। মহারাজা যদু আরও টেনে নিয়ে এটাই বলছেন।

*জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা। ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ।।*১১/৭/২৯। জগতের বেশীর ভাগ লোক কাম আর লোভের দাবাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। যেটা আছে সেটা আরও বেশী বেশী করে হোক এই আগুনে মানুষ দিনরাত জ্বলেপুড়ে মরছে, অপরের আছে নিজের নেই সেই ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলছে। আমরা সব সময় বলি, আজকাল যা দিন পড়েছে ভাবা যায় না। কিছুই দিনকাল পাল্টায়নি, চিরদিন এই রকমই ছিল, ভাগবতেই বলছেন, মানুষ কামাগ্নিতে, লোভাগ্নিতে আর ঈর্ষাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় এই দাবানলের আঁচটুকুও আপনার কাছে পৌঁছাতে পারছে না, পোড়া তো দূরে থাক। বনের হাতি দাবানল লাগলে সে বন থেকে যে কখন বেরিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতেও পারেনা দাবানল কি জিনিস। হাতির চারিদিকে আগুন জ্বলছে তাতে হাতির কোন বিকার নেই, সে নদীতে আনন্দে স্নান করতে থাকে। ঠিক তেমনি সংসার কাম আর লোভের দাবানলে জ্বলছে কিন্তু তার আঁচটুকুও আপনার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। আপনি এটা কি করে সম্ভব করলেন? আর পুত্র, স্ত্রী, ধন এগুলোর সব কিছু থেকে আপনি স্পর্শরহিত। জাগতিক যা কিছু আছে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আপনি নিজের স্বরূপে বিরাজ করে আত্মার আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে কেমন করে আপনি একমাত্র আত্মাতেই এই অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করছেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেও প্রথমে ঠিক এই প্রশ্ন এসেছিল। এর উত্তর পাওয়ার পরই তাঁর জীবন অন্য দিকে প্রবাহিত হয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধ প্রথমে দেখলেন একজন বৃদ্ধ, তারপর একজন ব্যাধীগ্রস্ত, পরের দিন দেখলেন মৃত শরীর। আর চতুর্থ দিন দেখলেন শ্রমণ, রাস্থা দিয়ে একজন সন্ন্যাসী বীরদর্পে হেঁটে চলেছেন, তাঁর চেহারা ঝকঝক করছে। ভগবান বুদ্ধ সারথিকে প্রশ্ন করলেন ইনি কে? ইনি একজন সন্ন্যাসী। এনার চেহারা এত ঝকঝকে আর আনন্দে পরিপূর্ণ কি করে হল? সারথির উত্তর – ইনি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ প্রথমে মানব জীবনের অবশ্যাম্ভাবী তিনটে বিকার জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে দেখে তাঁর মনের মধ্যে শিহরণ আর শোক উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরেই দেখলেন সন্ন্যাসী। ইনি এত ঝকঝকে আনন্দে পরিপূর্ণ কি করে হলেন? ইনি সব ত্যাগ করেছেন। সেখান থেকেই ভগবান বুদ্ধের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য জন্ম নিল। যদুও এখানে সেই একই প্রশ্ন করছেন – চারিদিকে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখের দাবানল জ্বলছে, শুধু অবসাদ আর অবসাদ, এর মধ্যে আপনি কি করে আনন্দে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন?

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্। ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ।। ১১/৭/৩০।। স্পর্শ শব্দ আমাদের শাস্ত্রে বার বার আসে, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় তাদের ভালোবাসার বস্তুর

পেছনে দৌড়াতে থাকে। চোখ সুন্দর মুখ, সুন্দর দৃশ্য দেখতে চায়, কর্ণ সুমিষ্ট ধ্বণি শুনতে চাই, যখন দুটো দুটোর সাথে মিলন হয় তখন সেটাকে বলে স্পর্শ, গীতায় যেমন বলছেন *মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়*, ইন্দ্রিয় আর তার বিষয়ের সংযোগকে বলে স্পর্শ। আপনি স্পর্শবিহীন, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক করছে না। অথচ জগতের সবাই স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, সম্পদ, সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে আর সবাই চায় আমার সব কিছু যেন ঠিক থাকে, বাকীরা যেন আমার থেকে ভালো না থাকে। কিন্তু জগতের সব কিছু থেকে আপনি সম্পূর্ণ আলাদা। এটা কি করে সম্ভব হল? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি পরমব্রহ্মের আনন্দে মস্ত হয়ে আছে। এখানে আমরা মেনেই নিচ্ছি যদু রাজা আর দত্তাত্রেয়র মধ্যে আরও কিছু কথা হয়েছে। যদি জিজ্ঞেস করে থাকেন আপনি কি করেন, দত্তাত্রেয় বললেন আমি আত্মার আনন্দে থাকি। শুধু দেখেই বলে দেবেন যে ইনি আত্মার আনন্দে আছে, এভাবে কেউ বলতে পারবেন না। একজন যোগীর কি কি গুণ থাকবে বা সংসারে যারা আছে তাদেরও কি কি গুণ থাকা উচিত, যার দ্বারা সংসারী মানুষ শান্তি পেতে পারে। আমাদের শাস্ত্র সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে কোন তফাৎ দেখে না। বলা হয়, সিদ্ধ পুরুষের যেটা স্বাভাবিক স্থিতি, সাধক সেটাকেই চেষ্টা করে যায়, তাছাড়া আর কিছু না। গীতা ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন, যাঁরা জ্ঞান পথে এসেছেন তাঁরাও জ্ঞানী, তেমনি যাঁরা ভক্তির পথ নিয়ে নিয়েছেন তাঁরাও ভক্ত। আমরা ভক্ত বলতে মনে করি প্রহ্লাদ, ধ্রুব, কিন্তু তা নয়, যে কেউ ভক্তির পথ নিয়ে নিল সেই ভক্ত। এখানে দত্তাত্রেয়র যে গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে, যেখানে বলছেন তিনি পরমব্রহ্মে নিজেকে হারিয়ে রেখেছেন, তিনি স্পর্শবিহীন, কোন কিছুতে তাঁর মন যাচ্ছে না, তিনি দেখতে সুন্দর, মিষ্টভাষী, দেখেই মনে হয় কাজকর্মে সুনিপুণ। কিন্তু তারও আগে যদু রাজা বলছেন, আপনি তো কাজকর্ম কিছুই করেন না, আপনার কি করে এই রকম হল?

কাজের সাথে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞাতের সাথে জ্ঞানের যে সম্পর্ক তার আলোচনা আমরা আগে করলাম, এটাই আবার অনেক সময় অন্য রকম হয়ে যায়। লোকেরা মনে করে কাজ করার কি দরকার, একটা কিছু হয়ে গেলেই হল, কিন্তু হয় না। দত্তাত্রেয়কে এখানে অবতার মনে করা হয়, তিনিও বলছেন না যে আমার ভেতর থেকেই জ্ঞান এসেছে, তিনি বলছেন আমিও অনেক জায়গায় শিক্ষা গ্রহণ করেছি। যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে ঐ শিক্ষার পেছনেও দত্তাত্রেয়র অনেক কাজকর্ম করা ছিল। কারণ ঐ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, সেটার জন্য কাজ করতে হয়। প্রথম অবস্থায় প্রচুর কাজ করতে হয়, সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হয় কিভাবে অনাসক্ত ভাবে কাজ করা যায়, তারপরে জ্ঞানের পাত্রতা আসে। পাত্রতা এসে গেলে তখন একটা কিছু দেখলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার অনেকের আগের আগের জন্মে প্রচুর কাজ করা থাকে, একটু দেখলেই তাদের হয়ে যায়। তবে একটা কথা আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার, সংসারে থেকে নিষ্কাম কর্ম হয় না। অনেক আগে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারের আচার্য ছিলেন স্বামী শিক্ষানন্দজী মহারাজ, তিনি ব্রহ্মচারীদের খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। স্টোভে দুধ বসিয়ে ধ্যান করতে বসে গেলে, সেই ধ্যান কতটুকু হবে! তোমরা সবাই এভাবেই ধ্যান কর। সব সময় তোমরা কাজকর্ম করছ আর বলছ ধ্যান করবে, সেই ধ্যান কি রকম হবে, উনুনে দুধ বসিয়ে ধ্যানে বসার মত, মনটা সব সময় দুধের দিকেই থাকবে। এই যে বলা হল নিষ্কাম কর্ম হয় না, তাহলে স্বামীজী এত নিষ্কাম কর্মের কথা কেন বলছেন? স্বামীজী ওখানে একটা আদর্শের কথা বলছেন। ওটাই শেষ কথা, গীতাতেও যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলছেন, ওটাও শেষ কথা। নিষ্কাম কর্ম করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম কর্ম করছেন, এটাই সত্যিকারের নিষ্কাম কর্ম। স্বামীজী যে রামকৃষ্ণ স্থাপনা করছেন, দেশে বিদেশে ঘুরছেন, তিনি নিষ্কাম কর্ম করছেন। আমরা যে কাজ করছি, কিছুটা রজোগুণের জন্য, কিছুটা অহং তুষ্টি আর কিছুটা বাড়ির লোকদের বা অফিসের বসদের খুশি রাখার জন্য আবার কিছুটা লোক দেখানো, সব রকম মিলিয়েই আমরা কাজ করছি।

সেইজন্য জীবনে একটা আদর্শকে অবলম্বন করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। লক্ষ্য, আদর্শ যদি না থাকে তাহলেই সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কাজের দ্বারাই জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা আসে, দ্বিতীয় একটা হল সরাসরি জ্ঞান আসা। আমাদের মন যেন একটা সোনার বল। সোনার বলে জল রাখতে গেলে জল রাখা যাবে না, বল কখনই জলকে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সোনার বলকে যদি হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয় তখন ওর মধ্যে গর্ত হতে শুরু করবে, ঐ গর্তে জল ধরবে। আমাদের মস্তিষ্কেও ঠিক তাই হয়। কর্ম করতে শুরু করলে পাত্রতা তৈরী হয়, যত কর্ম করবে তত পাত্রের আকার বাড়বে, ভেতরের আয়তনটা বাড়ে। দ্বিতীয় উপায় হল জ্ঞান, কঠোপনিষদে বলছেন *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, যেমনটি আমাদের কর্ম, যেমনটি আমাদের জ্ঞান তেমনটি আমাদের জন্ম হবে। জগতে জ্ঞানের অভাব নেই, ইন্টারনেটে গুগুলসে গেলে সব জ্ঞান পাওয়া যাবে, তাই বলে কি মানুষ পাল্টে গেছে? কিছুই পাল্টায়নি, যেমন মুর্খ ছিল তেমন মুর্খই থেকে গেছে। দু হাজার বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। অথচ উপনিষদে বলছেন যেমনটি কর্ম, তার সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যেমনটি জ্ঞান, পরের জন্ম সেভাবেই হবে। কর্ম আর জ্ঞান দুটো সাথে সাথে চলে, দুটোর মধ্যে বেশি তফাৎ এই জন্যই নেই, কর্ম অনুভব দিয়ে আমাদের জ্ঞান দেয়, আর জ্ঞান সরাসরি দেয়। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সারা জগতই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু তাও তো আমরা শিক্ষা নিতে পারছি না। মাঝে মাঝে আসছে ঠিকই, কখন কখন মনে হয় তাইতো ছোটবেলায় এই রকম একটা কথা পড়েছিলাম, কিন্তু ঐ শিক্ষা দিয়ে আমাদের জীবনের কোন পরিবর্তন হয়নি। এখানে জগৎ থেকে যে শিক্ষা অবধূত পেয়েছেন তাতে তাঁর জীবনে পরিবর্তন এসে গেছে। অবধূত যে জ্ঞান লাভের কথা বলছেন, যাঁরা গভীর ধ্যান করেন তাঁদের পক্ষেই এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

জ্ঞানের কয়েকটা ধাপ থাকে। জ্ঞানের প্রথম ধাপ হয় ইংরাজীতে যাকে বলা হয় information, information ছাড়া এই জ্ঞানে কিছু থাকে না। যেমন গুগুলে টাইপ করে সব খবর পেয়ে যাচ্ছি, শুধু এক গুচ্ছ information দিচ্ছে। ছোটবেলা স্কুলে যা কিছু মুখস্ত করেছি সবটাই information, যেটা কোন কাজেই লাগে না। দ্বিতীয় ধাপ হল জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা বা বলা যেতে পারে কাঁচা জ্ঞান। তৃতীয় ধাপ পাকা জ্ঞান আর চতুর্থ ধাপে আসে বিজ্ঞান। ঠাকুর খুব সহজ উদাহরণ দিচ্ছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। জ্ঞানের প্রথম অবস্থা শুধু শোনা, আমি শুনেছি দুধ বলে কোন কিছু আছে, ঐ information দিয়ে আমার কিছু হবে না। প্রায়ই লোকেরা ভক্ত বা সাধুদের বলে, ব্যাটা ভণ্ড একদিকে ধর্ম করে অন্য দিকে সব দু নম্বরী কাজ করে বেড়ায়। তার মানে ধর্মের যা কিছু আছে ওটা তার কাছে শুধু মাত্র information হয়ে আছে। দ্বিতীয় ধাপে আরেকটু যেন কাছে এগিয়ে গেল, কাছে এগিয়ে গেলে একটু একটু করে বিশ্বাস হতে শুরু হয়। বিশ্বাসেরও দুটো অবস্থা, প্রথমটা প্রাথমিক অবস্থা আর দ্বিতীয় অবস্থা হয় পাকা অবস্থা। বিশ্বাসের প্রাথমিক অবস্থায় মনটা চঞ্চল হতে শুরু হয়, মনে করে শাস্ত্রের কথায় কিছু ভালো জিনিস আছে, ভগবান বলে কিছু আছেন। সেখান থেকে আসে পাকা বিশ্বাস, বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে যায়, শাস্ত্রে যা বলছে সব সত্য, জিনিসটা এই রকমই। বিশ্বাসের পাকা অবস্থা হয়ে গেলে জীবন পাল্টাতে শুরু করে। অবধূতের কিন্তু এই অবস্থা নয়, অবধূতের তার পরের অবস্থা, যেটাকে বলছেন বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানে, তিনি জিনিসটাকে জেনে জীবনে লাগিয়েছেন, লাগিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করে কৃতকৃত্য হয়ে গেছেন। আমরা জানি আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, আগুনের ব্যাপারে আমরা খুব সাবধান, এটাই বিজ্ঞানের অবস্থা। আগুন জিনিসটা কি, আগুন কিভাবে হয়, আগুন কি করে এই অবস্থা গুলো আমরা পেরিয়ে এসেছি। শুধু তাই না, আগুনকে নিয়ন্ত্রণে এনে আগুনের সদ্ব্যবহার করে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই ব্যাপারেও আমরা অভিজ্ঞ

হয়ে গেছি। বিজ্ঞানের অবস্থা একমাত্র আসবে ধ্যানের মাধ্যমে। কাজ করলে মস্তিষ্কের নিউরোন গুলো যেমন সুনিয়ন্ত্রিত হয়, ধ্যানের গভীরে একই জিনিস হয়। কথামৃতে যে এত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা রয়েছে, ওখানে ঠাকুরের যেমন নিজের অনুভূতির কথা আছে তার সাথে শাস্ত্র নিয়েও অনেক কথা আছে, শাস্ত্রের কথা শুনে সেটাকে ধারণা করে ধরে রাখার ক্ষমতাটা ঠাকুরের ছিল, এই ক্ষমতাটা ধ্যানের জন্য হয়েছে। কাজ করে আমরা যে জ্ঞান পাব, সেই জ্ঞান আমরা ধ্যান করেও পেয়ে যাব। তফাৎ হল ধ্যানে একটা জিনিসকে গ্রহণ করে রপ্ত করার ক্ষমতা অনেকে বেশি বেড়ে যায়। দশ ঘন্টা কাজ করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে, পাঁচ মিনিট ধ্যানেই সেটা এসে যাবে। সেইজন্য যাঁরা ঠিক ঠিক ধ্যান করেন তাঁদের ক্ষমতাটা অসীম হয়ে যায়। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলেন লাটু মহারাজ, তাঁর কোন পড়াশোনাই ছিল না, অথচ ঠাকুরের বিদ্বান সন্তানরা জ্ঞানের যে অবস্থায় পৌঁছে ছিলেন, লাটু মহারাজও ঐ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। একই জিনিস আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রেও পাই, যীশুও তাই ছিলেন, মহম্মদও তাই ছিলেন, এনাদের কারুরই পড়াশোনা ছিল না। কিন্তু তাঁদের ধারণ করে ধরে রাখার ক্ষমতাটা সাংঘাতিক। অবধূতেরও এই একই জিনিস ছিল, তিনি ধ্যান করেছেন কিনা। ধ্যানের গভীরে একটু সামান্য যদি কোন আভাস পেয়ে যান তাতেই তাঁর জ্ঞান হয়ে যায়।

আমরা সাধারণ ভাবে জ্ঞান বলতে বুঝি, কেউ কিছু একটা বলে দিল, জিনিসটা এই রকম, তখন সেটা জ্ঞান রূপে আমাদের কাছে আসে। কিন্তু এখানে অবধূতকে কেউ কিছু বলে দিচ্ছে না, তিনি এক একটা জিনিস দেখছেন, দেখার পর সেই জিনিসের কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি একটা জ্ঞান পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন পাহাড় থেকে কিছু শিক্ষা পাচ্ছেন, পাখি থেকে পাচ্ছেন, মাছ থেকে শিক্ষা পাচ্ছেন। এই শিক্ষা কি করে হচ্ছে? এই একটি কথাকে আমাদের মাথার মধ্যে খুব ভালো করে বসিয়ে নিতে হবে, কক্ষণ, কোন পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থাতেই কোন জ্ঞান বাইরে থেকে আসে না। জ্ঞান সব সময় ভেতরেই আছে, এর কোন ব্যাতিক্রম হবে না। একটা পেন আছে, এই পেনের দাম কত হতে পারে, এর দাম পাঁচ টাকা হবে নাকি পাঁচ হাজার হবে, এই দামটা কে ঠিক করে দেবে? কোম্পানি একটা দাম করে দেয়। যদি আমি শুনি এই পেনটা চোরাই মাল, তখন আমি পাঁচ টাকা থেকে শুরু করব। হাজার টাকাও যদি দাম হয় তাহলেও শুরু করব পাঁচ টাকা থেকে। সেখান থেকে যদি আমি শুনি, এই পেন কোন মামুলি পেন নয়, এই পেন দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সই করেছিলেন। তখন এই পেনের কত দাম হয়ে যাবে? কেউ দশ হাজার দেবে, কেউ পাঁচ লাখ দেবে। পাঁচ টাকা দামের একটা পেন পাঁচ লাখে কি করে চলে গেল? জিনিসের দাম ওর উপযোগিতা দিয়ে কখনই হয় না, ওর পেছনে কি কাহিনী আছে দেখা হয়। যেমন আমরা বাবা মাকে ভালোবেসেছি, বাবা-মা আজ কেউ বেঁচে নেই, ওনাদের ব্যবহৃত জিনিস যদি কিছু থাকে তার দাম আমার কাছে সাংঘাতিক। কিন্তু অপরের কাছে কোন দাম নেই। দামটা হল একটা নলেজ। জিনিসটার মূল্য কোথা থেকে আসছে? নিজের ভেতর থেকে আসে, বাইরে থেকে কিছু আসে না। আমাদের সব রকম প্রতিক্রিয়া, আমাদের যত রকম জ্ঞান, যা কিছু আছে সব ভেতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে কিছু আসে না। বাইরের জগৎ কি সরবরাহ করে? শুধু একটা ছোট্ট information, একটা সুইচের মত কাজ করে। রেডিওতে সুইচ অন করলে রেডিও নিজে থেকেই চলতে শুরু করে। আমার আর আমার অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দের কোন তফাৎ নেই, সচ্চিদানন্দ তিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, তাই আমার ভেতরেই অনন্ত জ্ঞানরাশি রয়েছে। যখন বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা ভেতরে আসে তখন সেই জ্ঞান বেরোতে শুরু হয়। একটা টোকা মারলেই সেই জ্ঞান ফেটে ফেটে পড়ে। আমার আপনার কেন জ্ঞান ফেটে ফেটে পড়ছে না? মৌচাকে মধু আছে, একটা কিছু দিয়ে খোঁচা দিলে মৌচাক থেকে মধু ঝর ঝর করে পড়বে, কিন্তু মৌচাকের বাইরে যদি একটা কাঠ কিংবা লোহার আবরণ দেওয়া থাকে তাহলে যতই খোঁচা মারুক না কেন এক ফোঁটা মধুও পড়বে না। আমার আপনার যে জ্ঞানের মৌচাক, সেই মৌচাকের উপর অনেক আবরণ দেওয়া আছে, সেইজন্য কোন জ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে

না। কিন্তু ধ্যান করে করে যিনি আবরণ গুলিকে সরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের মৌচাক এখন খোলা পড়ে আছে। এবার একটু কোন টোকা কেউ দিল বা বাইরে থেকে সামান্য একটু উত্তেজনা ভেতরে এসে ধাক্কা দিল, জ্ঞানরাশি হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকবে। স্বামীজীর রচনাবলী পড়লে আমরা অবাক হয়ে যাই, এত জ্ঞান তিনি কি করে পেলেন! কোথাও পাননি, তাঁর ভেতরেই সব ছিল। ইংল্যাণ্ড কোথায়, প্যারিস কোথায় এই জিনিসগুলো সবাইকে জানতে হবে, এগুলো information দিয়েই চলে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মনের জগৎ এগুলোকে নিয়ে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার সেখানে জ্ঞান দরকার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রচুর information নিয়ে চলে কিন্তু নলেজ জিরো। কারণ তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটা অনেক রকম আবরণ দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। তাদের জীবনটাও তাই দুঃখ আর যন্ত্রণায় ভরা, চেহারার মধ্যে কোন জৌলুষ নেই। কিন্তু দত্তাত্রেয়কে দেখে যদু রাজা বলছেন, আপনার চেহারাতে সৌন্দর্য আছে। কেন সৌন্দর্য? মনের মধ্যে শান্তি আছে। শান্তি কেন আছে? তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞান একমাত্র তাঁদেরই আসবে যাঁদের গভীর ধ্যান হয়, গভীর ধ্যান হলে ঐ আবরণগুলো খসে পড়ে যায়। ঠিক তেমনি প্রচুর কাজ করলে আবরণ গুলো ক্ষয় হয়ে যায়। ঐ আবরণ যতক্ষণ না ক্ষয় হয় ততক্ষণ তাকে কেউ কিছু শেখাতে পারবে না। সেইজন্য মঠ মিশনে সাধু ব্রহ্মচারীদের দিয়ে প্রচুর কাজ করান হয়, কাজ করা মানে ব্রেনে হাতুড়ি মারা। ধীরে ধীরে মনটা যখন একটু নরম হল, এবার তুমি ধ্যানের দিকে যাও। তখন আস্তে আস্তে তার ধারণা করার ক্ষমতাটা বাড়ে। তখন যে কোন একটা জিনিস দেখলেই মনের মধ্যে একটা ভাবের উদয় হয়। কবি বা লেখকদের তাই হয়, একটা কিছু দেখলেন, একটা ফড়িং উড়ছে, গাছের ডালে একটা পাখি বসে আছে, আমাদের কাছে এগুলো কিছুই মনে হবে না, কিন্তু তাঁরা ওটাকে নিয়েই একটা কবিতা বা কাহিনী রচনা করে দিলেন। মন এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, একটা কিছু দেখলেই সেখান থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে আসে। এখানে শুধু সৃজনী নয়, পুরো জীবনটাই তাঁর পাল্টে গেছে।

এই দীর্ঘ আলোচনার মূল বক্তব্য হল, মহারাজ যদু বলতে চাইছেন, আপনাকে দেখে মনে হয় না যে আপনি কোন কাজ করেন। কারণ দেখছেন তিনি একেবারে যোগীর বেশে আছেন, হয়ত সামান্য একটা কৌপীন পড়ে আছেন, গায়ে কোন বস্ত্র নেই, হাতে একটা কমণ্ডুলু, তার মানেই তিনি কোন কাজকর্ম করেন না। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞানে পরিপূর্ণ, এটা কি করে হতে পারে! দ্বিতীয় বয়স কম, যশ আছে, চেহারায় একটা আনন্দের ভাব আছে, সৌন্দর্য আছে। এগুলো থাকলে মানুষ সাধারণ ভাবে স্ত্রী আনে, পরিবার করে, সম্পদ করে, কিন্তু দত্তাত্রেয় সেগুলোও করছেন না। বলতে চাইছেন জগতের কোন ভোগের দিকেও তাঁর মন নেই। দুটো জিনিসকে বলছেন, এক আপনার ভেতরে শক্তি কি করে এল, দুই এই শক্তিকে যে কাজে মানুষ লাগায় সেটাও আপনি লাগাচ্ছেন না, এই অনাসক্তির শক্তিটা আপনার কি করে এল।

জীবনে যদি শক্তি না থাকে তাহলে সে শেষ, আর ঐ শক্তিকে যদি কাজে লাগানো হয় তার সাথে সেখানে যদি অনাসক্তি না থাকে, তাহলেও সে শেষ। এটাকেই স্বামীজী বলছেন, আমাদের চাই man making and character building education। Man making মানেই শক্তি চাই, ভেতরে যার শক্তি নেই সে একটা পিঁপড়ে। কিন্তু এই শক্তিই একজনকে রাবণ বানিয়ে দিতে পারে, একটা কংস বানিয়ে দিতে পারে, একটা হিটলার বানিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য চাই অনাসক্ত, জীবনের এই দুটো লক্ষ্য, ক্ষমতা আর অনাসক্তি। ক্ষমতা থাকবে, যেমন ভারত বলছে আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার থাকবে কিন্তু আমরা বোমা বানাবো না। পাকিস্তান বলছে আমরা বোমাটাই বানাবো, বোমা বানানো আমার দরকার, এটাই আসুরিক শক্তি। এখানে এটাই বলছেন, আপনার দুটোই আছে, আপনার মধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু শক্তি কর্ম দিয়ে আসে অথচ আপনি কোন কর্ম করেন না। যেমন অনেকে বলছে পাকিস্থান নিউক্লিয়ার পেলো কি করে? বলছে চায়না তাকে

দিয়েছে, কারণ নিজের ক্ষমতা নেই। প্রশ্ন উঠবে, আপনি নিউক্লিয়ার পাওয়ার পেলেন কি করে। যদু রাজা এটাই জিজ্ঞেস করছেন, আপনাকে দেখে মনে হয় না যে এই এই ক্ষমতা থাকার কথা। কিন্তু পেলেন কি করে? দ্বিতীয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ, ঐ ক্ষমতা পেলে মানুষ যে যে কাজে লাগায় বা নিজের স্বার্থে যে জায়গাতে লাগায়, সেটাও আপনি লাগাচ্ছেন না। আপনার মধ্যে দুটোই আছে, ক্ষমতাও আছে আবার অনাসক্তিও আছে, এই দুটোর সংমিশ্রণ দেখা যায় না। এটাই এই আলোচনার মূল বক্তব্য।

তখন দত্তাত্রেয় বলতে শুরু করছেন আমি কীভাবে শিক্ষা পেয়েছি। তিনি বলছেন *সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ। যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তাঞ্ছৃণু।।১১/৭/৩২।।* হে রাজন্! আমি কোন একজনের কাছে শিক্ষা পাইনি, জীবনে আমি অনেক গুরুর আশ্রয় নিয়েছি। এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি নিজের বুদ্ধি সহযোগে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। ব্রেন যখন খুলতে শুরু হয়ে যায় তখন যেখানে যা দেখবে সেখান থেকেই শিক্ষা পেতে শুরু করবে। আমার গুরুদের কাছে আমি যা যা শিক্ষা পাওয়ার পেয়ে গেছি, তারপর থেকে জগতে আমি মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারছি। কাউকে যদি বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয় কিছু দিন পর থেকে সে ছটফট করতে থাকবে। জেলকে মানুষ এই কারণেই ভয় পায়, জেলে যাওয়া মানে সব কিছুতে সীমাবদ্ধতা এসে গেল। কিন্তু মনের জেলখানায় আমরা সব সময় সীমাবদ্ধ হয়ে আছি। কিন্তু দত্তাত্রেয় বলছেন, আমি স্বচ্ছন্দ। কেন স্বচ্ছন্দ? কোন ধরণের জেলখানায় আমি সীমাবদ্ধ নই। জেলখানায় কেন নেই? আপনি কি জন্ম থেকেই মুক্ত? না, জন্ম থেকে কি করে আমি মুক্ত হব, জীবনে যত জেলখানা, যত বন্ধন ছিল, যা যা দেখেছি, ওর একটা একটা দেওয়াল খসে পড়ে গেছে। কিভাবে খসে পড়েছে? এই যে চব্বিশ গুরুর কথা বলতে যাচ্ছেন, এদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে।

এরপর মাত্র দুটি শ্লোকে দত্তাত্রেয় তাঁর চব্বিশ জন গুরুর নাম বলছেন, আর তার সাথে এক এক করে বলবেন কার কার কাছে থেকে কি কি শিক্ষা পেয়েছেন। *পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোহগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ। কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ।। মধুমা হরণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোহর্ভকঃ। কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ।।*১১/৭/৩৩-৩৪। চব্বিশ জন গুরু হলেন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য, পায়রা, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি বা ভ্রমর, হাতি, মধু সংগ্রহাক, হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বেশ্যা রমণী, কুহর পাখি, বালক, কুমারী কন্যা, বাণ নির্মাতা, সর্প, মাকড়সা, ভৃঙ্গী কীট (কাঁচপোকা)। এই জিনিসগুলো আমরা সবাই রোজই দেখছি, নিয়মিত দেখছি, কিন্তু আমাদের শিক্ষা হচ্ছে না। অবধূতোপখ্যানের সব থেকে বড় শিক্ষণীয় হল, আমরা আমাদের চারিপাশে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই দেখে থাকি, কত ছোটখাট জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেও ইচ্ছে হয় না। অথচ প্রকৃতির রাজ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে কিছু না কিছু শিক্ষণীয় জিনিস থাকে, যেটা আমরা গ্রহণ করতে অপাঙ্গম। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধি সহযোগে গ্রহণ করে জীবনকে সেইভাবে সংঘটিত করে নিতে পারেন তাঁরাই মহৎ হয়ে যান। দত্তাত্রেয় সবার কাছ থেকে শিক্ষাটা নিতে পেরেছিলেন। দত্তাত্রেয় বলছেন এই শিক্ষা গ্রহণের ফলে জগতে আমি মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম। আমি তোমাকে তাঁদের সবার কথা এক এক করে বলব আর সাথে সাথে তাঁদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষার কথাটাও বলব।

(১) পৃথিবী

*ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ। তদ্ বিদ্বান্ন চল্যার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্।।*১১/৭/৩৩। অবধূতের প্রথম পাঁচজন গুরু হলেন পঞ্চ মহাভূত, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এই পঞ্চ মহাভূতের যে স্থূল রূপ আমরা দেখি তার প্রথমটা পৃথিবী। অবধূতের প্রথম গুরু পৃথিবী। অবধূত বলছেন, ধরিত্রীর কাছ থেকে আমি ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা পেয়েছি। পৃথিবীর বুকে কত আঘাতই না হয়ে চলেছে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকে অবিরাম কত রকমের উৎপাতই না করে চলেছে। পৃথিবীর বুকে চাষবাশ করছে, খনন কার্য করে পৃথিবীর ভেতর থেকে খনিজ পদার্থ তুলে নিয়ে আসছে, কিন্তু তার জন্য ধরিত্রীকে কখনই কোন প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে দেখা যায় না, কোন প্রতিবাদ করতে যায় না, কোন রকম ক্রন্দনও করে না। কিন্তু এই পৃথিবীর যারা বাসিন্দা তারা সবাই নিজের নিজের প্রারব্ধ অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছে, কখন ভালো করে কখন মন্দ করে। এই চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে একে অপরকে আক্রমণ করে নানান ধরণের প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। এতেই বোঝা যায় মানুষ কত অসহায়। যাঁরা আত্মচিন্তনে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইছেন তাঁদের মনের মধ্যে কোন ধরণের বদলা নেওয়ার চিন্তাও উঠতে দিতে নেই। নিজের ধৈর্য এই কারণেই কখন হারাতে নেই। সেইজন্য ধীর ব্যক্তির ভালো করে বোঝা উচিত কোথায় তার প্রতিকূলতা বা বাধা আসছে, বুঝে নিয়ে কোন কিছুতেই ক্রোধ না করা এবং ধৈর্যচ্যুত না হওয়া আর নিজের স্বধর্মে দৃঢ় থাকা।

স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর লাটু মহারাজ স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন ‘লোরেন ভাই! তুমি তো এত দেশ বিদেশ ঘুরলে কোথাও কি দেখেছ যে আমাদের পৃথিবীর পূজা হয়’? প্রশ্ন শুনে স্বামীজী খুব অবাক হয়ে গেলেন। অনেক গ্রামের মেয়েরা ভাতের মাড় একটা পাত্রে ঢালে, মাড়টা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর সেটা মাটিতে ফেলে। একবার একটি বাচ্চা মেয়ে গরম মাড়টা নিয়ে মাটিতে ঢেলে দিয়েছে, সেটা দেখে তার মা দৌড়ে এসে মেয়েকে এক চড় মেরে বলছে, তুই এই গরম মাড় পৃথিবীর বুকে ফেললি, বুঝতে পারছিস না পৃথিবীর কত কষ্ট হল। একটা গ্রামের মেয়েদের মনে এই অনুভূতিটাই এখানে কাজ করছে। পৃথিবী সব কিছুকে ধারণ করে আছে, তার উপর কত অত্যাচার, কত কিছু হচ্ছে কিন্তু পৃথিবী কখন প্রতিক্রিয়া করছে না। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের এই কথা বললে তারা বলবে, পৃথিবীর তো কোন প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই নেই। যখন pure intelect দিয়ে চলে তখন আমরা ওটাই ভাববো, ওর তো কোন প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যাঁর sensitivity আছে তিনি সেখানে দেখবেন সেও প্রতিক্রিয়া করছে, উনি এটা কখনই দেখতে যাবেন না যে ওর কোন প্রতিক্রিয়া করা ক্ষমতা আছে কি নেই। যাঁদের মধ্যে খুব sensitivity আছে, খুব উচ্চমানের কবি বা লেখকদের মন শিশুর মনের মত হয়ে যায়। শিশুরা সব কিছুকেই অন্য ভাবে দেখে, ঋষিরাও অন্য ভাবে দেখেন, কবি, লেখকও অন্য ভাবে দেখেন। ঠাকুর তাঁর ভাইপো শিবুকে নিয়ে শুয়ে আছেন, বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ভাইপো ঠাকুরকে বলছে, খুড়ো আকাশে কেমন চকমকি ঠুকছে। আকাশের বিদ্যুতকে একটা শিশু অন্য ভাবে দেখছে। দত্তাত্রেয় তিনিও এখানে পৃথিবীকে অন্য ভাবে দেখছেন, তিনি দেখছেন না যে পৃথিবী প্রতিক্রিয়া করতে পারে কি পারে না, কারণ তাঁর কাছে অস্তিত্বটাই সম্পূর্ণ রূপে জীবন্ত। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি বলবেন পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও করে না। প্রতিক্রিয়া করে না বলেই তুমি দেখত পারছ না। যখন তার উপর আঘাত হানছে, ক্ষতি করা হচ্ছে তাতেও তিনি নড়েন না। ঠাকুর বলছেন কামারশালার নেহাই, ওর উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়ছে নেহাইয়ের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আমাকে একজন আক্রমণ করছে তখনও আমি প্রতিক্রিয়া করছি না, এটাকে বলে ধীর। বৌদ্ধদের একটা কাহিনী আছে, এই কাহিনী স্বামীজী কর্মযোগে বলছেন, একটা ষাঁড় জঙ্গলে বসে আছে আর তার শিঙের উপর একটা মশা এসে বসে আছে। বহুক্ষণ বসে আছে, হঠাৎ তার মনে হল ষাঁড়ের শিঙের উপর অনেকক্ষণ বসে আছি, ওর না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। তখন সে উড়ে ষাঁড়ের কানের কাছে এসে বলছে, দাদা! অনেকক্ষণ তোমার শিঙে

বসেছিলাম, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, আমাকে ক্ষমা করো। ষাঁড় তখন মশাকে বলছে, তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসে আমার শিঙে বসে থাক তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। এটাই ধীর, কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। কিন্তু আমাদের জীবনকে আমরা এমন তৈরী করে রেখেছি যে সারা অঙ্গে আমাদের চর্মরোগের মত হয়ে আছে, একটু হাত লাগলেই চুলকোতে শুরু করে দেবে, কেউ একটা সামান্য কথা বলে দিল তাতেই ভেতরে জ্বলতে শুরু করে দেব, যে বলেছে তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধশান্তি না করা পর্যন্ত জ্বলতেই থাকবে, একটা কেউ অপমান করেছে সেটাকে সারা জীবন মনে রেখে দেবে।

তদ্ বিদ্বান্ন চন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিত্তের্ব্রতম্, যদি কখন কোন ভাবে আক্রমণ হয়েও যায় তখন বোঝার চেষ্টা করতে হয় নিশ্চয় তার কিছু অসুবিধা ছিল। আমাদের যখন কেউ মারে তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে দেখা যাবে একজন একজনকে দুটো কারণে মারে। আমার দোষের জন্য আমাকে কেউ কোন দিন মারবে না। কাউকে যদি আপনি নিজের দুঃখের কথা বলেন শোনার পর সে অবশ্যই বলবে, ভাই একেবারে আমার মতই তোমার জীবন। মানুষ যখন কাউকে আঘাত করে তখন প্রথম কারণ হয় সে একটা কোন পরিস্থিতির জন্য বিবশ হয়ে গেছে, ইংরেজীতে বলে the person has his own compulsion আর দ্বিতীয় কারণ তার অবশ্যই মাথা খারাপ। একজন স্ত্রীকে স্বামী মারধোর করে, স্বামী অসহায়, সে যদি মেনে নেয় স্ত্রী আমার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ, আমার থেকে অনেক বেশি গুণ আমার স্ত্রীর মধ্যে আছে, তাহলে সে মরে যাবে। মানুষ সব কিছুকে নিয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু আমি অপদার্থ, আমি হীন এই বিশ্বাস যদি এসে যায় সে আর বাঁচতে পারবে না, হতাশাতেই শেষ হয়ে যাবে। যে মারছে তার অসহয়তাকে যদি কেউ বার করে দেয় তখন আবার তার প্রতি করুণা এসে যাবে। একবার একজন ভদ্রলোক বাড়ির উপর খুব রেগেমেগে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছে এসে বললেন, আমি আর বাড়ি যাচ্ছি না, সব ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মহারাজ তাকে কিছু বললেন না, ওকে বসালেন, বসিয়ে বললেন, ঠাকুরের একটু প্রসাদ খান। তারপর এক গ্লাশ জল দিলেন। আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে, আপনি যান প্রসাদ খেয়ে আসুন তারপর কথা হবে। একজনকে দিয়ে ভদ্রলোককে খাওয়ার জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। খাওয়া-দাওয়া করার পর তার পেট ভরে গেছে, মনটাও আস্তে আস্তে শান্ত হতে শুরু করল। দূরপাল্লার ট্রেনে বাসে যাচ্ছেন, অনেকক্ষণ খাওয়া যদি না পাওয়া যায় মেজাজটা একটু একটু করে খিটখিটে হতে শুরু করবে। একটা মেয়ে বিয়ে করে তার স্বামীর ঘরে এসেছে, স্বামী সারা জীবন নিজের মাকে ভালোবেসে এসেছে, মেয়েটি চাইছে স্বামীকে মায়ের কাছ থেকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে আসতে, তার নিজের বিবশতা আছে। অন্য দিকে মায়েদের সমস্যা হল, ছেলেকে মানুষ করেছে ঠিকই, কিন্তু ছেলের মন এখন নতুন স্ত্রীর প্রতি গেছে, মায়েরও কিছু বিবশতা আছে। এই বিবশতাকে একবার যদি বিচার করতে যাওয়া হয় তখন দেখে সে সত্যিই অসহায়। দ্বিতীয়টা হল বেশির ভাগ লোকেরই মাথা খারাপ। পুরো মাথা খারাপ যদিও না হয় সেখানেও দেখা যাবে কিছু বিবশতা আছে। যখনই দেখবে সামনের লোকটির বিবশতা আছে তখনই তার প্রতি তার করুণা এসে যাবে। আমরা যে খনন কার্য করছি, চাষবাশ করছি, এগুলো না করলে মানুষ বাঁচতে পারবে না, কিন্তু আবার exploitationও হচ্ছে, সেইজন্য এখন বলা হচ্ছে তোমার যতটুকু দরকার তার বাইরে উৎপাদন করবে না। তার বাইরে যদি নিতে যাও তাহলে তুমি মরবে। ঐ ক্ষতিটা কেন করছে? মাথায় ছিট, ভোগ ঢুকে গেছে, ভোগের বাইরে আসতে পারছে না, সেটাও তার বিবশতা। ঐ বিবশতা পৃথিবী সহ্য করে নেবে কিন্তু কোন মানুষই সহ্য করবে না। মূল জিনিসটা হল, পৃথিবী জানে এরা আমার উপর অনেক উৎপাত করছে, অনেক আঘাত হানছে কারণ এদেরও কিছু বিবশতা আছে। ঠিক তেমনি তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, তার প্রতি কোন আক্রোশ প্রকাশ না করে ধৈর্য ধরে একটু সহ্য করে মেনে নিতে হয়।

কারণ তারও কিছু বিবশতা আছে। পৃথিবী থেকে অবধূত এই শিক্ষা পেলেন, শিক্ষা পেয়ে তিনি জীবনে সেটাকে কাজে লাগালেন।

পৃথিবীর মত সব কিছু সবাই সহ্য করতে পারবে না, যদি পারে তাহলে সে মহাপুরুষ। তুমিও পৃথিবীর মত সহনশীল হও, কারণ তোমাকে যে আঘাত দিচ্ছে তারও কিছু অসহায়তা আছে, তার এই অসহায়তা, বিবশতাকে ভেবে তার প্রতি তুমি করুণাশীল হও। আঘাত তোমাকে দুজনই করবে হয় তার বিবশতা আছে আর তা নাহলে মাথা খারাপ। মাথা খারাপ যার তার উপর ক্রোধ করা যায় না, তার থেকে সরে আসতে হয় আর যার বিবশতা আছে তার উপরেও রাগ করে কোন লাভ নেই, তার প্রতি করুণার ভাব। অবধূতের প্রথম গুরু পৃথিবী, যার কাছে তিনি ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা পেলেন। তিনি তাই কারুর উপর রেগে যান না। রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চারা হয়ত ঢিল ছুঁড়ছে, তিনি দেখছেন বাচ্চাদের বিবশতা হল মজা পাওয়া, মজা করা। খুব উচ্চ অবস্থায় না পৌঁছালে ধৈর্য আর ক্ষমার ভাব আসে না। আকবরের একটা কাহিনী আছে, একদিন দরবারে বাদশা আকবর বললেন, আমার গোঁফ যদি কেউ টেনে দেয় তার কি শাস্তি পাওয়া উচিৎ? সবাই বলল এক্ষুণি ওর মুণ্ডুটা কেটে ফেলে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বীরবল দরবারে এসেছে, বীরবলকেও আকবর বললেন, যদি কেউ আমার গোঁফটা ধরে টেনে দেয় তাকে কি করতে হবে? বীরবল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দিতে হবে। বাদশার গোঁফে হাত লাগাবে কার এমন বুকের পাটা আছে! তাহলে কে গোঁফ টেনেছে? আকবরের নাতি, নাতিকে কোলে নিয়ে খেলছিল, ছোট্ট বাচ্চা কিছু জানে না, দাদুর গোঁফটা ধরে নেড়ে দিয়েছে। বাচ্চার ওটাই খেলার, ওটাই মজার। অবধূত সারা জগতকেই ছোট্ট শিশুর মতন দেখছেন।

অবধূতের প্রথম গুরু পৃথিবীরই আবার দুটো বিকার আছে – পাহাড় ও বৃক্ষ, এরা যেন পৃথিবী থেকেই ফেটে বেরিয়ে আসছে। পাহাড় আর বৃক্ষ এদের অস্তিত্বটাই অপরের জন্য, নিজের জন্য কিছু নেই। বায়োলজিস্টরা বলবেন, কেন বৃক্ষও তো আলো নিচ্ছে, পৃথিবী থেকে জল টানছে। এখানে সেভাবে দেখলে হবে না, কোন জিনিসটাকে বলতে চাইছেন সেটাকে ধারণা করতে হয়। অবধূত হলেন পরমহংস, পরমহংসের বর্ণনা গীতাতেও করছেন, আবার ঠাকুরও বলছেন পরমহংস যেন কামারশালার নেহাই, যতই ওর উপর হাতুড়ি মারো ওর কিছুই হবে না। পরমহংসেরও ঠিক তাই হয়, তাকে যদি কেউ আঘাত করে তাতে তাঁর কিছুই হয় না। গীতায় ভগবান বলছেন *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*, গুরু দুঃখ, বিরাট দুঃখ এসে গেলেও তিনি বিচলিত হবেন না। এর উল্টোতেও একই হয়, বিরাট কিছু লাভ হয়ে গেল, তাতেও তিনি উৎফুল্ল হন না। নিজেকে তিনি এত বিশাল করে নিয়েছেন যে এর কোনটাই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না। দত্তাত্রেয় পৃথিবী থেকে যেমন ধৈর্যের শিক্ষা নিয়েছেন, ঠিক তেমনি পাহাড় আর বৃক্ষ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তোমার যা কিছু কর্মোদ্যম হবে তার সবটাই যেন অপরের মঙ্গল ও কল্যাণে লাগে, তুমি নিজের জন্য কোন কিছু করবে না। পাহাড়ও নিজের জন্য কিছু করে না আর বৃক্ষ লতাদিও নিজের জন্য কিছু করে না, যা কিছু ফুল, ফল, পাতা হয় সব অপরের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। সব মিলিয়ে এই পৃথিবী আর তার বিকার, পাহাড় আর বৃক্ষকে পৃথিবীর বিকার বলা হচ্ছে। পৃথিবীই পাহাড় হয়ে জন্মেছে, পৃথিবীই আবার বৃক্ষ হয়ে জন্ম নেয়। আমাদের ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর, দেখছেন গাছপালা পৃথিবীরই বিকার। একটা বীজ মাটিতে পড়ছে, মাটিতে পড়ে সে পৃথিবী থেকেই তার বেড়ে ওঠার রসদ গ্রহণ করছে। সেটাই আবার আস্তে আস্তে অন্য রূপ ধারণ করে নিচ্ছে। পৃথিবী থেকে ধৈর্য আর পাহাড় ও বৃক্ষ থেকে অপরের সেবা করার শিক্ষা পেলেন।

এই যে এখানে বলছেন, পাহাড় আর বৃক্ষ থেকে আমি শিক্ষা পেলাম জীবনটা অপরের জন্য, সব কিছু অপরকে দিয়ে দেব। কিন্তু তাও তো আমরা অপরকে কোন কিছু দিতে চাই না। কেন অপরকে দিতে চাই না,

অপরকে সেবা আমরা কেন করতে চাই না? ঠাকুর আবার বলছেন, এমনই দুষ্ট স্বভাব যে দুপয়সার বাতাসা আনতে বললে চুসতে চুসতে নিয়ে আসে। আবার বলছেন, কেউ যদি বলে এখানে প্রস্বাব করতে সে করবে না, ওর ভয় আছে প্রস্বাব করলে পাছে ওর যদি কিছু লাভ হয়ে যায়! আমরা যে কাউকেই কিছু দিই না তাও ঠিক না, একজন মহিলা যতই কৃপণ হোক, এক সময় নিজের সন্তানকে তো সে দুধ খাইয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল আমরা কিছু কিছু জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখি। যে জিনিস গুলিকে আমরা আঁকড়ে ধরে রাখি, যেটাকে মনে করছে এটা আমি, এটা আমার, ওই জিনিসটা যখন চলে যায় আমরা কষ্ট পাই, যাতে না চলে যায় তারই জন্য আমাদের যত লড়াই। মহাপুরুষদের আবার আত্মজ্ঞান ছাড়া কিছু নেই, আত্মা ছাড়া উনি আর কিছুতে অবস্থিত নন। আমরা মনকে এত ছোট করে রেখেছি যে ছোট ছোট জিনিসের সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছি।

আমাদের জীবনে সঙ্গের খুব প্রভাব পড়ে, কার সাথে আমি মেলামেশা করছি, কার সঙ্গ করছি এর একটা প্রভাব আমাদের সবারই জীবনে পড়ে। এখন আমরা দত্তাত্রেয়র সঙ্গ করছি, যিনি একজন তরুণ সন্ন্যাসী, বিদ্বান, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই আলোচনা চলছে, সেইজন্য আমরা এখন তাঁর সঙ্গে আছি। আমরা যদি মহৎ পুরুষদের সাথে চলি তবেই আমরা মহৎ হতে পারব। যদি অতি সাধারণ মানুষদের সাথে ওঠাবসা করি তখন আমরাও অতি সাধারণ মানুষ হয়েই থেকে যাব। ঠাকুর বলছেন সত্তা হরণ করে, হারু খুব ভালো ছেলে কিন্তু ওকে এখন একটা প্রেতনী ধরেছে, হারু এখন আর কিছু করে না, খায় না দায় না শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু শুধু হারু নয়, আমি, আপনি সবাইকে প্রেতনী ধরে রেখেছে। যার সাথে আমরা থাকব সে আমাদের পুরো তেজ হরণ করে নেবে। আমরা মানতে চাইব না, আমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, স্বামী আছে, পাড়া প্রতিবেশী আছে, সবাই এক একটা প্রেতনী। আমাদের বিশ্বাস হবে না ঠিকই কিন্তু এটাই সত্য। ঠাকুরও বলছেন যে যার সঙ্গ করে সে তার সত্তা পায়, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সত্তা পায়, যার অধীনে কাজ করে তার সত্তা পায়। চোখ কান বন্ধ করে জেনে নেওয়া দরকার যে সমাজে শুধু দুষ্ট লোকই আছে। দুষ্ট লোকের একটাই সংজ্ঞা আত্মকেন্দ্রিক, জগতে কাউকেই পাওয়া যাবে না যে আত্মকেন্দ্রিক নয়। অবধূত এটাই বলছেন, পাহাড় আর বৃক্ষের কাছ থেকে শিক্ষা পেলাম, আমার সব কিছু অপরের জন্য, আত্মকেন্দ্রিক নয়। আধ্যাত্মিকতার অর্থই হয় সে আর আত্মকেন্দ্রিত নয় আর এর বিপরীত জাগতিকের অর্থই হল আত্মকেন্দ্রিত। কিন্তু এটাই পরিতাপের যে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া মানে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অথচ আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার অর্থ হয় আমি বোধ যখন নিজের শরীর মনকে কেন্দ্র করে চলে।

জাতক কথায় একটা গল্প আছে, বুদ্ধ এক জন্মে একজন শেঠ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। কেউ যদি ভিক্ষায় আসে সেই শেঠ থালায় সুন্দর করে খাবার সাজিয়ে অতিথিকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো। একদিন শেঠের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এক ব্রাহ্মণ এসেছেন, দেবতারা তখন শেঠকে বলছেন সাবধান এরপর আর এগোবে না, এই দেখ নরকের আগুন, এই নরকের আগুনে গিয়ে তুমি পতিত হয়ে যাবে। বোধিসত্ত্ব তখন দেবতাদের বলছেন, আমি দান ধর্মে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গে যাওয়ার জন্য নয় আর নরকের ভয়েও নয়। আমি যদি নরকের আগুনেও পড়ে যাই তাও আমি দান ধর্ম থেকে কখনই বিচ্যুত হব না। তিনি এগিয়ে যেতেই দেখেন আর কোন আগুন নেই। পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ইন্দ্র ঐ আগুন তৈরী করেছিল। ধর্ম মানেই তাই, আমার এটা ধর্ম। কেন ধর্ম করছি? কারণ এটাই আমার ধর্ম। আমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কেন নিচ্ছি? এটাই আমার ধর্ম, প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম। আমি দান কেন করছি? এটাই আমার ধর্ম। যদি দান করার পর মনে হয়, এই দান করার পর লোকেরা আমাকে মানুক জানুক, তাহলে ভাই তুমি এই দান করা বন্ধ করে নিজের কাছেই রেখে দাও। যদি মনে কর দান করলে স্বর্গে যাবে, বন্ধ কর দান করা, স্বর্গে যাওয়ার তোমার দরকার নেই, তাতে তুমি অনেক ভালো

লোক হবে। নিজের ব্যক্তিত্বের বাইরে কখনই যাবে না, তাতে তুমি আরও বেশি সহজে ভালো মানুষ হবে, ধর্মকে কখনই ছাড়বে না। দত্তাত্রেয় পাহাড় ও বৃক্ষ থেকে এই শিক্ষা নিচ্ছেন, এরা কোন কিছুর বিনিময়ে, কোন কিছুর প্রত্যাশায় নিজেকে অপরের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছে না, এটাই তাদের ধর্ম। এখানে দত্তাত্রেয় যে শিক্ষা পাহাড় আর বৃক্ষ থেকে নিচ্ছেন এই শিক্ষা আমরা নিতে পারব না, কারণ সেই প্রস্তুতি আমাদের নেই, যেটাতে আমাদের inner growth হবে সেটা আমাদের নেই। কেউ যখন কারুকে কিছু দেয় সে তখন জানছে যে সে আমার, নিজের জন ছাড়া মানুষ কাউকে দিতে চাইবে না। যে ভক্ত সে জানে কাঙাল, গরীব এরাও ঠাকুরের সন্তান, যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন এই কাঙালী, ভিখারী এরা আমারই আত্মার রূপ। যতক্ষণ এই বোধ না আসে, এরা আমার ভাই, আমারই স্বরূপ ততক্ষণ কাউকে কিছু দিতে পারবে না। যতই আমরা পাহাড় থেকে শিক্ষা নিই, বৃক্ষ থেকে শিক্ষা নিই যতক্ষণ হৃদয় না খুলছে, এই জগতটা আমার, এই বোধ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পরার্থে জীবন দেওয়া যাবে না। অবধূত শেষে তাই বলছেন *শশ্বৎ পরার্থসর্বেহ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ। সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্।।১১৭/৩৮।।* পর্বত ও বৃক্ষ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সমগ্র জীবনটাই অপরের কল্যাণের জন্য বা এদের জন্মই জগতের মঙ্গলের জন্য। সাধু পুরুষদের উচিত যে এই দুজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে পরোপকার করার শিক্ষা গ্রহণ করা।

(২) বায়ু

অবধূতের দ্বিতীয় গুরু বায়ু। বায়ুকে অবধূত দুভাবে দেখছেন, অন্তর্বায়ু আর বহির্বায়ু, অর্থাৎ শরীরের ভেতরের বায়ু আর শরীরের বাইরের বায়ু। শরীরের ভেতরের বায়ুকে বলা হয় প্রাণবায়ু, প্রাণবায়ু না বলে শুধু প্রাণও বলা হয় আর শরীরের বাইরের বায়ুকে বায়ু বলা হয়। আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেটাও বায়ু আর যেটা বেরিয়ে আসছে সেটাও বায়ু। বাইরে যে বাতাস সেটাও বায়ু, কিন্তু শরীরের ভেতরে যখন বায়ু যায় তখন সেই বায়ু প্রাণন ক্রিয়া করে, প্রাণন ক্রিয়া মানে জীবনকে সঞ্চালন করা, সেইজন্য এর আলাদা নাম, বলছেন প্রাণ। বায়োলজির শিক্ষক বলবেন বাইরেরটাও বাতাস, ভেতরেরটাও বাতাস। আমাদের কাছে ভেতরের বাতাসটা বাতাস নয়, যখন ইঞ্জিন চলে তখন তার যে একটা ফ্লাই হুইল থাকে সেটাই পুরো ইঞ্জিনকে বা কোন মেশিনকে চালায়, যে বায়ু শরীরের মধ্যে যাচ্ছে এই বায়ুকে আধার করে প্রাণ চলে। প্রাণটাই ক্রিয়াবান হয়, যেখানেই ক্রিয়া সেখানেই প্রাণ, যেখানে ক্রিয়া সেখানে কিন্তু বায়ু নয়। প্রথমের দিকে ইলেক্ট্রন প্রোটন নিয়ে যখন রিসার্চ হত তখন পুরো ভ্যাক্যুম করে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রোটন ছাড়া হত, সেখানে ইলেক্ট্রন প্রোটনের যে মুভমেন্ট হচ্ছে এগুলো সব প্রাণনক্রিয়া কিন্তু সেখানে কোন বায়ু নেই। আমাদের শরীরে বা যে কোন জীবিত প্রাণীর শরীরে যে প্রাণনক্রিয়া চলে সেখানে বায়ু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ ঐ ক্রিয়া বায়ুকে আশ্রয় করে চলে। প্রাণীর শরীরে ক্রিয়া যখন বায়ুকে আশ্রয় করে চলে তখন তাকে বলে প্রাণ, সেইজন্য আমাদের বলা হয় প্রাণী। কিন্তু রেলের ইঞ্জিন যখন চলছে, তার চাকা ঘুরছে, ওটা কিন্তু প্রাণ নয়। প্রাণ সব সময় ব্যবহার হয় জীবিত প্রাণীর প্রাণনক্রিয়াতে, জীবিত প্রাণী ছাড়া প্রাণ শব্দ আসবে না।

অবধূত বলছেন *প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ। জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙমনঃ।।*১১/৭/৩৯। শরীরকে প্রাণ একা চালাতে পারে না, শরীর চালানোর জন্য প্রাণকে অন্য কিছুর থেকে সাহায্য নিতে হয়। যে কোন ইঞ্জিন চালানোর জন্য দরকার জ্বালানী, যতক্ষণ জ্বালানী না দেওয়া হবে ইঞ্জিন চলবে না। বিজ্ঞানীরা প্রথমের দিকে perpetual machine তৈরী করার চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন, perpetual machineএর concept ছিল একবার চালু কর দিলে মেশিন চলতেই থাকবে, সেখান থেকে যত খুশি এনার্জি বার করতে পারবে। এটাকে নিয়ে পরে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন, অনেক চালাকি করা

হয়েছে, কিন্তু পরে গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয় perpetual machine বলে কিছু হতে পারে না। মেশিনে যত এনার্জি দেওয়া হবে তার বেশি সেই মেশিন থেকে কোন দিন কিছু পাওয়া যাবে না, ওর থেকে বরং কমই পাওয়া যাবে আর খুব ভালো হলে সমান সমান পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমান সমান পাওয়াটা সম্ভব হয়নি। একটু কমে যাবে, কারণ transformation যখন হয়, একটা অবস্থা থেকে যখন দ্বিতীয় অবস্থায় যায় তাতে একটু এনার্জি বেরিয়ে যায়। ইদানিং ইলেক্ট্রিসিটিতে সুপার কণ্ডাক্টিভিটি এসেছে, তাতে বিজ্ঞানীরা বলছেন শতকরা একশ ভাগই পাওয়া যাবে। তবে এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ, কিন্তু যেটুকু এনার্জি দেওয়া হবে তার থেকে বেশি কোন দিন পাওয়া যাবে না। যে শরীর চলছে এই শরীর প্রাণনক্রিয়াতে চলছে, তার দরকার আহার। প্রাণ কিন্তু একবারও বিচার করছে না আমরা কি খেয়েছি, প্রাণ শুধু যেটা খেয়েছি ওটাকে টেনে নিজের কাজে লাগিয়ে নেয়।

প্রাণ পাঁচ রকমের, সব কটিকে প্রাণই বলা হয়। এই পাঁচটি প্রাণের নাম প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। আমাদের শাস্ত্রে যে পঞ্চপ্রাণের কথা বলেন এটাই সেই পাঁচটি প্রাণ। এখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা প্রাণন ক্রিয়া হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই যে এনার্জি চলছে এটাকেই বলছে **প্রাণ**। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে প্রাণন ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন তার ছাড়া ইলেক্ট্রিসিটি চলবে না, আপনি বলবেন কেন আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, ঠিকই, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় চলবে না। আর আমরা হলাম সাধারণ অবস্থার লোক। সাধারণ অবস্থায় যেমন তার ছাড়া ইলেক্ট্রিসিটি চলবে না, ঠিক তেমনি বায়ু ছাড়া প্রাণ চলে না। কিন্তু প্রাণ আর বায়ু দুটো আলাদা জিনিস। বলে, প্রাণ জিনিসটা ঠিক নাকের ডগায় থাকে, আর কারুর মতে হৃদয়ে থাকে। প্রাণ সব সময় ঊর্ধ্বগামী। যার জন্য মানুষ মারা গেলে আমরা বলি ঊর্ধ্বগামী প্রাণ তার শরীর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। দ্বিতীয় **অপান**, যে এনার্জিটা শরীরের নীচের দিকে যায় সেটাকে বলে অপান। অপান সচরাচর কোমড়ের নীচের দিকে থাকে। তৃতীয় **ব্যান** শরীরের সব দিকে চলে, সমস্ত শরীরেই ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য শরীরের সব কটি অঙ্গে ব্যানের স্থান। যদি দেখা যায় হাতে ফোড়া হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে ব্যান গোলমাল করছে। ব্যান যদি ঠিক থাকে তাহলে ফোড়া হবে না। যোগীরা ইচ্ছাশক্তিতেই ব্যাধি নিরাময় করে নিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তিতে নিরাময় করা মানে ব্যাধির জায়গাতে তাঁরা ব্যান শক্তিকে প্রবাহিত করে দেন। এমনকি চিন্তা তরঙ্গ প্রেরণ করে দূরের মানুষের শারীরিক ব্যাধিকেও সারিয়ে দেওয়া যায়। যাকে সে ভালোবাসে তার শরীরে হয়ত কোন কষ্ট হচ্ছে, সে হয়ত তার থেকে অনেক দূরে আছে, সে যদি ইচ্ছাশক্তিতে মনে মনে চিন্তা করে করে ব্যান শক্তিকে তার শরীরে প্রবাহিত করে দেয়, তাতে শরীরের ব্যাধি আস্তে আস্তে নিরাময় হয়ে যাবে। স্বামীজীও এই জিনিসটাকে নিয়ে গুরুভাইদের চিঠিতে লিখছেন, চিন্তা তরঙ্গ প্রেরণ করেও দূরের মানুষকে ব্যাধি থেকে মুক্ত করা যায়। আর যে ভালোবাসে সেও যদি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে তখন তার ব্যান শক্তি জাগ্রত হয়ে অপরের ব্যাধিকে সারিয়ে দিতে পারে। ছোট সন্তানদের মায়েরা এভাবেই দিনরাত রোগ সারিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চার হাতে বা পায়ে একটু চোট পেয়ে হয়ত ব্যাথা হতেই কাঁদতে শুরু করল, মা দৌড়ে এসে বলছে, দেখি দেখি কি হয়েছে, বলেই একটু ফু ফা করে দিল, বাচ্চা মনে করছে কোন মন্ত্রটন্ত্র দিয়ে সারিয়ে দিচ্ছে। তাতে বাচ্চার মস্তিষ্ক তার ব্যান শক্তিকে চালু করে দেয়। ব্যান শক্তি চালু হয়ে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে ব্যাথাটা কমে যায়। প্রাণিক হিলিং যারা করে তারাও ঠিক এটাই করে। চতুর্থ হল **উদান**, মানুষ যখন মারা যায় তখন উদান বায়ু কাজ করে, উদানের অবস্থান কণ্ঠে। উদানের কাজ হল, মৃত্যুর সময় উদান ভেতরের জীবাত্মাকে নিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। জীবাত্মাকে শরীর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারও একটা শক্তির দরকার, সেই বিশেষ শক্তি হল উদান। উদান বেরিয়ে গেলে

প্রাণশক্তি আর কাজ করবে না। শেষ হল **সমান**, সমান মূলতঃ পেটের এলাকায় কাজ করে। খাদ্য হজম করাটা পেটের কাজ, সমানের কাজ হলে খাদ্যের সার অংশকে শোষণ করে শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া। অনেকের দেখা যাওয়া খাওয়া-দাওয়া ঠিকই করছে কিন্তু শরীরে খাওয়াটা লাগছে না, তখন বুঝতে হবে সমান বায়ু গোলমাল করছে, তার মানে assimilationটা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। এই হল পঞ্চপ্রাণ। এই পঞ্চপ্রাণ দাঁড়িয়ে আছে আহারের উপর, খাওয়া-দাওয়া যদি না করে পঞ্চপ্রাণ আর কাজ করতে পারবে না। পঞ্চপ্রাণ চলে বায়ুর উপর কিন্তু ওদের দরকার এনার্জি সাপ্লাই, এনার্জি সাপ্লাই আসে খাওয়া-দাওয়া থেকে।

কিছু কিছু পণ্ডিত আছেন এনারা আরও পাঁচটি প্রাণের কথা বলেন। এনাদেরটা যোগ করলে দশটি প্রাণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রধান প্রাণ বলতে এই পঞ্চপ্রাণকেই বোঝায়, যে পাঁচটি প্রাণের কথা বলা হল। বাকি পাঁচটি প্রাণের প্রথমটা হল **নাগ**, যখন বমি হয়, বমি করার জন্য একটা শক্তির দরকার, ওনারা সেই শক্তিকে বলছেন নাগ। দ্বিতীয় **কুর্ম**, চোখের পাপড়ি খোলা বন্ধ করার কাজ যে শক্তিতে হয় তাকে বলছেন কুর্ম। অনেক সময় সুন্দর দৃশ্য অবাক হয়ে দেখছে, আমরা বলি, কিরে তোর যে চোখের পাতা পড়ছে না, কুর্মটাও একটা প্রাণ, তার মানে কুর্ম কিছুক্ষণের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তৃতীয় হল **ক্রিকল**, ক্রিকল আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক তৈরী করে। মন্দাগ্নি একটা শব্দ আছে, যার খিদে হয় না, তার মানে তার ক্রিকল প্রাণ গোলমাল করছে। আয়ুর্বেদে এই প্রাণ শক্তি গুলিকেই ঠিক করার চেষ্টা করে। চতুর্থের নাম **দেবদত্ত**, দেবদত্ত আমাদের হাই তোলায়। দেবদত্ত প্রাণ আছে বলে আমরা হাই তুলতে পারছি। যদি ঘন ঘন হাই তোলে তাহলে বুঝতে হবে দেবদত্ত প্রাণ খুব সক্রিয় হয়ে গেছে, দেবদত্ত সক্রিয় হওয়া মানে এখন তার ঘুমের দরকার। পঞ্চম ও শেষ হল **ধনঞ্জয়**, সমান যে ভুক্ত খাদ্যকে assimilate করেছে সেটাকে এবার ধনঞ্জয় পোষণ করে। শরীরটা যদি ঝকঝকে সুস্থ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে ধনঞ্জয় প্রাণ কাজ করছে না। মোট এই দশটি প্রাণ, তবে প্রথম পাঁচটাই প্রধান প্রাণ। পরের পাঁচটাকে সবাই মানে না, কিন্তু শাস্ত্রে পরের পাঁচটি প্রাণের কথাও আছে।

এই যে দশটি প্রাণের কথা বলা হল, এদের সবাইকে কাজ করতে হয়। বলছেন এরা কখনই খাওয়া-দাওয়ার বিচার করে না। যে খাওয়াই ভেতরে যাক, সব খাওয়াকেই এরা শক্তিতে রূপান্তরিত করে কাজ করতে থাকে। প্রাণ থেকে অবধূত শিক্ষা পেলেন খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোন আসক্তি রাখতে নেই। ঠাকুর বলছেন, মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে এগোয় তখন তার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আড়ম্বর থাকে না, একটু ঝোল-ভাত হলেই হয়ে যায়। তার থেকেও মারাত্মক হল, জিহ্বাতে যদি রুচি বা রসবোধ থাকে তাহলে তার বিপদে পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না। একটা প্রচলিত কথাতে বলে, কামজয়ী হওয়া যায় কিন্তু রসনাজয়ী হওয়া যায় না। সেইজন্য বলে জিহ্বা আর জননেন্দ্রিয় এই দুটোকে যিনি জয় করে নিয়েছেন তিনি মহাপুরুষ। তাতেও বলা হয় বয়সের সাথে সাথে জননেন্দ্রিয়ের ইচ্ছাটা কমে যায়, কিন্তু জিহ্বার আকাঙ্খা বয়স হলে আরও বেড়ে যায়। এটাকে আরও বিস্তার করে বলছেন *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, যে কোন কাজ যখন করা হবে, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ঘুমনো কোন অবস্থাতেই জ্ঞান যেন নাশ না হয়। কালীপদ ঘোষ মদ খেতেন, ঠাকুর তাঁকে মদ খেতে নিষেধ করছেন না, কিন্তু বলছেন, যেটাই খাবে মাকে অর্পণ করে খাবে। তারপরেই বলছেন, পা যেন না টলে। *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, খাওয়া-দাওয়া এমন যেন না হয় যার জন্য তোমার আত্মবিস্মৃতি হয়ে যায়। একবার একজন ভক্ত কোন সাধুকে বলছেন, আপনারা তামাক, সিগারেট কেন সেবন করেন, তামাক সেবনে যদি দোষ না থাকে তাহলে মদ্যপানে কি দোষ? মঠে মদ খাওয়া কেন নিষেধ? স্বামীজী মঠের সাধুদের জন্য নিয়মাবলী তৈরী করেছেন তার মূলটা কি? এর মূলই হল *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, কোন পরিস্থিতিতে যেন তোমার আত্মবিস্মৃতি না হয়। ঠাকুর বলছেন স্বদারা গমনে দোষ নেই। কারণ সেখানে মনের

নাশ হয় না, কিন্তু পরকীয়া প্রেমে, অন্যের স্ত্রীর সাথে যদি প্রেম করে তখন তার চিত্তে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে তার মনের নাশ হয়ে যাবে আর তার সত্তাকে পুরো হরণ করে নেবে। নিজের স্ত্রীর সাথে থাকলে মনে চাঞ্চল্য আসবে না। খাওয়াটাও যদি লোভে পড়ে বেশি হয়ে যায়, খাবারে ঝাল মশলা বেশি আছে, এই ধরণের কিছু কিছু খাবার আছে, যেগুলো খেলে মনকে নাশ করে দেবে।

প্রাণ থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম, যতটুকু কাজ ততটুকুই করতে হবে, তার বাইরে কখনই না। তার মানে খাওয়া-দাওয়া যেটা হবে সেটা যেন মনকে নাশ করতে না পারে, মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য না আনতে পারে। মঠ মিশনে বিশেষ বিশেষ দিনে একটু অন্য ধরণের কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়, কিন্তু কোন দিন কোন সন্ন্যাসীকে দেখা যাবে না যে, খাওয়া-দাওয়া করার পর খাবার নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু বাইরের লোকেরা এটা পারে না, খাওয়া নিয়ে কত আলোচনা, কত কাহিনী যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। মূল হল মনই সব কিছু, মনে যেন কোন পরিস্থিতিতেই চাঞ্চল্য না আসে, আর *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, জ্ঞানের নাশ যেন না হয়। শুধু খাওয়া-দাওয়ার সাথেই এর সম্পর্ক নেই, সব কিছুতেই দেখতে হবে মনে যেন চাঞ্চল্য না আসে আর জ্ঞানের নাশ যেন না হয়। টাকা যদি বেশি থাকে সেখানেও একই হবে, জ্ঞানের নাশ হয়ে যাবে। সারাক্ষণ এই চিন্তা, কোন ব্যাঙ্কে রাখা যাবে, কত ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে, শেয়ারে লাগালে কি হয়, মিউচাল ফাণ্ডে রাখলে দু বছরেই ভালো রিটার্ন আসবে, মন বনবন করে ঘুরছে তো ঘুরছেই।

রিচার্ড ফাইনম্যান একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। খুব কম বয়সেই তিনি প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তার বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। খুব মেধাবী ছিলেন। ওনার হঠাৎ একবার মনে হল যেখানে আছেন ওরা মাইনে কম দিচ্ছে। উনি অন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে লিখেছেন। এখানে হাজার ডলার করে পাচ্ছিলেন, ওরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠাল আমরা বারশ ডলার দেব আপনি চলে আসুন। উনি গিয়ে নিজের প্রধানকে বলেছেন। প্রধান বলে দিলেন, তোমাকে ছাড়াছাড়ি করতে হবে না, আমাদের এখানে যে একবার আসে সে আর ছেড়ে যায় না, ওরা তোমাকে বারশ ডলার দেবে বলছে, ঠিক আছে আমরা তোমাকে পনেরশ ডলার দেব। উনিও ঐ ইউনিভার্সিটিতে লিখে পাঠালেন এরা পনেরশ ডলার দেবে বলছে। ওরাও লিখে পাঠালো, আমরা আপনাকে সতেরশ ডলার দেব। আবার তিনি নিজের ইউনিভার্সিটির প্রধানকে বলেছেন, উনি বলে দিলেন আমরা তোমাকে আঠারোশ ডলার দেব। ফাইনম্যান নিজের বায়োগ্রাফিতে লিখছেন, এই টাকাটা নিয়ে আমি কি করব? নিজেই তখন লিখছেন, নিশ্চয়ই আমি একটি প্রেমিকা রাখব, তাকে একটা বাড়িতে রাখব, এরপর সারাটা দিন ওর কথা ভাবতে থাকব, সে ঠিকঠাক আছে কিনা, আমার অনুপস্থিতিতে অন্য কাউকে ধরে এনেছে কিনা, সারাদিন ওর কথা চিন্তা করতে করতে আমার যে ফিজিক্সের লেখালেখি, পড়াশোনার কাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ইনি নিজের প্রধানের কাছে গিয়ে বললেন, আমার এক ডলারও বেশি লাগবে না, যা পাচ্ছিলাম তাই থাকবে।

আমাদের দেশে যে পাঁচ হাজার ছয় হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণদের যে আত্মত্যাগ তাতে এটাই ছিল, তুমি বিদ্যার প্রতি সমর্পিত হও। বিদ্যার প্রতি সমর্পিত হওয়া মানে তোমার কাছে যেন পয়সা না থাকে। সেই থেকে ব্রাহ্মণরা এমনই গরীব হয়ে গেলেন যে নিজের স্ত্রী সন্তানকেও ঠিক মত খাওয়াতে পারতেন না। কিন্তু এরই ফলশ্রুতি হল, ব্রাহ্মণরা বিদ্যার প্রতি সমর্পিত থাকতে পেরেছিলেন, *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, জ্ঞানের যেন নাশ না হয়ে যায়। যে কোন জাগতিক জিনিস বেশি থাকলেই জ্ঞানের নাশ হবে, তা সে টাকাই হোক, পোষাক হোক, জমি-জায়গা হোক। কিন্তু এখানে শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বলছেন, খাওয়া-দাওয়াও যদি বিশেষ ভাবে করতে ইচ্ছে হয়, ইদানিং কালে যেমন কিছু হলেই বলবে চলো আজ বাইরে কোন হোটেল রেস্টুরেন্টে ভালো মন্দ

খেয়ে আসি, বুঝবেন গোলমাল আছে। যোগী বা সন্ন্যাসী কখনই বলতে পারবেন না যে চলো বাইরে খেয়ে আসি। দত্তাত্রেয় আবার যোগীও নন, উনি পরমহংস, কোন প্রশ্নই উঠবে না। আর কোন কারণে যদি খাওয়া-দাওয়া করতেও হয়, জ্ঞানে চাঞ্চল্য হবে না। এমনিতেও চল্লিশ পেরিয়ে গেলে বেশি খাওয়া-দাওয়াও শরীরের দরকার হয় না। বেশি খাওয়া-দাওয়া করলে হজম করতেও অনেক শক্তি বেরিয়ে যায়। গাড়ির ইঞ্জিনকে স্টার্ট করার জন্য যেমন ব্যাটারি লাগে তেমনি খাওয়া হজম করার জন্য একটা শক্তি লাগে। একটা বয়সের পর মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। সাধারণ মানুষের হজম করতেই বেশির ভাগ শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। শরীরের শক্তি যদি খাওয়াতেই ক্ষয় হয়ে যায় এরপর কোন শক্তিতে জপ করবে, ধ্যান করবে, পড়াশোনা করবে, ঈশ্বর চিন্তন করবে, সম্ভবই নয়! খাওয়া-দাওয়াতে গোলমাল পাকালে দ্বিতীয় যেটা হয়, তা হল, প্রথমে বুদ্ধিটা বিকৃত হয় আর বুদ্ধি বিকৃতির সাথে সাথে বাণীতেও বিকৃতি আসা শুরু হয়, তখন আলতু-ফালতু কথা বেরোতে থাকবে। অবধূত এটাকে আটকাচ্ছেন।

শরীরের অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে যে প্রাণবায়ু চলছে, শরীরের জন্য যতটুকু প্রাণবায়ুর দরকার সে ততটুকুই গ্রহণ করে। বায়ুর থেকে আমি শিক্ষা নিলাম আমার শরীর ধারণের জন্য, জীবননির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আমাকে এই জগৎ থেকে গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনের বেশী একটুও রাখতে নেই। আমার নিজেরই শরীরের চারিদিকে এত বাতাস রয়েছে, কিন্তু সে ঠিক ততটুকুই নিচ্ছে যতটুকু শরীরের জন্য দরকার। ঠিক তেমনি জগতে এত কিছু আছে কিন্তু ততটুকুই নিতে হয় যতটুকু আমার দরকার, তার বেশী এতটুকুও নিতে নেই। এই শিক্ষা কে নিয়েছেন? দত্তাত্রেয়। আমাদের সবারই তো শরীর রয়েছে, সেই শরীরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা প্রাণবায়ু চলছে, আমরা কি পারছি প্রাণবায়ুর ধর্মকে লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষা নিতে? পারি না। যদি পারি তাহলে আমরাও মহৎ হয়ে যাব।

এতক্ষণ ভেতরের প্রাণ যে কাজ করে তার কথা বললেন, এবার বাইরের বায়ুকে নিয়ে বলছেন। *বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ। গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ।*।১১/৭/৪০। শরীরের মধ্যে যে প্রাণবায়ু চলছে, তার থেকে কি শিক্ষা পেলেন বলা হল। বাইরে বায়ু থেকে দত্তাত্রেয় কি শিক্ষা পেলেন? বাইরের বায়ু থেকে দত্তাত্রেয় নির্লিপ্ত থাকার শিক্ষা পেলেন। বায়ু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কোন কিছুতেই বায়ু লিপ্ত হয় না। বায়ু সর্বত্র বিচরণ করছে, ভালো জায়গায় যাচ্ছে, মন্দ জায়গায় যাচ্ছে, দুর্গন্ধ যুক্ত জায়গায় যাচ্ছে, সুগন্ধ যুক্ত জায়গায় যাচ্ছে, কিন্তু কোন জায়গার প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে না। বায়ু বলে না যে এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে, এই জায়গা ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। বায়ুর মধ্যে কখন দুর্গন্ধ আসছে কখন সুগন্ধ আসছে কিন্তু বায়ু সব সময় নির্বিকার, তার স্বভাব সব সময় অপরিবর্তিতই থাকে। পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটি তত্ত্বের তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবী তত্ত্বের বিশেষত্ব হল গন্ধ। গন্ধ পৃথিবীর গুণ, কিন্তু গন্ধকে বহন করার দায়ীত্ব বায়ুর। গন্ধকে বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু তার সঙ্গে বায়ু কোন সম্পর্ক স্থাপন করে না, সে শুদ্ধ পবিত্রই থাকে, গন্ধের গুণ বায়ুকে স্পর্শ করতে পারেনা, অপরের ধর্মকে বায়ু গ্রহণ করে না।

প্রত্যেকটি মানুষের একটা ধর্ম থাকে, প্রত্যেকটি তত্ত্বেরও একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। বায়ু সর্বত্র বিচরণ করছে, সব জায়গাতে তাকে যেতে হয়, যেটা অগ্নিকে যেতে হয় না, জলকে যেতে হয় না। বায়ু যেখানে থাকবে না সেখানেই শেষ, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। আমাদের সবাইকেই অনেক জায়গায় যেতে হয়, ভালো লোকের কাছে যেতে হয়, মন্দ লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, যার সাথেই মেলামেশা করতে যাই তার সাথে আমরা জলের মত মিশে যাই। জল যখন কারুর সাথে মেশে তখন সে তারই আকার ধারণ করে নেয় বা জল তার ধর্মকেই গ্রহণ করে নেয়। বায়ু কখনই কারুর ধর্ম গ্রহণ করে না। বায়ুর ধর্ম হল চলা, বায়ু চলতে থাকে। চলতে চলতে

কোথাও বায়ুতে কোন গন্ধ ঢুকে গেল, গন্ধও বায়ুর সাথে চলতে চলতে কিছুটা যাওয়ার পর গন্ধ পড়ে গেল, বায়ু নির্বিকার, সে চলছে। আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি, যেতে যেতে একটা জায়গায় দুর্গন্ধ লাগছে ঠিকই, দূরে চলে গেলে আর দুর্গন্ধ নেই, কারণ বায়ু নির্বিকার। বদ্ধ ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, জানলা দরজা খুলে দেওয়া হল, সব দুর্গন্ধকে বায়ু পরিষ্কার করে দিল, বায়ু কিন্তু নির্বিকার। বক্তব্য হল, যদি নিজের ধর্মে অবস্থিত থাকে, লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে, এরপর সে ভালো-মন্দ কোন কিছুর সংস্পর্শে আসছে, লোকজনদের সাথে মেলামেশা করছে, কোন কারণে যদি এদের প্রভাব তার উপর এসেও যায়, তার উপরে এদের আরোপ যদি হয়েও যায়, তাতে কখনই নিজের ধর্ম পরিবর্তন হতে দিতে নেই। সমস্যা হল আমাদের কারুরই জীবনে কোন লক্ষ্য নেই, চলে যাচ্ছে তো চলেই যাচ্ছে। ট্রেনের জন্য আমরা যেমন প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, কখন চায়ের স্টলের সামনে যাচ্ছি, কখন বইয়ের দোকানে যাচ্ছি, কখন পায়চারি করি, এই দোকানটা দেখছি, সেই দোকানটা দেখছি। মাইকে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার ঘোষণা হল, চারিদিকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল, আমরাও জিনিসপত্র গুলি ঠিকঠাক করতে শুরু করি। আমাদের সবারই জীবন এই রকম, একটা ট্রেন, যে ট্রেনের নাম মৃত্যু এক্সপ্রেস। মৃত্যু কখন আসবে আমরা জানি না, মাঝে মাঝে মাইকে ঘোষণা করে গাড়ি দু ঘন্টা দেরীতে চলছে, তখন কি করব, সময় কাটাতে থাকি। সংসারে দশ রকম কাজ কেন করছি? গাড়িটা আসতে দেরী আছে, সময় কাটাতে হবে। তারপর ঢং ঢং করে ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেল, ব্লাড সুগার, হার্টে ব্লকেড, এই অসুখ সেই অসুখ, বোঝা গেল এবার ট্রেনটা আসছে, যাওয়ার জন্য তৈরী, তারপর শেষমেশ ট্রেনটা এসে গেল। প্ল্যাটফর্মে অনেক লোক থাকে, যার ট্রেন এসে গেল সে দৌড়াল, ট্রেনে উঠে বেরিয়ে গেল। আমরা সবাই প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করে আছি কখন মৃত্যু এক্সপ্রেস রূপী ট্রেনটা আসবে, এটাই আমাদের জীবন। কেউ হয়ত প্ল্যাটফর্মে এসেছে গীতা প্রেসের স্টল থেকে একটা বই কিনতে, সে বইটা কিনে নিয়ে চলে গেল। এছাড়া প্ল্যাটফর্মের বাকি সবাই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে, যার যার ট্রেন আসবে সে সে বেরিয়ে চলে যাবে। অন্য আর কোন লক্ষ্য নেই। এই পরিস্থিতিতে এদের ধর্মান্তরণ হয়ে যায়, ধর্মান্তরণে যখন যার সাথে আছে তখন তার মত হয়ে যায়। যদি কোন ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলতে থাকে দুদিন পরে তার কথাবার্তা, চালচলনে মেয়েলি স্বভাব এসে যাবে। তার মানে নিজের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। নিজের ধর্ম, নিজের লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে তখন এই ধর্মান্তরণটা সহজে হতে পারে না। যাদের একটা লক্ষ্য থাকে, আমি এটাই চাই, এদের চেহারাটাই অন্য রকম হয়। যতক্ষণ লক্ষ্য পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ জীবন কিন্তু কারুরই পাল্টাবে না। আমি আমার শহরের সব থেকে ভালো রাঁধুনি হব, আমার পয়সাকড়ি নেই কিন্তু আমি সব থেকে ভদ্র পোশাকে নিজেকে ফিটফাট রাখব, আমি এই ছোট্ট বই গীতার জ্ঞানকে আয়ত্ত করব, কথামৃতকে ভালো করে আমাকে জানতে হবে, একটা জিনিসকে আমি জানব, আসলে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু জীবনের লক্ষ্য হয় না। যে কোন বিষয়, বিষয়টা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে, এই কাজের কৌশলটাকে আমি জানতে চাইছি, আমাকে এই কাজে বিশ্বের সেরা হতে হবে। আমরা যে দিনরাত বলছি, আশীর্বাদ করুন আমার যেন ভক্তি হয়, আমি ভক্তি চাই, এগুলো সব আমাদের মুখের কথা। মুখের কথাতে কিছু হয় না। সমস্যার মূল এটাই, প্রথম ও শেষ কথা হল আমাদের জীবনে কোন লক্ষ্য নেই।

বিশ্বের যে কোন ধর্মের যে কোন শাস্ত্রের একটাই কাজ, তোমার যে আমি বোধ, ঠাকুর যাকে বলছেন কাঁচা আমি, এই কাঁচা আমির বোধটাকে সরিয়ে পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত করা। অবধূতের চব্বিশ গুরুর প্রসঙ্গেও ঠিক একই জিনিস করা হচ্ছে। এটা একটা আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকার মাধ্যমে দত্তাত্রেয় দেখাচ্ছেন পাকা আমিটা কি আর কাঁচা আমিটা কি। কাঁচা আমি মানে আমি শরীর বা আমি মন, এটাকেই বলা হয় আত্মকেন্দ্রিত। আত্মকেন্দ্রিত সবাই, নিজের আমিতে সবাই বসে আছে, একটা ছোট শিশু যার সবে জন্ম হয়েছে সেও

আত্মকেন্দ্রিত, শ্রীরামকৃষ্ণও আত্মকেন্দ্রিত, যিনি পরমহংস তিনিও আত্মকেন্দ্রিত, শুধু আত্মার পরিভাষাটা পাল্টাতে থাকে, তাছাড়া আর কিছু হয় না। এখানে অবধূত যে কথাগুলো বলছেন খুবই সাধারণ কথা কিন্তু প্রত্যেকটি কথা অদ্বৈতের স্তর থেকে বলছেন। এর একটি কথাও উপদেশাত্মক নয়। যিনি অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর দেহবোধ নেই, দেহের জন্য যতটুকু আহার দরকার ঐ ততটুকুই আছে। আমি বোধ, যেটাকে অহঙ্কার বলে, সেটাও তাঁর নেই, আমি তুমি বিভেদ বলে কোন কিছু নেই, শুধু আছেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। এই বোধ যাঁর হয়ে গেছে, এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি আবার জগতে যখন ফেরত আসেন তখন ঐ ভাবটাকে নিয়েই থাকবেন। তবে এগুলো আদর্শ ধর্মগ্রন্থ, এখানে অনেক কিছু জিনিস বোঝা যায় না। কিন্তু ঠাকুরের জীবন, স্বামীজীর জীবন দেখলে বোঝা যায় ব্যবহারিক স্তরে কিছু কিছু তফাৎ থাকে। ঠাকুরেরও নরেন, রাখালের মত কিছু বিশেষ লোক ছিল কিন্তু কারুর প্রতি বিসদৃশ আচরণ নেই, যদি ক্রোধও করেন সেটা তিনি লোকশিক্ষার জন্যই করেন। ঠাকুর যে খাওয়া-দাওয়া করছেন সেটাও লোকশিক্ষার জন্য। কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুর একটা জায়গায় গেছেন, সেখানে যারা আছে সবাই অল্প বয়সের, তাদের আগেকার লোকজনরা কেউ আর নেই, তারা অনেক কিছু জানে না, ঠাকুরের যে সেবা হয়নি সেদিকে কারও খেয়াল নেই, সেখানে ঠাকুর খবার চেয়ে পাঠাচ্ছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে ঠাকুর এটা কি করছেন! কিন্তু তা নয়, ঠাকুর তাদের মঙ্গলের জন্য চেয়ে পাঠাচ্ছেন, তিনি খেলে এদের মঙ্গল হবে। এনাদের যা কিছু সবই অপরের মঙ্গলের জন্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটাও যে নিচ্ছেন সেটাও অপরের মঙ্গলের জন্য।

(৩) আকাশ

অবধূতের তৃতীয় গুরু আকাশ। আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম ভূত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সূক্ষ্ম অণু আছে তার মধ্যে আকাশ সূক্ষ্মতম অণু। আকাশকে ইংরেজী করে বলা হয় sapce। Space বলতে আমরা যেটা আয়তন মনে করি, জিনিসটা কিন্তু তা নয়। এই ধারণাটা, আমাদের যাঁরা দার্শনিক ছিলেন তাঁরাও পরিষ্কার বুঝতেন না বলে অনেক গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন। আমরাও প্রথমের দিকে মনে করতাম আকাশ মানে মাথার উপর যে নীল আকাশ, বৃহৎ আকাশ ইত্যাদি, কিন্তু তা নয়, আকাশ মানে সূক্ষ্মতম অণু। সৃষ্টি যখন হয় তখন সৃষ্টিতে যেটা finest particle সেটা হল আকাশ। আকাশ যেমনি এল একটা বস্তু এসে গেল, বস্তু এসে গেল সেইজন্য স্থান এসে গেল। সেইজন্য স্থানকেও আকাশ বলে আর সূক্ষ্মতম জিনিসটাকেও আকাশ বলে। সূক্ষ্মতম জিনিস যত বাড়বে আয়তন বা স্থানও তত বাড়বে। আর আকাশ যখন নিজের সাথে নিজে মিলতে শুরু করে, সেখান থেকে পর পর এক একটা তত্ত্ব বেরোতে শুরু হয়ে যায়, যেমন উপনিষদে বলছেন, *আকাশ আকাশাদ্বায়ু*, আকাশ থেকে বায়ু ইত্যাদি। আকাশ পার্টিকেলস্ যদি চলে যায় তাহলে স্পেস থাকবে না। আকাশ পার্টিকেলটাই স্পেস, এটাই আবার ম্যাটেরিয়াল। আগেকার দিনে এগুলো বোঝা যেত না, বর্তমানে ফিজিক্সের থিয়োরী আসাতে এগুলো বোঝা যাচ্ছে। বিগ ব্যাঙ যখন হয় তখন ঠিক তাই হয়। বিগ ব্যাঙের আগে স্পেস নেই, বিগ ব্যাঙের আগে ম্যাটেরিয়াল নেই। বিগ ব্যাঙে যখন বস্তু তৈরী হয় তখন স্পেসও তৈরী হয়, স্পেস আর বস্তু এক সঙ্গে চলে। কারণ স্পেসও যা বস্তুও তাই। বস্তু ঠিকই কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইলেক্ট্রন প্রোটনের থেকেও সূক্ষ্মতম। আকাশ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই, কারণ আকাশই বায়ু হয়েছে, অগ্নি হয়েছে, জল হয়েছে, পৃথিবী হয়েছে। আর সব কিছু মিলে এই বোতল হয়েছে, বোতলের জল হয়েছে, মাইক্রোফোন হয়েছে, মাইক্রোফোনের তার হয়েছে। আমরা যে জলতত্ত্ব বলছি সেটা এই জল নয়, পৃথিবীতত্ত্ব মানে এই পৃথিবী নয়, এগুলো এক একটা তত্ত্ব, finest particle। আকাশের ক্ষেত্রে কি হয়, যেখানেই আকাশ সেখানেই স্পেস, যেখানেই স্পেস সেখানেই সৃষ্টি। সৃষ্টি, স্পেস ও আকাশ এই তিনটে এক সঙ্গে চলে। যেখানে আকাশ নেই

সেখানে সৃষ্টি নেই, যেখানে আকাশ আছে সেখানেই সৃষ্টি আছে বা যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই আকাশ। আকাশ তত্ত্বকে ধারণা করতে আমাদের অবশ্যই অনেক সময় লাগবে, কিন্তু এমন বিরাট কিছু জটিলও নয়। যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশের বাইরে আকাশ, গ্লাশের ভেতরে আকাশ আর গ্লাশ নিজেও আকাশ। উপমা কি রকম, একটা কাপড় টাঙানো আছে, কাপড়ে একটা ভারী কিছু রেখে দেওয়া হল, কাপড়টা ওখানে ঝুলে গেল, তার মানে একটা স্পেস তৈরী হয়ে গেল। আকাশ জিনিসটা যেন তাই, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, তাঁর যে জায়গাতে আকাশ এসে গেল সেই জায়গাতে যেন সৃষ্টি এসে গেল। সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু সচ্চিদানন্দের যে জায়গাতে আকাশ পার্টিকেলস্ এসে গেলে সেই জায়গাতেই সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে গেল। যেখানেই সৃষ্টি এসে গেল সেখানেই আকাশ এসে গেল সেখানে পৃথিবী নাও থাকতে পারে কিন্তু আকাশকে থাকতেই হবে। কল্পনা করার জন্য আমরা ধরে নিলাম এই ঘর জুড়ে একটা বিশাল প্লাস্টিক টাঙানো হয়েছে আর তাতে কিছু লোহার বল বা পাথর যদি ফেলে দেওয়া হয় তখন প্লাস্টিকের কয়েকটা জায়গা ঝুলে যাবে। এবার যদি আমরা পুরো প্লাস্টিকটাকে সচ্চিদানন্দ মনে করি, আর সচ্চিদানন্দের যে জায়গাটা ঝুলে যাচ্ছে ঐ জায়গাটায় আকাশ পার্টিকেলস এসে গেছে, ওটা সৃষ্টি রচনা করার জন্য প্রস্তুত। তাহলে ব্রহ্মাণ্ড এখন কটা হতে পারে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হবে। আর যদি প্লাস্টিকের উপর থেকে তিন চারটে লোহার বলকে তুলে নেওয়া হয় তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না যা ছিল তাই থাকবে। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই যেন কখন আকাশ হয়ে যান। কিন্তু সচ্চিদানন্দ আকাশ কি করে হন কেউ জানে না। সেইজন্য কেউ ওটাকে বলে মায়া, কেউ বলে শক্তি, কেউ বলে প্রকৃতি আর কেউ বলে তাঁর ইচ্ছা বা তাঁর লীলা। যিনিই সচ্চিদানন্দ তিনিই কোথাও কোথাও যেন স্থূল হয়ে যান। যখন স্থূল হতে শুরু করেন তখন প্রথম তিনি যে আকারটা নেন সেটাই আকাশ। আকাশ তাই সূক্ষ্মতম, এমনকি দুটো পার্টিকেলসের মধ্যে যে স্পেস আছে সেখানেও আকাশ আছে, আকাশ এত সূক্ষ্মতম।

আত্মা ভৌতিক জিনিস নয়, আত্মা আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম। যেখানে আকাশ নেই সেখানেও আত্মা আর আকাশের ভেতরে যে স্পেস সেখানেও আত্মা আছেন। কোন কারণে দুটো আকাশ পার্টিকেলসের মাঝখানে যদি একটু স্পেস থাকে সেখানেও আত্মা থাকবেন। আকাশের ভেতরেও আত্মা, আকাশটাও আত্মা। যদি আত্মাকে কেউ না মানে তাকে আকাশ জিনিসটাকে মানতেই হবে। কেউ আত্মা না মানতে পারে, আকাশ না মানতে পারে, কিন্তু ফিজিক্স পড়ে থাকলে তাকে ইলেক্ট্রন প্রোটন মানতেই হবে। এটাও কিছুটা ঐ ধরণের। এখন আত্মাকে যদি বুঝতে হয়, ভৌতিক জগতে আত্মা জিনিসটা কি যদি কেউ জানতে চায় তখন তার সব থেকে কাছের উপমা হল আকাশ। এই শরীরটাও আত্মা, শরীরের ভেতরেও আত্মা, শরীরের বাইরেও আত্মা, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এটাকে বোঝার জন্য খুব ভালো উপমা হল, একটা বরফের গ্লাশ বানানো হল, এবার একটা বড় বালতি নেওয়া হল, তাতে জল দিয়ে ভর্তি করা হল, এবার ঐ বরফের গ্লাশটাকে তাতে চুবিয়ে দেওয়া হল। গ্লাশের বাইরে জল, গ্লাশের ভেতরে জল আর গ্লাশটাও জল। এই জগতটা বাস্তবিকই তাই, এর ভেতরেও আত্মা, বাইরেও আত্মা আর যেটা আছে ওটাও আত্মা।

এবার দত্তাত্রেয় তাঁর তৃতীয় গুরুর কথা বলতে গিয়ে বলছেন, হে রাজন্! স্থাবর জঙ্গম ব্যতিরেকে ঘটে-পটে দৃশ্য এবং পদার্থ সমুদয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হলেও বস্তুত আকাশ এক, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। ঠিক তেমনি *অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজোঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন। ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্কং বিততস্য ভাবয়েৎ।।১১/৭/৪২*। জগতে যা কিছু আছে, সচল অচল যাই থাকুক, এই গ্লাশ, বোতল, আমাদের সবার শরীর, সব কিছুর কারণও আলাদা, আমরা জানি ঘোড়ার বাচ্চা ঘোড়া হয়, মানুষের বাচ্চা মানুষ হয়, এক একটা কারণে এক একটা জিনিসের সৃষ্টি হয় আর সূক্ষ্ম হোক স্থূল হোক যাই হোক সব কিছুর ভেতরে আত্মা

ওতপ্রোত হয়ে সমান ভাবে ব্যপ্ত। বস্তুর বাইরেও ব্যপ্ত ভেতরেও ব্যপ্ত। ঠিক তেমনি যিনি সাধক তিনি সব সময় সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চিন্তা করবেন সচ্চিদানন্দ আকাশের মত সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছেন। এই জগতে ভালো লোক, মন্দ লোক, সজ্জন সাধু লোক সবার মধ্যে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই বিরাজ করছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। মুক্তোর মালাতে যে সুত্র সব মুক্তোকে ধরে রেখেছে সেখানে সুত্রটা অসঙ্গ, সুত্রটা নির্লিপ্ত। বলছেন, আমি সেই আকাশ বা আমি সেই আত্মা, দুটোর মধ্যে একটা মনে করতে হয়। যদি আত্মবুদ্ধিতে মনে করা হয় তখন আত্মা সর্বব্যাপী সব জায়গায় আছেন আর ভৌতিক দৃষ্টিতে যদি আকাশবুদ্ধি করা হয় তখনও সব জায়গাতেই আছে। সর্বব্যাপী অথচ নিঃসঙ্গ। আকাশ সব কিছুতেই আছে ভালোতে আছে মন্দতে আছে, আকাশে কত কিছুই না অবিরত হয়ে চলেছে, মেঘ আসছে, বজ্রপাত হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ফসল হচ্ছে, ফসলের বিনাশ হয়ে যাচ্ছে, এত কিছুর হওয়ার পরেও আকাশ কিন্তু অসংলগ্ন, নির্লিপ্তই থাকে, আকাশের দৃষ্টিতে এর কোন কিছুরই যেন কোন অস্তিত্ব নেই। আবার আকাশকে কাটতে পারে না, আকাশকে কেউ পোড়াতে পারে না, আকাশকে কেউ খণ্ডিত করতে পারে না, আকাশকে কেউ কিছু করতে পারে না, আকাশ যেমন আকাশ তেমন। আর আকাশের পেছনেও রয়েছেন আত্মা, আত্মা আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম, তাঁকে কে কি করবে! একটা জিনিসকে ধরার জন্য তার থেকে ছোট জিনিসের দরকার পড়ে। বড় জিনিস দিয়ে ছোটকে মাপা যায় না, ছোট দিয়ে বড়কে মাপা হয়। আত্মা সূক্ষ্ম নয়, আমরা যে সূক্ষ্মতম বলি এটা একটা শব্দ মাত্র। কারণ আত্মা কোন ভৌতিক জিনিস নয়। সেইজন্য মনে করতে হয়, এই যা কিছু দেখছি, যেমন মালার ভেতর দিয়ে সুতো যাচ্ছে ঠিক তেমনি আত্মা সব কিছুর ভেতরে আছেন। এই বোতলের ভেতরে সেই আত্মা, বোতলের ভেতরে যে জল সেই জলের মধ্যেও সেই আত্মা, জলের মধ্যে যে পার্টিকেলস আছে তার ভেতরেও সেই আত্মা, আর ঐ পার্টিকেলসের ভেতরে যে হাইড্রোজেন এ্যটম আছে তার ভেতরেও আত্মা আছেন, আর এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন আছে তার ভেতরেও সেই আত্মা, অথচ আত্মা নির্লিপ্ত। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে মিশলে জল হয়, হাইড্রোজেনের সাথে কার্বন মিশলে মিথেন হয়, তাতেও আত্মাতে কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই কালের চক্রে অগণিত নাম-রূপের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রূপ খেলা হয়ে চলেছে কিন্তু তাতে আত্মার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই যে অবধূত বলছেন আকাশের ভাব আরোপ করতে, সত্যিই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দক্ষিণেশ্বরের কাছে কৃষ্ণকিশোর থাকতেন, ঠাকুর তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। কৃষ্ণকিশোর নিজেকে আকাশবৎ ভাবতেন, বলতেন আমি খ। আমাদের বেদে বলে কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, খ মানে আকাশ। কিন্তু যখন ট্যাক্সওয়ালা ট্যাক্স নিতে এসেছে তখন কৃষ্ণকিশোরের মাথায় চিন্তা ঢুকে গেছে, ট্যাক্স আদায় না করতে পারলে ঘটি বাটি নিয়ে টানাটানি হবে, তখন আর নিজেকে খ ভাবতে পারছেন না। আমাদের এটাই সমস্যা, ঠাকুর বলছেন টিয়া পাখি এমনি সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে, কিন্তু বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। কিন্তু যখন আমি ভাবছি আমি আকাশবৎ, যা হবার হবে, দেখা যাবে, আমি মরে যাব, ঠিক আছে মরে যাব, কষ্ট হবে, খাওয়া পাবো না, পাবো না, তাতে কি হবে। কিছুক্ষণের জন্যও যদি এই ভাবকে ধরে রাখা যায় আমাদের একটা বিরাট শক্তি দেবে। গীতায় এই কথাই ভগবান বলছেন, *স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*, একটু যদি এর অভ্যাস করা হয় তাতেই মহৎ ভয়ের নাশ হয়। সাধারণ লোক পারবে না, এখানে সাধারণ লোকের কথা হচ্ছে না, এখানে উচ্চতম অবস্থার কথা বলছেন। তাই বলে যারা উচ্চতম নয়, তারা করবে কি করবে না, অবশ্যই করবে। যেটা ওনারা চব্বিশ ঘন্টা, সারা জীবনের জন্য করছেন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য করব। অবধূত বলছেন, তোমাকে অত বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যত ভাবতে হবে না, তুমি নির্বিকার, যেমন আকাশ এই মেঘে ঢেকে গেল, মেঘ সরে গিয়ে আবার সূর্য এসে যাবে, আকাশ নির্বিকার।

(৪) জল

অবধূত এবার তাঁর চতুর্থ গুরুর কথা বলছেন, *স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্ণনাম্। মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রোমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ।।* ১১/৭/৪৪। চতুর্থ গুরু জল। জলও একটা তত্ত্ব, জল থেকে আমি কি শিক্ষা পেলাম? জল *স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ*, প্রকৃতি মানে স্বভাব, জল স্বভাবেই স্বচ্ছ। আমরা যে বলি নোনতা জল, মিষ্টি জল, নোংরা জল, নোনতা, মিষ্টি, নোংরা এগুলো জলের মধ্যে বাইরে থেকে আসে, প্রকৃতিগত ভাবে জল স্বচ্ছ, স্বচ্ছতা জলের স্বাভাবিক গুণ। যার জন্য মনুস্মৃতিতে শুদ্ধিকরণের যে যে উপায়ের কথা বলা হয়েছে সেখানে জলকে একটা শুদ্ধিকরণের উপায় বলে মানা হয়েছে। যে কটি তত্ত্ব আছে, এই তত্ত্বগুলি শুদ্ধির কাজে লাগে, যেমন মাটি শুদ্ধির কাজে লাগে, বায়ু শুদ্ধির কাজে লাগে, অগ্নি দিয়েও শুদ্ধি করা হয়। স্বচ্ছতার সাথে জলের আরেকটি স্বভাব হল জল স্নিগ্ধ, আর মাধুর্য, জল পান করার পর আমাদের প্রাণ শীতল হয়, একটা তৃপ্তির ভাব আসে, এটাই জলের মাধুর্য। আর *তীর্থভূর্ণনাম্*, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদাদি তীর্থের যদি নাম উচ্চারণ করা হয়, যদি দর্শন করা হয় বা স্পর্শ করা হয় মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। প্রথম হল স্বচ্ছ, পরিষ্কার করে, দ্বিতীয় স্নিগ্ধ, শীতল করে আবার পবিত্র করে। ঠিক সেই রকম *মুনিঃ পুনাত্যপাং*, যে কোন মুনির স্বভাব জলের মত হতে হবে। জলের যে যে গুণ সব গুণ যেন প্রত্যেকটি সাধুর মধ্যে থাকে। ভেতর থেকে একেবারে শুদ্ধ, ভেতর থেকে একেবারে স্নিগ্ধ। আমরা যে religious harmony, শান্তিবার্তাদি করতে চাইছি, কিন্তু তোমার ভেতরে স্নিগ্ধতা নেই তুমি কি শান্তিবার্তা করবে! শান্তি আগে তোমার ভেতরে থাকতে হবে, তবেই তুমি অপরকে শান্তি দিতে পারবে। জল পান করে মানুষের যেমন তৃপ্তি হয়, ঠিক তেমনি যিনি মুনি তাঁর কথা মিষ্ট হবে, কখন কটু কথা বলবেন না, যে শুনবে তারই প্রাণ শীতল হয়ে যাবে। শুধু মুনি নয়, যিনিই সাধনার পথে এগোচ্ছেন, তিনি কখনই কটূ কথা বলবেন না। কিন্তু শেষে আরও দামী কথা বলছেন, *পুনাত্যপাং*, পাবন অর্থাৎ পবিত্র করেন। পবিত্র কিভাবে করেন? *ঈক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ*, *ঈক্ষঃ*, দৃষ্টি দিয়ে, স্পর্শন করলে আর নাম উচ্চারণ করলে। যিনি মুনি তাঁর এমন উচ্চমানের পবিত্রতা হবে যে, তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে, তাঁকে কেউ স্পর্শ করলে সে পবিত্র হয়ে যাবে আর তাঁর নাম উচ্চারণ করলেও পবিত্র হয়ে যাবে।

জল নিয়ে এখানে যে কটি গুণের কথা বললেন, এগুলোকে পালন করা খুব সহজ, পালন করলে সবারই মঙ্গল। এমন স্বচ্ছ যে নোংরা ভাব নিয়ে যারা তাঁর কাছে আসছে তার নোংরা ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। দ্বিতীয় এমন স্নিগ্ধ যে আপনার সাথে দু মিনিট কথা বললে তার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। তৃতীয় মাধুর্য, শ্রীমা বলছেন, খোঁড়াকে দেখে খোঁড়া বলতে নেই, বলতে হয় তোমার পাটি অমন মোড়া হল কি করে? এই তিনটে হল ভালো মানুষের গুণ। কিন্তু সাধু পুরুষ, মুনিদের একটা চতুর্থ বিশেষত্ব থাকে, একজন ভালো লোক আর একজন সাধুর মধ্যে একটা তফাৎ থাকে। ভালো লোক মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, মুনি ত্রিগুণাতীত বা ত্রিগুণাতীত হওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রথম তিনটে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ আর মাধুর্য যে কোন লোকের মধ্যে থাকা দরকার। কিন্তু যিনি সাধু, যিনি সন্ন্যাসী তাঁর মধ্যে চতুর্থ একটা জিনিস থাকে, সেটা হল *পুনাতি*, পবিত্র করেন। কিভাবে? *দর্শনাৎ*, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একজনের দিকে দৃষ্টি যেতেই বলে উঠল, এইরে কার মুখ দেখে বেরোচ্ছি, নির্ঘাৎ আজকের দিনটা খারাপ যাবে, এটা যেন না হয়। মানুষের মধ্যে এমন সৎ গুণ থাকবে যাতে লোকে দেখে বলবে, সকালবেলাই এনার দর্শন হয়েছে, দিনটা আজকে খুব ভালো যাবে। *স্পর্শনাৎ*, তাঁকে প্রণাম করল, বা আলিঙ্গন করল, সে বলবে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম, সাধুদের প্রণাম করার মূল ভাব এটাই, তিনি এমনই পবিত্র যে তাঁর চরণ স্পর্শ করে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম।

একবার একজন সাধুকে অদ্বৈত আশ্রম থেকে বেলুড় মঠে কোন কাজে সকাল ছটার সময় যেতে হয়েছিল। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তখন অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট মহারাজের কোয়ার্টারেও যাওয়ার ছিল। তিনি গেছেন, ভাবলেন প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করবেন। মহারাজের সেক্রেটারী বললেন, আজকে দীক্ষা আছে, মহারাজ মন্দিরে গেছেন, মন্দির থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নামলে তুমি প্রণাম করে নিও। সন্ন্যাসীকে আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, তাই তিনি মন্দিরের দিকেই গেলেন। উনি মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখছেন মহারাজ মন্দির থেকে নেমে আসছেন, কাছে আসার পর মহারাজকে দেখে সন্ন্যাসী অবাক হয়ে গেছেন, তাঁর মনে হচ্ছে পবিত্রতার এক জীবন্ত বিগ্রহ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই পবিত্রতা দিয়ে তিনি একটু পরেই কয়েকজনকে ঠাকুরের চরণে সমর্পিত করতে যাচ্ছেন। সন্ন্যাসীর মনে হল ওনাকে যদি আমি এখন স্পর্শ করি তাহলে কাঁচের শিশিতে রাখা গঙ্গাজলে এক ফোঁটা কালি ঢেলে দিলে যা হবে, মহারাজেরও যেন তাই হয়ে যাবে। ড্রাইভার মহারাজকে প্রণাম করল, ভেতর থেকে সন্ন্যাসী আঁতকে উঠছেন, হে ভগবান! কেন মহারাজকে প্রণাম করছেন। মহারাজ সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে এক গাল হাসি দিয়ে বলছেন, আরে এত সকাল সকাল তুমি এখানে কি করে এলে? তখন সন্ন্যাসীর ঐ ভাবটা ভেঙে গেল। তারপর তিনি মহারাজকে রাস্থায় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন, তাও অনেক ভয়ে ভয়ে। মহারাজ যদি তাঁর সাথে কথা না বলতেন তাহলে হয়ত তাঁর প্রণাম করাই হত না। এই ঘটনা সেই সন্ন্যাসী পঁচিশ বছর ধরে তাঁর মনের মণিকোঠায় সযত্নে লালন পালন করছেন। এটাই এখানে বলছেন, যিনি মুনি হবেন তিনি সবাইকে পবিত্র করে দেবেন। কিভাবে? *দর্শনাৎ*, তাঁকে দর্শন করে মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে। *স্পর্শনাৎ*, তাঁকে স্পর্শ করে পবিত্র হয়ে যাবে। আর শেষে বলছেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু ঠাকুরের কথা বলা হচ্ছে না, ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করলে পবিত্র হবেই জানা কথা। এখানে মুনির কথা বলছেন, দত্তাত্রেয় নিজের কথা বলছেন। মুনিকে এই ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে, আমাকে এমনই পবিত্র হতে হবে যে, আমার নাম যদি একবার উচ্চারণ করে বা মনে মনে ভাবে তাতেই সে পবিত্র হয়ে যাবে।

জলের অনেক রকম স্বভাবের কথা বলা যেতে পারে, যে পাত্রে জল ঢালা হবে জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু এখানে জলের এই স্বভাবের কথা বলছেন না। জলের যে ঠিক ঠিক ধর্ম তা হল স্নিগ্ধ ও পবিত্র করা। খাওয়া-দাওয়ার পর হাতটা জলে ধৌত করে নিচ্ছে। আবার গঙ্গার জল একটু ছিটিয়ে দিলে সব কিছু পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গার নাম তিনবার উচ্চারণ করলেও পবিত্র হয়ে যায়। দত্তাত্রেয় বলছেন আমি জল থেকে এই শিক্ষা পেলাম, যিনি সাধক হবেন তাঁর স্বভাব এমন হবে – শুদ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুরভাষী আর লোকপাবন। লোকপাবনের অর্থ হল, যারাই তাঁর নাম করবে সে মনে করবে আমি তাঁর নাম করে ধন্য, পবিত্র ও পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি নলিনীদির মাথায় একটু গোলমাল ছিল। রাত্রে নোংরা কিছুতে নলিনীদির পা পড়েছে। তিনি এখন নিজেকে অশুদ্ধ মনে করতে শুরু করেছেন। এত রাত্রে কি করে শুদ্ধ হওয়া যাবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। মাকে বলতে মা তাকে অনেক কিছুই করতে বললেন। কিন্তু কোনটাই তার মনঃপূত হচ্ছে না। নলিনীদি এখন ঠিক করেছে রাত্রে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করে নেবে। মা যেটাই বলছেন সব তাতেই বলছেন ওতে কি শুদ্ধ হব? শেষে মা বলছেন 'ঠিক আছে আমাকে ছুঁয়ে নে তাহলে শুদ্ধ হয়ে যাবি'। দত্তাত্রেয় বলছেন সাধক এমন হবে লোকে তাঁর নাম নিলেই যেন নিজেকে মনে করে পবিত্র হয়ে গেলাম। পবিত্রতার ব্যাপারে গীতা বলছে যখনই শুদ্ধ অশুদ্ধের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তখন ওঁ তৎ সৎ বললেই সব সংশয় নিরসন হয়ে যায়। কেউ গ্লাশে জল এনে দিয়েছে কিংবা কোন খাবার এনে হাতে দিয়েছে, বসার জন্য আসন বা শোওয়ার জন্য বিছানা দেওয়া হয়েছে, এই আসন বা বিছানা আগে কে না কে ব্যবহার করেছে, এই সব ভেবে মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে থাকে। তখন একবার ওঁ তৎ সৎ বলে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে সব পবিত্র হয়ে

যাবে। যদি গঙ্গাজল না থাকে শুধু ওঁ তৎ সৎ বললেও শুদ্ধ হয়ে যাবে। এগুলো সবই ভগবানের নাম। কিন্তু এখানে বলছেন সাধকের নামে। সাধক এমনই শুদ্ধ পবিত্র হবেন যে তাঁর মুখনিঃসৃত কথা শুনলেই মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে আর তাঁর নাম নিলেই মনে করবে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম।

(৫) অগ্নি

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে অগ্নিও একটি তত্ত্ব। দত্তাত্রেয় বলছেন হে রাজন্ অগ্নিও আমার একজন গুরু। অগ্নি থেকে কি শিক্ষা নিয়েছেন? *তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ। সর্বভক্ষোহপি মুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ।*।১১/৭/৪৫। অগ্নি নিজেই প্রচণ্ড তেজস্বী ও দীপ্তিমান। জগতের কোন তেজই অগ্নিকে দাবাতে পারেনা। তার সাথে মজার ব্যাপার হল, অগ্নি কোন কিছুই সংগ্রহ করে না। যা কিছু আছে সব নিজের পেটের মধ্যে রেখে দেয়। সব কিছু নেওয়ার পর সেগুলোর দোষগুণের সাথে অগ্নি লিপ্ত হয় না। অগ্নিতে যা কিছুই আমরা দিই না কেন অগ্নি কোন কিছুতেই দূষিত হয় না। উল্টে অগ্নি সব কিছুকে শোধন করে দেয়। সেইজন্য বলা হয় তপস্যা করলে তপস্যার অগ্নি ভেতরে যত পাপ আছে সব পাপকে শোধন করে দেয়।

অগ্নি যেমন তেজস্বী, মুনি যিনি তিনিও তেজস্বী হবেন। তেজকে আচার্য বলছেন প্রাগলভ, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন চামড়ার চমক নয়, ক্রিম পাউডার মেখে, বিউটিপার্লারে গিয়ে ঘষে মেজে চামড়াকে ঝক ঝকে করা নয়, চোখ মুখ আর চেহারা দেখেই বোঝা যাবে যে এর মধ্যে তেজ আছে, চেহারাটা জ্যোতির্ময় হবে, দীপ্ত হবে। আর বলছেন *দুর্ধর্ষঃ*, দুর্ধর্ষ মানে তাকে এই জগতে কেউ দাবাতে পারে না, অগ্নির যা তেজ ঐ তেজের সামনে যেমন কেউ দাঁড়াতে পারে না। দত্তাত্রেয় নিজের কথা বলছেন, অগ্নির কাছে থেকে শিক্ষা নিলাম, আমার তেজটাও আগুনের মত হবে। আর বলছেন *উদরভাজনঃ*, যতটুকু পাবে ততটুকুই খাবে আর কিছু অবশিষ্ট রাখবে না। অগ্নিকে যা দেওয়া হবে সব খেয়ে নেবে, পরে কি খাবে তার কোন চিন্তা অগ্নি করে না। উত্তরকাশীতে সাধুর তপস্যায় যান, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় সাধুদের ভিক্ষা দেওয়া হয়। ভিক্ষাতে কোথাও ডাল, রুটি কোথাও অন্ন ডাল, সেটাও আবার সকাল নটার মধ্যেই বিতরণ করা হয়ে যায়। সাধুরা একটা থালা নিয়ে যান, ওখানেই খেয়ে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে থালাটা মাটি দিয়ে মেজে ঘরে ঢুকে জপধ্যানে বসে যান। সারাদিন কি খাবেন না খাবেন কোন চিন্তা করেন না। গৃহস্থরা এটা পারবে না, কারণ গৃহস্থদের সঞ্চয় করতে হয়। সন্ন্যাসীর ধর্ম গৃহস্থদের জন্য নয়। কিন্তু লোভের একটা সীমা রাখতে হয়। সন্ন্যাসীর আদর্শ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, এইসব আদর্শের কথা শুনলে জানলে ভেতরে একটা উৎসাহ হয়। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করতে সাহস পায়। ষোল আনা ত্যাগ কি রকম, অগ্নির মত, অগ্নিকে যা দিল খেয়ে নিল, রাখারাখির কোন বালাই নেই।

সর্বভক্ষোহপি, অগ্নি সব কিছুকে ভক্ষণ করে নেয়, কোন বাছবিচার নেই, মল, মুত্র যা দিয়ে দেওয়া হোক অগ্নি সব কিছুকেই ভস্ম করে দেবে আবার ঘি তেল দিয়ে দিলে সেটাও খেয়ে নেবে। কিন্তু অগ্নি কারুর স্বভাবকে গ্রহণ করবে না, অগ্নির যে স্বভাব তেজস্বীতা, দীপ্তিমান, দুর্ধর্ষ, জ্যোতির্ময় এই স্বভাব থেকে অগ্নি কখনই বিচ্যুত হয় না। ঠিক তেমনি যিনি সাধক, তিনি জগতে সর্বত্র বিচরণ করবেন, সবারই সাথে মিশবেন, কিন্তু কোন স্থান বা কোন ব্যক্তির কোন দোষকে তিনি গ্রহণ করবেন না। স্বামীজী বলছেন, শিক্ষক কি রকম হবেন, তিনি যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের টেনে উপরে নিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষকই যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তার স্তরে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি ওখানেই থেকে যান, ওখান থেকে আর উপরে আসা হয় না। এগুলো আসলে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকার একটা ঈপ্সা। যেখানে মানুষ

নিজেকে একা মনে করে, নিজেকে অসহায় মনে করে, তাদের এই সমস্যা হয়। হয়ত তাদের মধ্যে অনেক ভালো ভালো গুণ আছে, তার জন্য সে চাইছে আমাকে লোকেরা একটু জানুক মানুক। আমাকে মানুক এই ইচ্ছার জন্য তখন তারা কি করে? এক পাল বাছুর আছে সেখানে একটা ষাঁড় ঢুকে গেছে, বাছুররা দেখছে এ আমাদের থেকে বিরাট বড়। ষাঁড় এখন নিজের শিঙ ভেঙে নিয়েছে যাতে বাছুরের মত হওয়া যায়। শিঙ ভাঙলেই কি বাছুরের মত হয়ে যাবে! ষাঁড় যে সে ষাঁড়ই থাকবে, বাছুর বাছুর থাকবে। এই জিনিসটাকে আমাদের বুঝে নিতে হবে, আমি সবার থাকে আলাদা, মিশব সবারই সাথে কিন্তু আমি জানব আমি এদের সাথে এক নয়। শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সাথে বেশি মেশামেশি করে ছাত্ররা ভাবে ইনি আমাদের মতই একজন। ঠিক তেমনি সন্ন্যাসী যদি গৃহীদের সাথে বেশি মেলামেশা করে ভক্তরা মনে করে ইনিও আমাদের মতই একজন, বেশির ভাগ ভক্তের কাঁচা মন কিনা। মিলিটারিতে ট্রেনিংএর সময় বলেই দেওয়া হয় কক্ষণ তোমরা জনসাধারণের সাথে বাসে ট্রেনে যাতায়াত করবে না। আইএএস, আইপিএস অফিসাররা কখনই সাধারণ লোকেদের সাথে মিশবেন না। সাধারণ লোক যেখানে যাতায়াত করে তুমি যদি সেখানে চলার সময় সাবধান না থাকো, ওদের গুণ তোমার উপর আসবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না, সেইজন্য এড়িয়ে চলতে হয়। আগুন সবাইকে গ্রহণ করে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নিচ্ছে কিন্তু আগুন তার স্বভাবকে কখনই ছাড়ছে না, তার তেজ, তার দীপ্তি, তার দুর্ধর্ষতা কখনই কমে যাবে না। ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয় জগতে সব কিছুই গ্রহণ করবে, খাবে-দাবে, চলাফেরা করবে, গান-বাজনা শুনবে সবই করবে কিন্তু যারা তোমার কাছে আসবে তারা জানবে এ আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। ঠাকুর নিজের শিষ্যদের সাথে ফষ্টিনষ্টি সবই করছেন, কিন্তু সবাই জানে ইনি আমাদের থেকে আলাদা। ইনি আমাদেরই মত একজন এই বোধ কোন পরিস্থিতিতেই মুনি হতে দেবেন না, দত্তাত্রেয় এই শিক্ষা অগ্নি থেকে পেলেন।

দত্তাত্রেয় আবার বলছেন, অগ্নির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অগ্নি কখন কোথাও প্রকট থাকে কোথাও আবার অপ্রকট থাকে। যেমন কাঠ, কাঠের মধ্যে অগ্নি অপ্রকট হয়ে আছে। ঠিক তেমনি সাধকও প্রয়োজনে কোথাও নিজেকে গুপ্ত আবার কোথাও ব্যক্ত রাখবে। কোথায় যোগী নিজেকে প্রকাশ করেন? যারা কল্যাণকামী, যারা সত্যিকারের নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশ চায়, শুভ চাইছে তাদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন যাতে তারা যেন তাঁর উপাসনা করতে পারে। যেমন অরণি মন্থন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। মুনি যাদের সাথে মেলামেশা করছেন তিনি তাদের অতীত আর ভবিষ্যতের অশুভ জিনিস গুলোকে নাশ করে দেন, বিশেষ করে তাদের কোন জিনিস বা অন্নাদি যখন গ্রহণ করেন। যেমন যখন যজ্ঞ করা হয় তখন অগ্নি যজমানের যা কিছু অশুভ আছে সব নাশ করে দেয়, ঠিক তেমনি যিনি মুনি, তাঁর তেজ এমন জ্বলজ্বল করে, তিনি যে লোকটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তার অতীত আর ভবিষ্যতের যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়ে আছে সবটাকে ভস্ম করে দেন। আর অন্যান্য জায়গায় তিনি নিজেকে গুপ্ত রাখেন, নিজের শক্তি, তেজকে কখনই প্রকাশ করবেন না, যেমন কাঠের মধ্যে যে অগ্নি আছে সেই অগ্নি নিজেকে সেখানে গুপ্ত রাখে।

এখানে প্রথম যে পাঁচজন গুরুর নাম করা হল এদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এই পাঁচটি সৃষ্টিতত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব। মনুস্মৃতি বলছে এই পাঁচটি হল পবিত্রকারীর মূল উপাদান। মানুষকে পবিত্র করার শেষ পদার্থ হল এই পাঁচটি – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এখানে এই পাঁচটিকে তত্ত্ব রূপে দেখানো হচ্ছে না, স্থূল রূপেই দেখানো হয়েছে। দত্তাত্রেয় এই পাঁচটি পদার্থ থেকে পাঁচ রকমের শিক্ষা নিয়েছেন।

(৬) চন্দ্রমা

অবধূতের ষষ্ঠ গুরু চন্দ্রমা। *বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ। কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা।। কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ। নিত্যাবপি ন দৃশ্যতে আত্মনোহগ্নের্যথার্চিষাম্।।১১/৭/৪৮-৪৯।।* অমবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চাঁদের কলা বৃদ্ধি পায় আবার পূর্ণিমা থেকে অমবস্যা পর্যন্ত কলা হ্রাস হতে থাকে। চন্দ্রমা কখনই এক অবস্থায় থাকে না, হ্রাস-বৃদ্ধি সব সময় হয়েই চলেছে। কিন্তু চন্দ্রমা চন্দ্রমাই, তার আসল সত্তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। ঠিক তেমনি আমার জন্ম হয়েছে, আমি বড় হচ্ছি, একটা সময় আমার মৃত্যু হবে। আমার সব কিছু বাড়ছে কমছে, কিন্তু আমি আমিই, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আত্মার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, কোন বিকার নেই, আত্মার কোন পরিবর্তন নেই। আমরা নিজেদের দেহ, মন, বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম করে রেখে এদের ধর্মের সাথে আমি কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। কিন্তু আমি তো তা নই, আমার আসল স্বরূপের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। আমি কে? আমি সেই নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। চন্দ্রমার কাছে থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম, চন্দ্রমার যা কিছু পরিবর্তন হোক না কেন, চন্দ্রমা চন্দ্রমাই থাকে। আমি হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার যা কিছু পরিবর্তন সব এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির, এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। দত্তাত্রেয় বলছেন, কালের প্রবাহে জলস্রোতের মত প্রাণী শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সমানে হয়ে চলেছে কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই যে কালের প্রবাহ, বিজ্ঞানে এর একটা বড় সমস্যা আছে, একটা জিনিসের continuity থাকে নাকি quantum থাকে? Quantum মানে জিনিসটা চলছে, চলতে চলতে হঠাৎ দুম্ করে উপরে চলে গেল। সাধারণ মন এটাকে মেনে নিতে পারে না। যেমন এই টেবিলের উপর একটা ফোন রাখা আছে, হঠাৎ ফোনটা চলে গেলে ছাদে। ছাদে যদি যায় তাকে একটা পথ দিয়ে যেতে হবে, তার মানে একটা নৈরন্তর্য আছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে তা হয় না। যাঁরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাঁরাও কোয়ান্টাম ফিজিক্স ঠিক ঠিক বোঝেন না কিনা অনেকের সন্দেহ। সাধারণ বুদ্ধি আমাদের কি বলবে? এখানে আমার কাছে একটা কলম আছে, হঠাৎ দেখা গেলে কলমটা আরেকজনের কাছে চলে গেল। কলমটা অন্যের কাছে কিভাবে যাবে? নিশ্চয়ই একটা পথ দিয়ে যাবে। কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সে তা হয় না, এখানে আছে দুম করে ওখানে চলে যাবে। কি করে হয় জানা নেই, কিন্তু থিয়োরেটিক্যালিও তাই হয় প্র্যাক্টিক্যালিও তাই হয়। আমাদের মন কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মতই চলে, মন এই এখানে আছে দুম করে চাঁদে চলে গেল, তবে মন লম্বা পথ নেয় না। কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে এই রকম কিছু হয় না। সেইজন্য লোকেরা কেউ কোয়ান্টাম ফিজিক্স বোঝে না। অথচ আমাদের জীবনে একটা এমন কিছু নেই যেটাকে আমরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মত দেখি না। আমাদের জীবনে এমন একটি জিনিসও নেই যেটা paradigm shiftএর মত দেখি না, paradigm shift মানেই জিনিসটা এখানে আছে দুম্ করে ওখানে চলে গেল, কিন্তু মাঝখানের পথে তাকে দেখা যাবে না। কিছু নিশ্চয়ই আছে, দুম্ করে তো চলে যাবে না, যেমন বলা হয় যদি একটা ইলেক্ট্রনকে ছাড়া হয়, যাওয়ার সময় ইলেক্ট্রন বস্তু না থেকে এনার্জি হয়ে ছড়িয়ে যায়, তারপর একটা জায়গায় গিয়ে আবার জুড়ে যায়, সেইজন্য মাঝখানে তাকে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা কত কিছু বলছেন, আমরা তার কোন কিছু আদৌ জানি না, বুঝি না, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে কোয়ন্টাম ফিজিক্সের এই নিয়মকে সব সময় মেনে চলছি। সাধারণ ভাবে আমরা দেখছি যে আমাদের জীবনে একটা নৈরন্তর্য আছে, কিন্তু জীবনে মানছি কোয়ান্টাম, paradigm shiftএর মত, দুম্ করে হয়ে যাওয়াকে। একটা বিচিত্র কিছু হওয়া, একটা চমৎকারিত্ব হওয়া এটাই আমরা মানি। যেমন আমি বললাম আমার খিদে পেয়ে গেছে, খিদে তো চট করে পায় না, তিল তিল করে খিদে হতে থাকে কিন্তু হঠাৎ দুম্ করে লাফিয়ে বলে দিলাম আমার খিদে পেয়ে গেছে। এর থেকে আরও

জঘন্য হল কেউ মারা গেলে আমরা বলি, তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। আবার বন্ধুত্বের হানিকে নিয়ে বলি, সে হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিল, আমাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। হঠাৎ কিছুই হয় না, ওর বিয়ে হয়েছে, নতুন স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দ করছে, মনটা আমার থেকে ঘুরে অন্য দিকে চলে গেছে। বিয়েটা কি হঠাৎ একদিনেই হয়ে গেল? না, তার পেছনে কত প্রস্তুতি আছে, কালের প্রবাহে সে বড় হয়েছে, কালের প্রবাহে ওর বাবা-মার ইচ্ছে হয়েছে ছেলেকে বিয়ে দিতে হবে, কালের প্রবাহে বিয়ে হল, বিয়ে তো দুম্ করে হয় যায়নি। কিন্তু আমি দেখছি দুম্ করে হয়েছে, আগে আমার কাছে কত আসত এখন আর আসে না। মৃত্যুটা আরও বেশি, আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি জিনে টেলিরোম নামে একটা জেনেটিক পদার্থ আছে, টেলিরোম আয়ুর সাথে সেট করা আছে, আয়ু কমার সাথে সাথে ওটাও ছোট হতে থাকে। টেলিরোমকে মেপে যদি দেখা হয় কি রেটে ছোট হচ্ছে, তাহলে বলে দেওয়া যাবে লোকটি কবে মারা যাবে। মানুষের মৃত্যু জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে না, টেলিরোমের কমে যাওয়ার উপর নির্ভর করে। তাহলে মৃত্যু কি মানুষের দুম্ করে হচ্ছে? আমরা কেন বলছি তিনি হঠাৎ মারা গেলেন? দুম্ করে কিছু হয়নি, মৃত্যুটাও তিল তিল করে হচ্ছিল। কিভাবে হচ্ছিল? কালের প্রবাহে। অবধূত ঠিক এই শিক্ষা নিলেন, তিনি রোজ রাত্রে দেখছেন চন্দ্রমার হ্রাস হচ্ছে আবার একটা দিন থেকে বাড়তে থাকছে। হঠাৎ একদিন বললাম ছেলেটা কত বড় হয়ে গেল। কিন্তু ছেলে কি একদিনেই বড় হয়ে গেল। আমরা সাধারণ ভাষায় এই ধরণের কথা ব্যবহার করি ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ কিছু নেই, সবই তিল তিল করে কালের প্রবাহে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর নিজের নামে বলছেন, লোকেরা উপর থেকে পাথর বসানো মেঝেটাই দেখে, কিন্তু এর ভেতরে কত কি হয়েছে সেটাকে কেউ দেখে না।

অবধূত বলছেন, আত্মা হলেন নিত্য আর আত্মার উপর যে শরীর এই শরীরের উপর কালের প্রবাহ চলছে। কালের প্রবাহের জন্য কিছু জিনিস বাড়ছে, কিছু জিনিস কমছে আর এই কমা বাড়াটা ক্রমাগত হয়ে চলেছে, এর মধ্যে একটা নৈরন্তর্য আছে। অবস্থার নিরন্তর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বাস্তবে চন্দ্রমা যেমন থাকার তেমনই থাকে। চন্দ্রমা যে পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরছে আর পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, কালের প্রবাহে ঘুরছে। কিন্তু যে জিনিসটার কোন পরিবর্তন নেই, চন্দ্রমা তো আসলে কোন সময়েই কমে যাচ্ছে না, আর বেড়েও যাচ্ছে না, চন্দ্রমা চন্দ্রমাই আছে, অথচ দেখাচ্ছে পূর্ণিমা থেকে অমবস্যা পর্যন্ত কমতে থাকে আর অমবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত বাড়তে থাকে। ঠিক তেমনি আমার আসল আমিটা কমেও না বাড়েও না অথচ দেখছি আমার মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাহলে কি বলা যাবে যে মারা গেছে সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে? মুর্খরাই এভাবে কথা বলে। কারুর শরীর চলে গেছে, তার বাড়ির লোককে গিয়ে কি কেউ বলবে, তার কিছু হয়নি, সে শুদ্ধ আত্মা, আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আমাদের কাছে এগুলো সব মুখের কথা, যাঁরা খুব উচ্চমানের তাঁরাই এই কথা বলতে পারেন। তাঁরা নিজে আগে উপলব্ধি করেন, তারপর নিজের জীবনে যখন নামান তখন তাঁদের দেখে মানুষ শেখে। যখন দেখবে কারুর মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন শোকের ছাপ নেই, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরোচ্ছে না, তখন তারা চিন্তা করবে মৃত্যুকে সন্ন্যাসীরা কিভাবে দেখেন। কোন সন্ন্যাসী মারা গেলে অন্য সন্ন্যাসী ভাইয়েরা তাঁকে কাঁধে তুলে আনন্দে গান করতে করতে শ্মশানে নিয়ে যান। অনেক আগে বেলুড় মঠে এক নাপিত ছিল, ইউপি থেকে এসেছিল। একদিন এক বৃদ্ধ সাধু দেহ রেখেছেন, তাঁর মাথাটা কামিয়ে দিতে বলা হল, কোন রকমে সে কামিয়ে দিয়েছে। তারপর দেখে সাধুরা ঘাড়ে করে তাঁকে গান করতে করতে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ দৃশ্য দেখে সে নাপিত খুড় কাঁচি সব গঙ্গায় ফেলে ইউপি পালিয়ে গেল, এরা মানুষ না রাক্ষস! নিজের গ্রামে দেখেছে রামনাম সৎ হ্যায়, হরিবোল বলে সবাই কান্নাকাটি করতে করতে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে আর এখানে সাধু মরেছে তাকে নতুন জামা কাপড় পড়িয়ে সবাই আনন্দ করতে করতে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ যখন দেখবে সাধুরা মৃত্যুকে এভাবে নেন তখন নিজেদের মধ্যে

একটু বল আসে। সাধুদের যদি একশ পয়সার বল হয় তাহলে সাধারণ মানুষের এক পয়সার বল আসবে। আপনজনদের সাথে সাধুদের দেহের সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু সংসারীদের আপনজনদের সাথে দেহের সম্বন্ধ হয়ে যায়, সেইজন্য সংসারীদের কষ্ট হয়। তবে এই কষ্টেরও লাঘব করা যায়, আর সেইজন্যই এইসব শাস্ত্র পড়া। ধর্মের এটাই কাজ, শোক আর মোহ যে মানুষকে ভেঙে চুরমার করে দেবে, ধর্ম সেটা হতে দেয় না। বলছেন, চন্দ্রমাকে দেখে এই শিক্ষা পেলাম, চন্দ্রমা চন্দ্রমা, কালের গতিতে যে তার হ্রাস বৃদ্ধি হয় সেটা মিথ্যা, ঠিক তেমনি আত্মা রূপে আমি হলাম নিত্য আর দেহ রূপে আমার বৃদ্ধি হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে।

ঊনপঞ্চাশ নম্বর শ্লোকে বৌদ্ধের একটা প্রভাব পাওয়া যায়। দীপ শিখা যখন জ্বলে তখন শিখাকে নিরন্তর দেখায়, অথচ ফোটা ফোটা করে তেল জ্বলে যাচ্ছে, এটাই আমাদের এক নৈরন্তর্যের ভাব দিচ্ছে। উপনিষদে একটা শব্দ আসে আলাদ্, একটা জ্বলন্ত কাঠ বা মশালকে যদি খুব জোরে ঘোরান হয়, দূর থেকে মশালকে একটা আগুনের বৃত্ত দেখাবে। অথচ একটা জিনিসই ঘুরছে, আগুন নিভিয়ে দিলে আর কিছু থাকবে না। দীপা শিখা ক্রমাগত ঘুরছে কিন্তু দেখাচ্ছে যেন পুরো একটা বৃত্ত। ঠিক তেমনি আমাদের শরীরের অনবরত পরিবর্তন হয়ে চলেছে, অথচ আমরা মনে করছি দেহটা নিত্য, জন্ম থেকে ঐ একই দেহ চলছে। বায়োলজিতেও বলছে, শরীরের অনবরত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর রোজ যে খাওয়া-দাওয়া করা হচ্ছে তাতে অনবরত নতুন নতুন সেল তৈরী হয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের ভাব দেহটা নিত্য, এটাই আশ্চর্যের, এটাই মায়া। অবধূত বলছেন, চন্দ্রমাকে দেখে আমার এই বোধ এসে গেল, চন্দ্রমা বাড়েও না কমেও না অথচ কালের প্রবাহে আমরা তার অনবরত একবার ক্ষয় হতে দেখছি আবার তার বৃদ্ধি হতে দেখছি, ঠিক তেমনি আমার আত্মা, আমার আসল আমিটা নিত্য, কিন্তু দেহ যেটাকে আমার আসল আমি মনে করছি, দেখায় কমছে বাড়ছে। কমছে বাড়ছে যদিও নেওয়া হয় তাতেও কোন দোষ নেই কিন্তু কালের প্রবাহে জিনিসটা যে টানা চলছে, এই জিনিসটাকে ধরতে পারা। আর বায়োলজির দিক থেকেও যদি দেখা হয় তারা বলবে টেলেরোম কমে যাচ্ছে, জ্যোতিষীরা বলবে তার এতটা আয়ু নির্ধারিত ছিল, প্রাচীন জ্যোতিষিরা বলবে অমুক অমুক গ্রহের সব যোগ ছিল তাই শরীর চলে গেছে। যেটাই বলা হোক, কোনটাতেই দুঃখ করার কিছু নেই।

গীতায় ভগবান বলছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*। অর্জুন বলছেন, পিতামহ ভীষ্ম যিনি কোলে পিঠে করে স্নেহ দিয়ে আমাদের বড় করেছেন তাঁর মৃত্যুতে কি আমি শোক করব না? যে আচার্যের কাছে আমি শিক্ষা পেয়েছি, তিনি মারা গেলে কি আমার শোক হবে না? নিশ্চয়ই শোক করতে যদি এনারা ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে যেতেন। ধর্ম থেকে যদি মানুষের পতন হয়ে যায় তখন তার জন্য শোক করতে হয়, কিন্তু মৃত্যুর জন্য কিসের শোক, মৃত্যু তো কালের প্রবাহে হচ্ছে। এনারা স্বধর্ম পালন করে যুদ্ধে মারা গেলে শোক করার কি আছে! চন্দ্রমা থেকে তুমি শিক্ষা নাও, কালের প্রবাহে সব কিছু হচ্ছে, তিল তিল করে পাল্টাচ্ছে, সেইজন্য হঠাৎ করে কিছু একটা হয়ে গেল এভাবে ভাবতে নেই।

(৭) সূর্য

যে কোন জিনিষের আমি নিজের মত একটা ব্যাখ্যা করে নিতে পারি। এখানে দত্তাত্রেয় কি ভাবে দেখছেন সেটাই আমরা আলোচনা করছি। অথবা যিনি ভাগবত রচনা করেছেন তিনি এই জিনিসগুলোকে যে ভাবে দেখেছেন, সেটাকেই ছন্দোবদ্ধ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এগুলো থেকে যে এভাবেই শিক্ষা নিতে হবে তা নয়, আরও পাঁচ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু দত্তাত্রেয় একজন বড় যোগী পুরুষ, যোগে অবস্থান করে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখছেন, আমরাও যদি সেইভাবে গ্রহণ করে মনন করি তাহলে আমারাও যে যোগী হতে পারব না কে

বলতে পারে। যেমন দত্তাত্রেয়র সপ্তম গুরু হলেন সূর্য। সূর্য থেকে তিনি কি শিক্ষা পেলেন? *গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি। ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ।। বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্‌গতঃ। লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোহকর্ষবৎ।*১১/৭/৫০-৫১। চন্দ্রমা থেকে অবধূত *নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্,* এই ভাবটা নিচ্ছেন, কিন্তু সূর্য থেকে তিনি খুব উদ্ভট শিক্ষা নিচ্ছেন। সূর্য তাঁর প্রখর রশ্মি দ্বারা ধরিত্রীর বুক থেকে তার জলরাশিকে আকর্ষণ করে আকাশে তুলে নিয়ে আসে এবং উপযুক্ত সময়ে সেই জলরাশিকে বৃষ্টি রূপে বর্ষিত করে ধরিত্রীকে শীতল করে দেয়। ঋষিরা সব কিছুকে অনেক গভীরে নিয়ে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন, প্রকৃতির অনেক কিছুই তাঁরা জানতেন। ঋষিরা জানতেন সমুদ্র বৃষ্টি বর্ষণ করছে না, সূর্যই জল টেনে নিয়ে মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, যা কিছু হয় সূর্যের জন্যই সব কিছু হয়। আসলে ত্যাগের মাহাত্ম্যটা দেখাতে হবে, তাই সূর্যকেই বেছে নিলেন। সুর্য যেমন পৃথিবীর বুক থেকে জল শুষে নিচ্ছে, আর ঠিক সময় হলে বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করে সেই জল ত্যাগ করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি যোগী যখন যেমন দরকার হবে ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়কে গ্রহণ করবে আর ঠিক সময়ে সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে দেবে। যেমন যোগীকে খাদ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে, খাওয়া হয়ে গেল তাঁর মন থেকে খাওয়াটা নেমে গেল। কি খেয়েছি, কি খাইনি তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। কোন দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল, তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তারপরেই সেই দৃশ্য তাঁর মন থেকে হারিয়ে গেল। কোথাও কোন আসক্তি নেই। সূর্য জলকে আকর্ষণ করে নিজের কাছে রেখে দেয় না, ঠিক সময়ে সেই জলকে ত্যাগ করে দেয়। দত্তাত্রেয় সূর্য থেকে এই ত্যাগের শিক্ষা পেলেন।

ঠাকুরের সাধনার সময়কার কত সব কাহিনী আছে। ঠাকুর অজ গ্রামের অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন, ভোগ কি জিনিস জীবনে দেখেননি। সাধনার সময় তাঁর মনে নানান রকম ভাবনা উঠছে, রূপার গড়গড়াতে হুকো খাওয়ার ভাবনা উঠল। মথুর বাবু আনিয়ে দিলেন। বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ ফিরে টানছেন আরেকবার ওপাশ ফিরে টানছেন, তারপর বলছেন মন এর নাম রূপোর গড়গড়াতে তামাক খাওয়া, ওখানেই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। প্রায়ই একটা কথা বলা হয়, গৃহস্থরা ত্যাগ করে যাতে আরও ভোগ করতে পারে, সাধুরা ভোগ করে যাতে আরও ত্যাগ করতে পারে। দেখা যাবে বিয়ের কদিন পর মেয়েটি বাপের বাড়ি চলে গেল, কেন গেল, যাতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাটা আরও বাড়ে, একদিন হয়ত উপোস করল, কেন করল, যাতে আগামী দিন আরও ভালো করে খেতে পারে। সাধুদের ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়, সাধুরা ভোগ করেন যাতে ত্যাগ করতে পারে। অনেক আগে চেরাপুঞ্জী আশ্রমে একজন মহারাজ ছিলেন, ওনার খুব শখ ছিল এ্যারোপ্লেনে চাপবেন। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, আর কদিন পরই দেহ রাখবেন, তাঁর ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্য গৌহাটি থেকে ওনাকে প্লেনে নিয়ে আসা হয়েছিল, ঐ একবারই জীবনে প্লেনে চাপলেন। সাধুরাও বাচ্চাদের মত, একটা বাই উঠতেও যতক্ষণ চলে যেতেও ততক্ষণ। সূর্যও ঠিক তাই, যখন টানে পুরো জলকে টেনে তুলে নেয় আর যখন সময় হয় তখন পুরো জলটাই ছেড়ে দেয়, তার মানে কোন কিছুতেই তার আসক্তি হয় না।

ভগবান বুদ্ধও ত্যাগের শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু অন্য ভাবে। তিনি পর পর তিন দিন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে বিমর্ষ হয়ে গেলেন। পরের দিন তিনি একজন সন্ন্যাসীকে দেখলেন। ইনি কে? ইনি সর্বস্ব ত্যাগ করে আনন্দের উৎসের দিকে যাত্রা করেছেন। ভগবান বুদ্ধ দেখলেন জগৎ তো জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। সন্ন্যাসী এই জগৎকেই ত্যাগ করে দিয়ে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির পারের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ত্যাগ ছাড়া শাশ্বত আনন্দ ও চিরস্থায়ী শান্তি আসবে না। ভগবান বুদ্ধ এইভাবে শিক্ষা পেলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাপ্রতিষ্ঠানে আমরা সবাই যাচ্ছি, সেখানে এই চারটে জিনিস একসাথে দেখছি, রোগী দেখছি, বৃদ্ধ দেখছি, মৃত্যুও দেখছি আবার মঠের সন্ন্যাসীদেরও দেখছি। আমাদের মনের মধ্যে বৈরাগ্য আসছে

না, ত্যাগের ভাবও জন্মাচ্ছে না। ঠিক তেমনি দত্তাত্রেয় এগুলো দেখেছেন, দেখে নিজের মত একটা ভাবকে গ্রহণ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নিজের মত কি করে হয়? শেষমেশ নিজের মনই গুরু রূপে সব দেখিয়ে দেন। আমাদের মন এখন বিষয়রসে সিক্ত, কিন্তু এগুলো শুনে রাখতে হয়। শুনতে শুনতে একটা সময় যখন মন ধীর স্থির হয়ে শান্ত হবে তখন আমরাও অনেক কিছু দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারব। একজন বলল – ভাই, আমার মা-বাবার ঝগড়া দেখে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা হয়ে গেছে, আমি আর বিয়ে করছি না। ছোটখাট অনেক ঘটনা বা দৃশ্য আমাদের অনেকের জীবনকে পাল্ট দেয়। কিন্তু তাই বলে সবার জীবন পাল্টায় না। নেতারা, আইএএস অফিসাররা চুরি করে ধরা পড়ার পর জেলে যাচ্ছে, কিন্তু চুরিতো বন্ধ হচ্ছে না। বাকিরা মনে করছে এরা বোকা ছিল তাই ধরা পড়েছে।

কিন্তু এনারা হলেন যোগী পুরুষ, এনাদের বুদ্ধি প্রচণ্ড প্রখর ও জাগ্রত। ঠাকুর কথামৃতে আধ্যাত্মিক উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট জিনিষের উপমা দিয়ে কত সহজ করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। ঠাকুর কথামৃতে যত উপমা ব্যবহার করেছেন এগুলো আমরা দিনরাত চোখের সামনে প্রতিনিয়ত দেখছি। সেই দৃষ্টি যদি থাকে তাহলে আমাদের চারিপাশের যে কোন জিনিস থেকে কোন না কোন শিক্ষা নিতে পারি। এখানে এই ব্ল্যাকবোর্ড আছে, ব্ল্যাকবোর্ডকে দেখে আমার মনের মধ্যে একটা ভাব এল। এই ব্ল্যাকবোর্ডে এখন কিছু লেখা নেই, সব পরিষ্কার। এর ওপর কত কিছু লেখা হবে, ক্লাশের ছেলেরা সেই লেখা থেকে কত জ্ঞান অর্জন করবে। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা থাকলে নতুন করে কিছু লিখতে গেলে আগের লেখাগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ড থেকে আমি শিক্ষা পেলাম আমার যে সংস্কার এগুলোকে পরিষ্কার রাখতে হবে, মন পরিষ্কার থাকলে যে কোন জিনিসকে ধারণা করা যাবে। এই বোতলকে দেখে শিক্ষা পেলাম, বোতল যদি জলে পরিপূর্ণ থাকে তখন সে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমার জীবনও যদি পরিপূর্ণ থাকে তাহলে অপরের তৃষ্ণা মিটবে। পাখাকে দেখে শিক্ষা পেলাম, পাখা যখন ঘোরে তখন কিছু লোকের বাতাস লাগে, যখন স্থির থাকে তখন কোন কাজেই আসে না। আমিও কখন বসে থাকবে না, সব সময় কাজ করে যাব অপরের সেবা ও মঙ্গলের জন্য। যেদিকেই দৃষ্টি দিই না কেন, চেষ্টা করলে সেখানেই আমরা হাজার রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এইভাবে শিক্ষা নিলেও কিছু হবে না। দত্তাত্রেয় প্রথমেই বলছেন আমি এইভাবে বহু গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে আগে গুছিয়ে নিয়ে সংঘটিত করে আজকের এই অবস্থায় দাঁড় করিয়েছি। তাই দত্তাত্রেয়র কথার এত দাম। শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রথমে শিক্ষা দেন তোমরা নেতাজীর মত হও বা স্বামীজীর মত হও। ছাত্ররা বাচ্চা বয়স থেকে এই কথা শুনেই যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষককে ছাত্রদের বলতে দেখা যায়নি, তোমরা আমার মত হও। শিক্ষকরা কি ট্রাফিক পুলিশ? এর ওর দিকে হাত দেখাচ্ছে! শিক্ষককে সেই ভাবে তৈরী হতে হবে যাতে তার মধ্যে সেই দৃঢ় মনোভাব আসবে যে বলতে পারবে তোমরা আমার মত হও।

বোর্ড, পাখা, বোতল এগুলো সব প্রকৃতির উপমা এগুলো আমাদের মত সাধারণ মানুষকে সেইভাবে স্পর্শ করবে না। কিন্তু শুদ্ধাত্মা থেকে যেটা আসে সেটাই আমাদের স্পর্শ করে। দত্তাত্রেয় একেবারে পবিত্র শুদ্ধ আত্মা, তাঁর কাছ থেকে এই কথাগুলো আসছে। তাই বলে কি তিনি আগে থাকতেই পবিত্র আত্মা ছিলেন? তিনি বলছেন এটাই আমার সাধনা, আমি যখন পঞ্চতত্ত্বকে দেখলাম তখন তাদের আচরণ থেকে আমি শিক্ষা নিলাম। আমাকেও খেতে হবে, আমাকেও শরীর ধারণ করতে হবে, আমারও চোখের সামনে দৃশ্য আসবে, আমারও কানে দু-তিনটে কথা আসবে। কিন্তু এলো তারপর সেখানেই ত্যাগ।

সূর্যের কাছে ত্যাগের শিক্ষা ছাড়া আরেকটি শিক্ষা পেয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় তেমনি যত প্রাণী আছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মাকে

ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ দেখেন বস্তুত সূর্যই আছে প্রতিবিম্ব সূর্য আর আসল সূর্যে কোন তফাৎ নেই। শুধু উপাধি ভেদে তফাৎ হয়ে যায়। যত শরীর দেখছি সব শরীর সেই আত্মারই প্রতিবিম্ব। তাহলে কেউ যদি মারা যায় কষ্ট হবে না? খুব কষ্ট হবে, কারণ ঐ দেহের সাথে নানা রকমের লীলা খেলা চলছিল কিনা। কেশব সেনের খুব শরীর খারাপ, ঠাকুর ঠনঠনে কালীবাড়ি গিয়ে মানত করছেন, মা! কেশবের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা বলব? কেশব সেনের মৃত্যু যদি হয়ে যায় সেটা কোন দুঃখের কারণ নয়, তিনি যা পাওয়ার, যা করার করে নিয়েছেন। দুঃখ এটাই, যার সাথে কথা বলতাম সে নেই। কিন্তু এই দুঃখটাকে কত দূর নিয়ে যাওয়া যাবে, এরও একটা লাইন টেনে দিতে হয়। আমরা ঐ লাইনটা টানি না। লাইন যদি না টানা হয় তাহলে কি হবে? তখন দত্তাত্রেয় একটা পায়রার গল্প বলছেন। পায়রার কাহিনী অতি সাধারণ, কিন্তু ঐ পায়রা থেকেও তিনি একটা শিক্ষা নিলেন। কপোত অবধূতের অষ্টম গুরু।

৮) কপোত

দত্তাত্রেয় বলছেন *নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ। কুর্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ।।*১১/৭/৫২। হে রাজন্! এই জগতে কোন পরিস্থিতিতে, কোন মতে কারুর সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহ বা আসক্তি রাখতে নেই। কারুর প্রতি যদি তোমার বেশী আসক্তি বা স্নেহের সম্পর্ক থাকে তাহলেই কিন্তু তোমার সর্বনাশ। কি রকম সর্বনাশ হবে? বলছেন, আসক্তিপূর্ণ মন সব সময় বুদ্ধিকে বিপথে পরিচালিত করে তার স্বাতন্ত্রতাকে নষ্ট করে দেয় আর মনের মধ্যে সন্তাপের সৃষ্টি করে তাকে দুর্বল করে দেয়। আমি এই শিক্ষা পেয়েছি কপোতের কাছ থেকে। এই বলে দত্তাত্রেয় একটা কাহিনী বলছেন।

একবার জঙ্গলে দত্তাত্রেয় তপস্যা করছিলেন। সেখানে একটি বৃক্ষে এক কপোত নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বাসা তৈরী করে বহু দিন ধর বাস করছিল। কপোত-কপোতীর ভালোবাসা কেমন ছিল? বলছেন *কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ। দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ।।১১/৭/৫৪।।* দুজন দুজনের প্রতি ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এত ভালোবাসা হয়ে গেল যে কেউ কাউকে দৃষ্টির আড়াল করতে পারত না, ভালোবাসা দিয়ে এক অপরকে বেঁধে রেখেছে। *অঙ্গমঙ্গেন*, দুজনের অঙ্গ একেবারে সমান হয়ে গেছে, তোমার অঙ্গ আমার অঙ্গ, আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গ, আমার দুঃখ তোমার দুঃখ, তোমার সুখ আমার সুখ। *বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা*, তোমার চোখে হাসি আমার চোখে হাসি, তোমার চোখে জল আমার চোখে জল। এই হল সংস্কৃত ভাষা, পুরো শ্লোকও নয়, অর্দ্ধেক শ্লোকে কয়েকটা কথায় অনেক কিছু বলে দিচ্ছেন। কপোত-কপোতীর কি রকম ভালোবাসা? দৃষ্টিতে দৃষ্টি, অঙ্গে অঙ্গ, বুদ্ধিতে বুদ্ধি। দুজনের পরস্পরের প্রতি এমনই ভালোবাসা যে দুজনে একত্রে শয়ন, বসন, বিচরণ, বিশ্রাম, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং আহারাদি সম্পন্ন করত। এমনই ভালোবাসা যে তারা কেউ আলাদা থাকতে পারত না, সব সময় একত্রে সব কিছু করত। দত্তাত্রেয় বলছেন *যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা। তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ।।১১/২৭/৫৬।।* কপোতীকে কপোত এমন ভালোবাসত যে কপোতী যা কিছু ইচ্ছা করত কপোত তার যত কষ্টই হোক, যে করেই হোক কপোতীর ইচ্ছাকে সে পূর্ণ করত। এই কপোত ছিল অজিতেন্দ্রিয়, তার নিজের উপর কোন সংযম ছিল না, ফলে কপোতের যত কাম বাসনা কপোতী বিনিময়ে মিটিয়ে দিত। ঠাকুর বলছেন, গিন্নী ভালো মন্দ রান্না করে স্বামীকে পরিবেশেন করে বলবে, ওগো পাশের বাড়ীর উনি তাঁর স্ত্রীকে খুব সুন্দর হাতের বালা গড়িয়ে দিয়েছেন। নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক হয় তাতে দেখা যাবে, ওর মধ্যে দুজনেরই দুটো দুর্বলতা অবশ্যই থাকবে। এর দুর্বলতাকে ও পূরণ করে, ওর দুর্বলতাকে এ পূরণ করে। মেয়েরা চায় আর্থিক নিরাপত্তা, ছেলেরা চায়

ইমোশানাল নিরাপত্তা। যে কোন মেয়ে যদি নিজের স্বামীকে বা প্রেমিককে বলে তোমাকে ছাড়া আমি মরে যাব, বুঝবেন সে মিথ্যা কথা বলছে। মেয়েদের কখনই ইমোশানাল নিরাপত্তাহীনতা হয় না, মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা হয়। পুরুষরা হয় ইমোশানাল, পুরুষের চাই ভালোবাসা। ভালোবাসা যদি অন্য কোথাও থেকে পেয়ে যায় স্ত্রীকে উপেক্ষা করবে। যদি দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা করছে বুঝবেন সে অন্য কোথাও ভালোবাসা পাচ্ছে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। এখানে এটাই বলছেন, কপোতী শুধু আবদার করে যাচ্ছে। সীতা বায়না শুরু বললেন আমার সোনার হরিণ চাই, শ্রীরামচন্দ্র দৌড়ালেন। কিছু করার নেই, স্ত্রী আবদার করবে আর স্বামী পূরণ করবে না, সেকি কখন হয়! কোন পুরুষরা নারীর আবদার বেশি করে মেটায়? যারা অজিতেন্দ্রিয়। তাদের দুঃখের আর শেষ নেই, স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে মেটাতে জেরবার হয়ে যায়। যারা জিতেন্দ্রিয়, বেশি বায়না করলে দুদিন পরে বিদায় করে দেবে।

এরপর তাদের বাচ্চাদের জন্ম হল। তাদের একটু একটু করে নরম রোঁয়া বেরোচ্ছে। বলছেন, *প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ। শৃণ্বন্তৌ কুজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলয়াষিতৈঃ।।১১/৭/৫৯।।* এইবার কামনা-বাসনা সব পাল্টে গিয়ে সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ এসে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোর নরম নরম শরীরের দিকে কপোত-কপোতি তাকিয়ে আনন্দে বিগলিত হয়ে যেত। *শৃণ্বন্তৌ কুজিতং*, বাচ্চাগুলোর মিষ্টি মিষ্টি ডাক শুনে ওরা অবশ হয়ে যেত। জলের ঘূর্ণিতে যে মিষ্ট আওয়াজ হয় ঐ আওয়াজ মাছদের বেঁধে রাখে, ওখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। ওখানেই কপোত-কপোতীর অবশতা থেমে থাকছে না, বাচ্চারা তাদের নরম ডানা দিয়ে তাদের বাবা-মাকে স্পর্শ করছে, একটু একটু করে লাফাচ্ছে তাতেই কপোত-কপোতি মনে করছে যেন অনন্ত স্বর্গের সুখ নেমে এসেছে। বলছেন, *স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া। বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ।।১১/৭/৬১।।* এগুলো কিছু না, বিষ্ণুমায়া এদের বেঁধে রেখেছিল। অনেকে এই কথা বলে, সন্তান না হলে, সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা না থাকলে সৃষ্টি চলবে না, সংসারের স্থিতি হবে না। না তা নয়, সৃষ্টি ঠিকই চলবে, সংসারও আরামসে চলতে থাকবে। কারণ ভগবানের এমনই মায়া যে, কোটি লোক ঐদিকেই যাবে আর একজন ঈশ্বরের পথে যাবেন। ভগবানের মায়া সবাইকে নাচিয়ে ছাড়বে, কেউ ছাড় পাবে না। দশটা ইন্দ্রিয় আর তার সাথে মন, এই এগারো জন সবাইকে নাচিয়ে রেখেছে। সবাই ভগবানের মায়াতে একেবারে বিমোহিত হয়ে আছে। যারা বলে সবাই যদি ভগবানের পথে যাওয়ার জন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে সংসার চলবে কি করে, তাদের জন্য একটাই কথা ভগবান কি তোমাকে তাঁর সৃষ্টি রক্ষার দায়ীত্ব দিয়েছেন? যাই হোক এরা এখন অপত্য স্নেহ দিয়ে এদের লালন-পালন করতে থাকল। এরপর এদের কুটুম্ব সংখ্যায় অত্যাধিক হয়ে গেছে। একটা পাখি একসাথে কটি ডিম দেয় এই নিয়ে অনেকেই অনেক রকম বলে, কিন্তু সঠিক তথ্য হল, একটা মা পাখি ডিমে যখন তা দিতে বসে তখন তার শরীর যত দূর যাবে সে তত ডিম দেবে। ডিমের সাইজের উপর নির্ভর করে মা পাখি কটা ডিম দেবে। ডিমের সাইজ বড় হলে সংখ্যা কম হবে, সাইজ ছোট হলে সংখ্যায় বেশি হবে। কিন্তু ওর শরীরের যতটা সাইজ ততটা ডিমকে কভার করবে। যদি কায়দা করে ডিমটা সরিয়ে অন্য কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, পাখি ওটাকেই তা দেবে। যেমন কোকিল ঠিক অতটাই কাকের বাসায় গিয়ে ডিম দেয় যতটা কাক ডিমকে কভার করবে। পায়রা একবারে দুটো তিনটে ডিমই দেবে, কারণ তার মা ওর বেশি ডিমকে কভার করতে পারবে না।

একদিন শাবকদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য কপোত-কপোতী দুজনেই বাইরে গিয়েছিল। সেই সময় এক লুব্ধক বা ব্যাধ ঘুরতে ঘুরতে কপোতের বাসার কাছেই হাজির হয়ে গেল। ব্যাধ দেখছে বাসাতে কপোতের শাবকরা লাফালাফি করে খেলছে। সে তখন জাল পেতে তাদের ফাঁসিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কপোত-কপোতী

ফিরে এসে দেখছে তাদের শাবকরা জালের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে আর্তনাদ করছে। শাবকদের মায়ের আর দুঃখের পরিসীমা নেই। তখন বলছেন, *সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া। স্বয়ং চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পাশন্ত্যপস্মৃতিঃ।।১১/৭/৬৬।। দীনচিত্তাজমায়য়া*, জালের মধ্যে শাবকদের আবদ্ধ দেখে দীনচিত্ত, এত দিন চিত্তের মধ্যে যে আনন্দ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দীনচিত্ত হয়ে গেছে। শাবকদের ঐ অবস্থা দেখে কপোতীর অপস্মৃতি হয়ে গেছে, তার স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। স্মৃতি মানে, গুরু যে বেদান্ত বাক্য বলেছেন সেই বাক্যগুলিকে মনে রাখা। স্মৃতি মানে স্মরণ নয়, শাস্ত্রে যখনই স্মৃতি শব্দ আসে তার অর্থ একটাই, শাস্ত্রের যে কথাগুলো গুরুমুখে শ্রবণ করা হয়েছে সেটাকে ধারণা করা। গীতায় ভগবান বলছেন *ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ* আর *স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো*। আমরা সবাই এখন শাস্ত্রের আলোচনা শুনছি, কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মোহ মায়া চলে গেছে। তার মানে শাস্ত্র বাক্যগুলি আমাদের মনে গিয়ে বসে গেছে। কিন্তু আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে বেরিয়ে রাস্থায় যেতে যেতে সবটাই অপস্মৃতি হয়ে যাবে। অপস্মৃতি মানে গুরু যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো মন থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া। দীনচিত্ত হলে কি হয়? অপস্মৃতি হয়ে যায়, সম্মোহ হয়ে গেলেই মানুষ দীনচিত্ত হয়ে যায় আর মোহ চিত্ত যেমনি হল তখন *স্মৃতিবিভ্রমঃ*, শাস্ত্রের যে কথাগুলো গুরুমুখে শুনেছিল সেগুলো মনে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ করতে পারে না। তখন যদি বলে, তুমি এটা কী করছ, সব ভুলে গেলে নাকি। সে তখন বলবে, সব মনে আছে কিন্তু আমি পারছি না। বলছেন, বাচ্চাদের ঐ অবস্থা দেখে কপোতীর আর কোন হুঁশ থাকল না, সেও আর্তনাদ করতে করতে বাচ্চাদের বাঁচাতে ঝাপিয়ে পড়তেই ব্যাধের জালে ফেঁসে গেল। সন্তানের প্রতি এমনই মায়া।

কপোত ফিরে এসে দেখছে নিজের সন্তানরা জালের মধ্যে ফেঁসে গেছে, তার এতদিনের প্রিয়তমা স্ত্রীও ফেঁসে গেছে, খুব কাঁদছে। কপোত তখন খুব সুন্দর বলছে *অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্মতেঃ। অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ।।*১১/৭/৬৮। আমি কি অভাগা, *অল্পপুণ্যস্য*, আমার পূণ্য কিছুই নেই তা নাহলে কি আমার এই দুরবস্থা হয়! স্ত্রীর প্রতি আমার কাম-বাসনা এখন পূর্ণ হয়নি, আমার যত রকমের আশা ছিল সেগুলও পূর্ণ হয়নি। ধর্ম, অর্থ আর কাম যেটা গৃহস্থের মূল এই তিনটে স্ত্রীকে দিয়েই পূর্ণ করা হয়, তাই তিনটেই আমার নাশ হয়ে গেল। স্ত্রী যদি না থাকে কোথা থেকে কামের পুর্তি হবে, স্ত্রী যদি না থাকে তাহলে অর্থ দিয়েই বা কি হবে আর স্ত্রী যদি না থাকে আমি ধর্ম পালন কি করে করব। এটা আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ থিম, মহাভারতে এই জিনিসটাকে বার বার নিয়ে আসা হয়েছে আর পুরাণে তো আছেই। পাখির মাধ্যমেও ধর্ম, অর্থ, কাম চলে। কপোত বলছে ধর্ম, অর্থ, কাম কিন্তু আসলে তা নয়, ওর শুধু কাম, স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে পারবে না, যে বাচ্চাগুলো এত দিন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছিল, মিষ্টি কথা আর শুনতে পারবে না। কপোত বলছে *অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা। শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ।। ১১/৭/৬৯।।* আমার প্রিয়তমা কত ভালো ছিল, আমাকে ইষ্ট মনে করত, আমাকে ভগবান মনে করত, আমার কথা মত চলত, আমি যা করতে বলতাম তাই করত, আর এই সন্তানদের জন্য আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে গেল! আমার স্ত্রী চলে গেল, আমার সন্তানরা চলে গেল, আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ! আর যে বাড়িতে গিন্নী নেই সেই বাড়িতে থেকে কি হবে! এইভাবে কপোত একা একা প্রলাপ করে যাচ্ছে। জালের মধ্যে আমার নিজের লোকেরা ছটফট করছে, কিন্তু বেরোতে পারছে না, আমি এখানে নিঃসঙ্গ পড়ে থেকে কি করব। আমার আপনজনরা যেখানে সেখানেই আমার স্থান। এই সব বলে সেও জালে লাফিয়ে পড়ল। আর ঐ ব্যাধ সে অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির, তার মধ্যে কোন করুণার উদয় হল না, ব্যাধ দেখল আমার কপাল খুলে গেছে, এসেছিলাম

দুটো পায়ার বাচ্চা ধরতে কিন্তু সাথে ওদের বাবা-মাকেও পেয়ে গেলাম, সবাইকে বেঁধে থলের মধ্যে পুরে বাড়ি চলে গেল।

পায়রার মুখ দিয়ে একটা মানব জীবনের গল্প শোনান হল। দত্তাত্রেয় এই দৃশ্য দেখে দুটো শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন *এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতৎত্রিবৎ। পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি।। যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারামপাবৃতম্। গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ।।*১১/৭/৭৪। যারাই নিজের সম্বন্ধীর থেকে সুখ পায়, তাদের ভরণ-পোষণ করাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই পায়রাদের মতই তাদের দুরবস্থা হয়। এই মানব-শরীর মুক্তি প্রাপ্তির মুক্ত দ্বার। মানব-শরীর ধারণ করার আগে কত যোনির মধ্যে তাকে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। পিঁপড়ে থেকে শুরু করে পায়রার মত পাখি, সেখান থেকে কত পশুর শরীরের মধ্য দিয়ে এসে এই মানব দেহে জন্ম নিয়েছে। এর আগে কোথাও তার মুক্তির সুযোগ ছিল না। একমাত্র এই মানব যোনিতেই ঈশ্বর চিন্তন করা সম্ভব, আর কোন যোনিতে যেটা কখনই সম্ভব নয়। সমস্ত প্রাণী মানুষের থেকে কোন না কোন ক্ষেত্রে বেশী ক্ষমতাবান। টিকটিকি কত স্বচ্ছন্দে দেওয়ালে চলতে পারে, মানুষ পারবে না। মানুষ পাখির মত আকাশে উড়তে পারে না। একটা গৃধ্র কত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে, মানুষ পারে না। যে কোন পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ মানুষের থেকে কোন না কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে কিন্তু মুক্তির ব্যাপারে মানুষের উপরে কোন প্রাণীকেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। মানুষের কাছে মুক্তির দুয়ার খোলা, একটু চেষ্টা করলেই সে জগতের সমস্ত বন্ধনকে কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে। এটাই দত্তাত্রেয় বলছেন, *মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্*, মুক্তির দরজাটা খোলা পড়ে আছে, কি আশ্চর্যের তাও মানুষ বেরিয়ে যেতে পারছে না।

বলছেন, এই পায়রদের মত যারা দু-পয়সার জিনিসকে ভালোবেসে নিজের জীবনকে নষ্ট করছে তাদের একটা শব্দই বলা যায়, শাস্ত্রে তাদের বলা হয় *আরূঢ়চ্যুত*। আরূঢ়চ্যুত মানে উপরে উঠে আবার যার পতন হয়ে যায়। সন্ন্যাসী বা যোগীদের ক্ষেত্রে বলা হয় যোগভ্রষ্ট কিন্তু গৃহস্থদের ক্ষেত্রে বলা হয় আরূঢ়চ্যুত। ভালো কিছু কর্ম করে উপরে উঠেছে বলেই সে এই মানব শরীর পেয়েছে। কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না বলে উপর থেকে আবার চ্যুত হয়ে গেল। হে ভগবান! শুধু নিজের স্ত্রী সন্তানকে এত ভালোবাসে বলে অকারণে এভাবে নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে দিল। মানুষ এত উপরে যায়, টাকা-পয়সা সব আছে কিন্তু স্ত্রী সন্তানের মায়াতে আবদ্ধ হয়ে সব হারিয়ে বসে। তাহলে সে কি করবে? সে কি নিজের স্ত্রী-পুত্রকে মরতে দেব? সেটাতো পারবে না। চোখের সামনে নিজের পরিবারকে মরতে দেখে সে কি চুপ করে বসে থাকবে? তাহলে সে তো একটা পশু, পরে আরেকটাকে বিয়ে করে সংসার পাতবে। আর যারা পশুবৎ নয় তাদের এমনিতেই ঝাঁপ দিতে হবে না, বেঁচে থেকেও গ্লানিতেই সে মরে যাবে। সব ব্যাপারেই একটা লাইন টানতে হয়। এই যে এখানে বলছেন, কি সুন্দর কথা, *দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ*, একেবারে জলে জল তেলে তেল মিশে গেছে, এই করলে কপোত কপোতির মতই মরতে হয়। সেইজন্য প্রথমেই বলে দিচ্ছেন – দ্যাখো বাপু, তুমি আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যেও না। একবার যদি আসক্তিতে পড়ে যাও তাহলে তুমি আর পথ পাবে না, সেইজন্য প্রথম থেকেই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে যেতে হবে। যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি, যার জন্য এই মানবজীবন পাওয়া গেছে, সেই উদ্দেশ্যটা তখন আর নষ্ট হয়ে যাবে না। ভগবান দুটো বাচ্চাকে বড় করতে আমাদের পাঠাননি, ভগবান সুযোগ দিয়েছেন যাতে আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে যেতে পারি।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কপোত-কপোতি নিজের সন্তানদের জন্য চোখের জল ফেলছে, আমরা দেখি শ্রীশ্রীমাও তো তাঁর নিজের স্বজনদের জন্য চোখের জল ফেলছেন। তাহলে কপোত-কপোতীর চোখের জল ফেলাতে দোষ কোথায়? ভাগবতে এটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হল কেন? শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময়

বা কোন বিষয়কে নিয়ে অধ্যয়ন করার সময় তার সমষ্টি চিত্রটাকে সব সময় মাথার মধ্যে রাখতে হয়। সাধারণ মানুষের সমস্যা হল তারা সব সময় খাপছাড়া বা খণ্ডিত ছবিটা নেয়। এখানে দত্তাত্রেয়কে নিয়ে বলছেন, দত্তাত্রেয় একজন সন্ন্যাসী, তাঁর ব্যাপারে যা কিছু বলা হচ্ছে এটা সন্ন্যাস ধর্মের বর্ণনা, গৃহস্থ ধর্মের সাথে এক করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তখন একজন গৃহস্থ বলতে পারে তাহলে এগুলো শুনে আমার কি লাভ, আমি কেন শুনব? ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে সংসারীরা এক আনা ত্যাগ করার সাহস পায়। একদিকে কপোত-কপোতী সন্তানের ভালোবাসায় এমন আসক্ত যে, সবাই এক এক করে ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ে গেল। অন্য দিকে রয়েছেন অবধূত, যিনি ঐ দৃশ্য দেখে সংসারের ধারে কাছেই গেলেন না। সংসারী এখন কোনটাকে নেবে? কপোত-কপোতীর মত মরে যেতে চাইবে না, আর সন্ন্যাসীও হতে পারবে না। একদিকে কপোত-কপোতী অন্য দিকে একজন কাঠখোট্টা সন্ন্যাসী, এই দুটোর মধ্যে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে আমাদের এই লাইনের কোন একটা জায়গায় থাকতে হবে। যতটা কপোত-কপোতীর কাছাকাছি থাকবে ততটা তার কষ্ট হবে আর যতটা দত্তাত্রেয়র দিকে যাবে ততটা তার কষ্ট কম হবে। এই জগতটা একটা প্যাকেজ ডীল, যখন শাড়ি কিনতে যাওয়া হয় তখন একটা দোকান থেকে কিনলে একটা গিফট দেবে, অন্য দোকানে অন্য গিফট দেবে। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি কোন গিফট নেব। জগতটাও একটা পুরোপুরি প্যাকেজ ডীল, ভালোবাসা যেমন আনন্দ দেয় তেমনি চোখের জলও দেয়। একজন লেখকের একটা খুব নামকরা কথা আছে, It is good to have loved and lost than to have not loved at all, জীবনে ভালোবেসেছি আর হারিয়েছি আর কেঁদেছি, একেবারেই না ভালোবাসার থেকে এটা অনেক ভালো। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী বলছেন, আমি ভাই চোখের জল খরচ করতে পারব না, আমার ভালোবাসাও লাগবে না। আমরা কিছুটা এটাও করব কিছুটা ওটাও করব। শ্রীশ্রীমায়ের যে কথা বলা হল, শ্রীশ্রীমা আসক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন, গ্রহণ করার জন্য আসক্তিটা সারা জীবন ধরে শ্রীশ্রীমাকে মারতে পারছে না। আসক্তি অবশ্যই আছে, আসক্তি না থাকলে সংসার চলবে কি করে! রাধুকে যখন ভালোবাসছেন তখন মা অনুযোগ করছেন, রাধুর জন্য আমার সময় গেল, অর্থ গেল। তবে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, জোর করে কোন শক্তি মায়ের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে না। আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কর্ম সবাইকে ঐদিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা বাধ্য। ঠাকুর মাকে দিয়ে বিশেষ কাজ করাতে চাইছেন, সেইজন্য স্বেচ্ছায় রাধুকে গ্রহণ করতে হল। কিন্তু যেদিন তিনি রাধুর থেকে মন তুলে নিলেন, সেদিন থেকে আর রাধু রাধু করছেন না। অন্তিম সময়ে স্বামী সারদনন্দজী একটা শেষ চেষ্টা করছে, রাধুর ছেলেকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, মা বলছেন, ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আর তোরা আমাকে বাঁধতে পারবি না। শ্রীমার যে আসক্তি ঐ আসক্তি সাংসারিক আসক্তি নয়, উনি চাইলে ছেড়ে দিতে পারতেন। সোনাতে খাদ না মেশালে যেমন গয়না হবে না, ঠিক তেমনি শ্রীমাকেও সংসারে বিচরণ করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ খাদটুকু গ্রহণ করতে হয়েছিল। অবতারাদি পুরুষদের ক্ষেত্রে এসব জায়গায় একটা বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার নাম লীলা। লীলা বলতে আমরা অনেক সময় ভুলে নাটক মনে করি, কিন্তু কোথাও কোন নাটকীয়তা নেই, সবটাই বাস্তব। আমাদের কর্ম, মায়া, অবিদ্যা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে। আগেও আমরা এই উপমা নিয়েছিলাম, একজন কয়েদীকে পুলিশ ঘিরে থাকে, পুলিশ যেদিকে তাকে কোমড়ে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে তাকে সেদিকেই যেতে হবে। আর শ্রীমা বা ঠাকুর এনারা হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, তাঁকে আরও বেশি পুলিশ বডিগার্ড রূপে ঘিরে রেখেছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি যেদিকে যাবেন পুলিশকে সেদিকেই যেতে হবে। মায়ার অধীনে সবাই আছে, আমরাও আছি আর শ্রীমা, ঠাকুর এনারাও আছেন, তফাৎ হল শ্রীমা যেদিকে যাবেন মায়াকে সেই দিকে যেতে হবে, আর আমাদের ক্ষেত্রে মায়া যেদিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে আমাদের সেই দিকে যেতে হবে। আমরা ঈশ্বরকে ভুলে আছি, ঈশ্বর তাই আমাদের পেছনে। সেইজন্য আমাদের

ছায়া এগিয়ে এগিয়ে যায়। ছায়া যেদিকে যায় আমরাও সেদিকে যাই, সারা জীবন আমরা সবাই ছায়াকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একবার মুখটা যদি ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তখন ছায়াটা আমাদের পেছনে পেছনে চলতে থাকবে। যতক্ষণ আলো আর ছায়ার খেলা চলবে ততক্ষণ ছায়া ছাড়বে না। ঠাকুরেরও ছায়া আছে, মায়েরও ছায়া আছে, কিন্তু ছায়া তাঁদের পেছনে পেছনে চলে, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের দিকে মুখ করে আছেন, আর আমাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর পিঠ পেছনে। ভাগবত কোন নাটক নয়, কোন উপন্যাস নয়, ভাগবত অত্যন্ত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, যার জন্য ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। আধ্যাত্মিক গ্রন্থের কাজ হল সত্যকে আমাদের সামনে রেখে দেওয়া। চোখের জল ফেলা, গামছা নিংড়ানোর মত হৃদয়ের যন্ত্রণা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে তোমাকে ত্যাগের পথ অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আমরা বলছি, আমি পারছি না, ওনারাও বলছেন তুমি পারবে না, না কেঁদে তুমি থাকতে পারবে না, কিন্তু তার মধ্যেও যতটা তুমি ত্যাগের পথে এগোতে পারবে ততটাই তোমার লাভ, ততটাই তোমার শান্তি। আজ হোক বা কালো হোক সবাইকে দত্তাত্রেয়র অবস্থায় যেতে হবে, কারুর এক জন্ম লাগবে, কারুর হাজার জন্ম লাগবে, এবার আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি কত জন্মে পেরোতে চাই। দত্তাত্রেয় কি এক জন্মেই এই অবস্থায় এসেছেন? আমরা তা মানি না। কোথাও আমাদের একটা শুরু করতে হবে।

প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা কয়েকটা কথা নিয়ে আলোচনা করছি, এগুলো শুনে রাখা ভালো। আধ্যাত্মিক জীবনে দুটো জিনিস হয়ে, একটা হল ধর্ম আরেকটা হল আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম হল সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আধ্যাত্মিকতা শুরুই হয় সত্ত্বগুণের পার থেকে। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁর ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাঁর কখনই পতন হয় না। যদি কোন সন্ন্যাসী বা সাধুর পতন হয় তাহলে বুঝতে হবে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন না। যে জেনে গেছে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, সে কোন দিন আগুনের ধারে কাছে যাবে না। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে, আবার বলছেন, বশিষ্ঠ অত বড় জ্ঞানী তিনিও পুত্রশোকে কাতর হয়ে গেছেন। এনাদের শাস্ত্রজ্ঞান প্রচুর ছিল, কিন্তু মূলতঃ তাঁরা ছিলেন বেদমার্গের পথিক, মানে ধর্মমার্গের লোক। ধর্মমার্গের পথিক মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একেবারে সত্ত্বগুণে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মাচরণের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না, তখনও কিন্তু তিনি সত্ত্বগুণের সীমানায় বাঁধা। ভয়তরাসে মানে, যদি কোন ধাক্কা আসে সেই ধাক্কা কতটা সামলাতে পারবেন বলা খুব মুশকিল। সেইজন্য ধর্ম জিনিসটা খুব খটমটে, ভরসা করা যায় না। যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন বা যিনি জীবনে কোন একটা আদর্শকে ভালোবাসেন, জীবনে তাঁর কখনই ধাক্কা লাগে না। বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চারটে আদর্শ ছাড়া পঞ্চম কোন আদর্শ হয় না। বিদ্যা মানে যে কোন বিদ্যাতে নিজেকে পুরোপুরো উৎসর্গ করা। সম্পদ হল, দেশের জন্য, সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা। সেবা, আমার সামনে যেই আসুক আমি তার সেবা করব বা আমি যেটার দায়ীত্ব নিয়েছি সেই দায়ীত্বকে আমি সেবা ভাব নিয়ে পালন করব। ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতার পথ, যেখানে জগতের সব কিছু ত্যাগ। যে কোন একটা আদর্শকে নিতে হবে। সংসারীদের দ্বারা ত্যাগ হবে না, তিনটে আদর্শ পড়ে রইল, বিদ্যা, সম্পদ ও সেবা। সেবা মানে সমাজের সেবা, জগতের সবার সেবা। যারা গৃহবধূ তাদের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি হবে না। থাকল সেবা আর বিদ্যা। যিনি সেবা আদর্শ নিয়েছেন তাঁর সন্তান যদি মারা যায় তাতে সেবা আদর্শে কোথায় ঘাটতি পড়ছে! কোথাও নয়। তাহলে চোখের জল কেন ফেলছেন? কারণ তিনি সেবা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নন। যে কোন আদর্শে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত থাকে তাঁর কোন অবস্থাতেই চোখের জল বেরোবে না। ঠাকুরার আদর্শ ছিল ত্যাগ, ত্যাগ এখানে Technical শব্দ, ত্যাগ মানে ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না বা আত্মা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না। শ্রীমা খেতে পাচ্ছেন না, তাঁর কোন হুঁশ নেই। কেউ যদি একটা কোন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার ছেলে মারা গেল, স্ত্রী মারা গেল, সমাজে

কেউ মারা গেল, তাতে আদর্শে কোথায় আঘাত করছে? কোথাও না, মুশকিল এটাই, আমরা নিজেদের মনে করি নিধিরাম সর্দার কিন্তু ভেতরে না আছে ঢাল না আছে তলোয়ার। যতই আমরা শাস্ত্রের কথা শুনে যাই আমরা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি আমরা শোধরাব না।

৯) অজগর

দত্তাত্রেয়র নবম গুরু অজগর। অজগরের এখানে যে বর্ণনা আছে তাতে বলছেন, অজগর তার সামনে যে শিকার পায় সেটা খেয়েই সে ঐভাবে পড়ে থাকে। আসলে অজগরের এত বড় শরীর যে বেশি নড়াচড়া করতে পারে না, কিন্তু একেবারেই যে নড়াচড়া করে না তা নয়, অজগরও নড়াচড়া করে। কিন্তু এখানে বক্তব্য পুরোপুরি আলাদা। এর প্রথম শ্লোকটা দর্শন আর দ্বিতীয়টা উপাচার। দত্তাত্রেয় বলছেন *সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ। দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ।*।১১।৮।১। হে রাজন্! আমরা যতই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি না কেন আমাদের পূর্বজন্মকৃত কর্মের প্রারব্ধ হেতু যে দুঃখ-কষ্ট আসবার সেটা আসবেই। ভাগবতে প্রারব্ধজনিত দুঃখের তত্ত্বটা ঘুরে ঘুরে আসে। এটা বলা মুশকিল ভগবান বুদ্ধের কোন প্রভাব ভাগবতের উপর পড়েছিল কিনা। ভগবান বুদ্ধ দুঃখ দুঃখই করে গেছেন, ভাগবতেও যত দুঃখ নিয়ে বলা হয়েছে আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে সেইভাবে অতটা বলা হয়নি। এখানেও দত্তাত্রেয় বলছেন তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন দুঃখ আসবেই। আর ইন্দ্রিয়জনিত যত সুখ আর দুঃখ আছে, যেমন গত কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়াতে কেমন একটা ভ্যাপসা গরমে সবাই হাঁকপাঁক করছে, আমরা ভাবছি কবে একটু বৃষ্টি আসবে, আশা করছি কাল পরশু বৃষ্টি এসে যাবে, কিন্তু মৌসুমী বায়ু সে তার নিজের মত চলছে।

জগতে কি কেউ আছে জীবনে দুঃখ চায়? মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে morbid, এরা দুঃখ পেলে আনন্দিত হয়, এটা এক ধরণের মানসিক রোগ, সাধারণ ভাবে এই রোগ মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এর উল্টো হয় sadist, এরা কাউকে না মেরে শান্তি পায় না, মেরে আবার কাঁদবে, morbidityতে মার খেতে ইচ্ছে করে, মার খাওয়ার পর চোখের জল ফেলবে, চোখের জল বেরিয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক হয়ে যায়। এগুলো রোগ, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কেউ দুঃখ চায় না। যারা দুঃখ চায় না তারা অনেক রকম চেষ্টা করে যাতে দুঃখকে আটকানো যায়। সন্তানের একটু শরীর খারাপ হলে বাড়ির সবাই কত দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়, এই ডাক্তার, এই কবিরাজ, এই বাবাজী, সেই পীড়বাবা, মাদুলি, আধুলি কত কি করে বেড়াচ্ছে। তাও সন্তানের কাশি হবেই, জ্বর হবে, পেট খারাপ হবেই, কিছু করার নেই। ঝামেলা এলে আমরা বলি, হে ভগবান! এই ঝামেলা কোথা থেকে যে এসে গেল। কিন্তু সুখ এলে কেউ বলে না যে, হে ভগবান! এত সুখ কোথা থেকে এলো। কিন্তু দুঃখ যেভাবে আসে সুখও সেইভাবে আসে। আমরা আনন্দস্বরূপ কিনা, আমাদের ভেতরে সচ্চিদানন্দ আছেন তাই আমরা স্বভাবেই সচ্চিদানন্দ, সেইজন্য আনন্দ এলে আমাদের গায়ে লাগে না। আমরা যদি হিসাব করি সারাদিন আমি কতক্ষণ দুঃখে ছিলাম, কতক্ষণ সুখে ছিলাম, তখন দেখা যাবে দুঃখের মাত্রা অনেক কম থাকবে। বাড়িতে যদি প্রচুর অশান্তি চলতে থাকে দেখা যায় সেখানেও মাঝে মাঝে আনন্দের একটা বাতাস আসতে থাকে। ঐ আনন্দের বাতাস যখন আসে তখন আনন্দটাও খুব গভীর হয়। তবে সব কিছুতেই আমাদের একটা কর্মের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। কিছু মানুষ এত বাজে কর্ম নিয়ে এসেছে, ঠাকুরও বলছেন, আগের জন্মে দানটান করা থাকলে এই জন্মে একটু টাকা-পয়সা হয়। ঠিক তেমনি আগের জন্মে ভালো কর্ম করা থাকলে এই জন্মে সুখ-শান্তি হয়। সেইজন্য যাদের জীবনে সুখ-শান্তি নেই তারা যদি ভালো করে দিনে চার-পাঁচ ঘন্টা করে জপধ্যান, তপস্যা করে, ধীরে ধীরে বাজে কর্মের প্রভাব কেটে যায়। কারণ মানুষ জীবনে

যা কিছু পায় তপস্যার জোরেই পায়। মূল কথা হল, দুঃখ যেমনি নিজের গতিতে আসে, সুখও তেমনি নিজের গতিতে এমনিই আসে।

দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন *গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা। যদৃচ্ছেয়ৈবাপতিতং রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ।।১১/৮/২।।* অজগর *অক্রিয়ঃ*, কোন কাজ করে না, সেইজন্য *গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং*, রসাল সুমিষ্ট যাই হোক বা স্বাদহীন হোক যেমনটি পেল তেমনটিই খেয়ে নেয়, পেট ভরা নিয়ে কথা। ঠাকুর বলছেন, আধ্যাত্মিক পুরুষের একটু ঝোলভাত হলেই হয়ে যায়, তারা খাওয়ার বেশি আড়ম্বর করে না।

কয়েক বছর আগে কলকাতার অত বড় নামকরা হাসপাতালে আগুন লেগে কত লোক মারা গেল। যারা মারা গেছে তারা আজ না হলে আগামীকাল যে ভাবেই হোক মারা যেত। হাসপাতালের যারা ডিরেক্টর, এরা সব বড় বড় কোম্পানীর মালিক, টাকা-পয়সার অভাব নেই, ক্ষমতাবান লোকেদের সঙ্গে দহরম-মহরম, স্বর্গে যেমন দেবতা এখানকার এরাই দেবতা, কিন্তু তাদের সবাইকে জেলে যেতে হল। দুদিন আগেও যারা বড় বড় পার্টিতে ভালো ভালো খানাপিনা করে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল, গতকালও কি তারা ভেবেছিল আগামীকাল তাদের জেলে কাটাতে হবে। এখন তাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

মানুষ জীবনে যখন অনেক কিছু দেখে নেয় তখন সে সব কিছুতেই উদাসীন হয়ে যায়। যারা খুব উপরে উঠে গেছে তাদের দেখেও সে আর অবাক হয় না, আবার সেখান থেকে যখন নীচে পড়ে যায় তাতেও সেই অনপেক্ষই থাকে, সে ভালো করেই জানে ওখান থেকে আবার সে উঠে দাঁড়াবে। একটা সমাজ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে তবে গিয়ে এই ধরণের ভাবনা-চিন্তাগুলো আসে। ঋষিরা শিষ্যদের বলে গেছেন, এক সময় এই রকম হয়েছিল, সেই রকম হয়েছিল। অনেক কিছু দেখে দেখে তাঁরা অনপেক্ষ হয়ে গেছেন। দত্তাত্রেয় এই অনপেক্ষর স্তর থেকে কথা বলছেন – আপনি যতই চেষ্টা করুন, যত অনিচ্ছাই থাকুক আপনার কর্ম আপনাকে কখনই ছাড়বে না। হাসপাতালের যারা ডিরেক্টর ছিল, তারা তো প্রত্যক্ষ ভাবে দোষী নয়। তার জানে না হাসপাতালে কোথায় কি হচ্ছে, কলকাতা শহরে এই ধরণের তাদের কত বাড়ি আছে। প্রথম যখন মাঝ রাত্রে হাসপাতালে আগুন লাগার ফোন তাদের কাছে গেছে, তখন হয়ত ঘুমের ঘোরে অতটা গুরুত্ব দেয়নি। দ্বিতীয় ধাপে আরও অনেকটা এগিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল গোলমাল লাগতে যাচ্ছে তখন তারা নিশ্চয়ই অনেক কিছু চেষ্টা করেছে, পুলিশকে দিয়ে আটকান যায় কিনা, নেতাদের দিয়ে ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সব রকমের চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু কিছুই হল না, থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হল। এটাই দত্তাত্রেয় যদু রাজাকে বলছেন। ঠিক তেমনি আপনি স্বর্গেই থাকুন আর নরকেই থাকুন আপনার কপালে যে সুখ আছে সেটা যেভাবেই হোক এসে যাবে। এখানে যুক্তিটা খুব সাধারণ। এত ক্ষমতাবান যারা তারা এত চেষ্টা করেও নিজের দুঃখকে আটকাতে পারছে না। যদি দুঃখকে নাই আটকান যায় তাহলে সুখকেও তো আটকান যাবে না। সেইজন্য সুখের জন্য কখনই বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করতে নেই, সুখ আসার থাকলে এমনিই আসবে। এখানে এটা বলছেন না যে তুমি নিজের ধর্ম কর্ম করবে না। শাস্ত্র বার বার বলছে তুমি ধর্মে অবস্থিত থাকবে। ধর্মে অবস্থিত থেকে তুমি এগুলো করবে না – ধর্মের বাইরে যাবে না, মোসায়েবি করতে যাবে না, অযথা সুখের পেছনে দৌড়াবে না, সুখের পরিকল্পনা করবে না। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবনকে সুস্থ ভাবে পরিচালিত করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও।

এই সব বলে দত্তাত্রেয় বলছেন এইভাবে উদাসীন থেকে জীবন যাপনের শিক্ষা আমি অজগর সাপ থেকে পেয়েছি, এই অজগর আমার একজন গুরু। অজগর কারুর কাছে যাঞ্ছা করে না, কোন কিছু কামনা করে না, অনায়াসে যা পাওয়া যায় সেটা শুখা হোক, মিষ্টি হোক, স্বাদিষ্ট হোক অস্বাদিষ্ট হোক অথবা কম বা বেশী

যাই হোক না কেন তাতেই সে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করে জীবন রক্ষা করে। অতি সাধারণ যে গৃহস্থ সে রোজ একই ডাল, তরকারি, ভাত খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারাও মাঝে মাঝে বলে এই একই খাওয়া দাওয়া ঠিক জমছে না, তারপর একটু আচার নিয়ে এল কিংবা তরকারিটা পাল্টে দিল। কিন্তু বেলুড় মঠে রোজ একই ঝোল ভাত বছরের পর বছর সাধুরা খেয়ে যাচ্ছে, এতেই তাঁদের তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষ যে উন্নতি করছে এটা কি করে বোঝা যাবে? অনেকগুলো লক্ষণের মধ্যে একটা খুব গুরত্বপূর্ণ দিক হল কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আয়োজন করে না। একটা কিছু হয়ে গেলেই হল। বিশেষ আয়োজন মানে? অনেক পদ রান্না করতে হবে, তার জন্য সময় দিতে হবে, বাজারে ঘুরে ঘুরে অনেক রকম আনাজ কিনতে হবে, তার জন্য সময় নষ্ট হবে। আর আনাজপাতি কেনার জন্য পয়সা লাগবে, পয়সা উপার্জন করতে হলে আলাদা ভাবে খাটতে হবে, তার জন্য অনেক সময় দিতে হবে। আধ্যাত্মিক পুরুষের অত সময় কোথায়, শরীর রক্ষা করতে হবে তাই একটা কিছু জুটে গেল তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেল। এটাই অজগর থেকে দত্তাত্রেয় শিক্ষা নিলেন, যা সামনে আসছে সেটাকেই ধরে খেয়ে নিল। শুধু খাওয়ার ব্যাপারেই নয় ইন্দ্রিয়ের যত রকমের বিষয়তৃষ্ণা আছে সেখানেও এই একই মনোভাব।

সুখ যদি এমনিই আসে আর দুঃখও যদি এমনিই আসে তাহলে কি মানুষ কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকবে? আমাদের মনে রাখতে হবে, এখানে দত্তাত্রেয় কিন্তু গৃহস্থ ধর্ম নিয়ে কথা বলছেন না। যদু রাজা দত্তাত্রেয়কে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কোথা থেকে এই শান্তি পেয়েছেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে অবধূত যে চব্বিশ গুরুর কথা বলছেন তাতে মূলতঃ সন্ন্যাস ধর্মেরই কথা বলছেন। সন্ন্যাসীরা যা পেয়ে যান তাই খেয়ে নেন, যতটুক পান ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকেন। ভাগবত তো গৃহস্থদের গ্রন্থ, তাহলে গৃহস্থদের কাছে এই কাহিনীগুলো কেন শোনান হয়? এই যে অজগরের কথা বলছেন, অজগরের মত অক্রিয় হয়ে পড়ে থাক, যা জুটে যাবে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; এতো সন্ন্যাসীর ধর্ম হয়ে গেল, সন্ন্যাসীর ধর্ম তো উপনিষদে দেওয়া আছে, ভাগবতে কেন বলছেন? তাহলে গৃহস্থরাই বা কি করবে? মূল কথা হল যার যেটা ধর্ম সেই ধর্মের বাইরে কাউকে যেতে নেই। যেমন যে ছাত্র, তার ধর্ম পড়াশোনা করা, সে পড়াশোনা করে যাচ্ছে। ভাগবত এই কাহিনীর মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তুমি পড়াশোনা করে যাও, এটাই তোমার ধর্ম, কিন্তু ফলের কোন প্রত্যাশা করবে না, নিজে থেকে যা ফল আসার আসবে। তুমি চাকরির জন্য দরখাস্ত করবে, তুমি পড়াশোনার তপস্যা করেছ, তাই তুমি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য তুমি ভালো চাকরি পাবে। ভালো চাকরি পেয়ে এবার তুমি ধর্ম পথে চল, কারণ তুমি গৃহস্থ। কিন্তু যারা ধর্ম পথে থাকে না তারা চাকরি করে মাইনে পাচ্ছে কিন্তু চেষ্টা করছে কি করে ঘুষ নিয়ে আরও বেশি উপার্জন করা যায় বা অফিসের সম্পত্তি চুরি করবে, এগুলোকে বন্ধ করতে বলছেন। দ্বিতীয় যেটা গৃহস্থদের উদ্দেশ্যে বলছেন, গৃহস্থকেও বেশি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে নেই, তাতে শরীর ভালো থাকে, মনও ভালো থাকে আর অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু তিন আর চার নম্বর শ্লোকে পুরোটাই সন্ন্যাসীদের জন্য বলছেন।

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোহনুপক্রমঃ। যদি নোপনমেদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্।। ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্ দেহমকর্মকম্। শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি।।১১/৮/৩-৪।। খাবার যদি নিজে থেকে না আসে তখনও অজগরের মত পড়ে থাকতে হয়, নিজে থেকে যা আসবে সেটুকুতেই শরীর মনের চাহিদা মিটিয়ে দিতে হয়। সন্ন্যাসীদের জন্য এখানে চরম মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন, এতটা চরমে যাওয়ার যে দরকার আছে তা নয়। অবধূত সন্ন্যাস ধর্মের কথাই বলছেন, তবে গৃহস্থরা এর যতটা সম্ভব পালন করবে। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থরা এক আনা ত্যাগ করতে পারে। তবে কোন কিছুর

জন্য বেশি ছটফট করতে নেই। গৃহস্থদের উচিত বছরে একটা দিন বাড়িতে যা যা জিনিস আছে সব জিনিসের হিসাব করা, ঘটি-বাটি থেকে শুরু করে জামা-কাপড় যা আছে। এবার যে যে জিনিস তার মাথায় নেই যে এই জিনিসটা আমার আছে, ঐ জিনিসগুলোকে বিদায় করে দিতে হবে, তার মানে ঐ জিনিসগুলো তার দরকার নেই। কারুর যদি একশ খানা শাড়ি থাকে, সব শাড়ির কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে না, কবে কোথায় পেয়েছে বা কিনেছে, কিন্তু তার মধ্যে তিরিশ চল্লিশটা শাড়ির কথা মাথায় আছে, এবার বাকি সব কটা শাড়িকে বিদায় করে দিতে হবে। শুধু শাড়ি নয়, যা যা জিনিসের কথা মাথায় নেই সেই সেই জিনিসগুলোকে বিদায় করে দিক। অনেকে বলবে, ভবিষ্যতে এগুলো লাগবে। কিছুই লাগবে না, ভবিষ্যতে যখন লাগবে তখন তুমি ঠিক আবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে বা কিনবে। এই নিয়ে একটা বিদেশী কাহিনীও আছে, একজন মহিলা এই ভাবে চেকিং করে মাঝে মাঝে সব কিছু বিদায় করে দিত। একদিন তার স্বামী এসে বলছে, আমি শুনলাম তুমি নাকি বাড়ির অনেক জিনিস বিদায় করে দিয়েছ। মহিলা বলছে, তুমি বল তুমি কি কি জিনিস হারিয়েছ, তাহলে আমি বুঝব আমি এই রকম করেছি কিনা। ভদ্রলোকের একটা স্বভাবই ছিল যেখানে যা কিছু মেশিন পায় কিনে আনে, কিছু দিন উপরে রেখে দেয় তারপর বেসমেন্টে রেখে দেয়, জিনিস জমছে তো জমছেই। পাঁচ-ছয় বছর ধরে পড়ে আছে অথচ ভদ্রলোক ভুলেই গেছে কবে কি মেশিন কিনে নিয়ে এসেছিল। মহিলা তাই বলছে, আগে তুমি বল তুমি কি কি জিনিস হারিয়েছ তবে আমি বলব আমি কি করেছি। বেচারী আর কিছু বলতে পারছে না, কারণ যা যা ওর মনে আছে সবটাই আছে। সবাই একগাদা ফালতু জিনিস জমিয়ে রেখে আবর্জনা তৈরী করে রাখে, এভাবেই গৃহস্থদের পরিষ্কার করতে হয়। তবে এখানে কর্মেন্দ্রিয়ের যে চেষ্টা করা হয়, সন্ন্যাসীদের সেটা নিষেধ করছেন, সন্ন্যাসী কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। এই শিক্ষা অজগর থেকে পেয়েছেন।

১০) সমুদ্র

দত্তাত্রেয়র দশম গুরু সমুদ্র। *মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ। অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ।।১১।৮।৫*। সাধকের জীবন সমুদ্রের মত হবে। এগুলো সবই আখ্যায়িকা, কাহিনীর সব কিছু নিতে নেই কিন্তু এর যে মূল ভাব সেটাকে গ্রহণ করে গভীর ভাবে অনুধাবন করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা সাধকের কাজ। সাধক মানে, একটা পাখি ডিম থেকে বেরিয়ে প্রথমে মাটিতে হাটতে থাকে, ওটাতেই ওর মজা, তবে মা ওকে জোর করে ওড়াতে শেখায়, প্রথম যেদিন পাখির শাবক মাটিকে ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল, ওর জীবনটা সেই মুহূর্তে পালটে গেল, সাধক মানে সে এখন সবে মাটিতে হাটছে, কিন্তু যেদিন মাটি ছেড়ে দেবে, তার ব্যপ্তিটাই পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। *মুনিঃ প্রসন্ন*, সাধক সব সময় আনন্দে থাকবে। যা কিছু জীবনে হারিয়েছে তার থেকে বেশি সাধকের কাছে আছে, তার কিসের দুঃখ! সব সময় আনন্দে থাকবে। দত্তাত্রেয় এখানে মুনিদের কথা বলছেন। স্বামীজী বলছেন যাদের মুখ সব সময় গোমড়া হয়ে থাকে তারা কখনই আধ্যাত্মিক হতে পারেনা। যদি তোমার গোমড়া মুখ থাকে তাহলে তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাক, বাইরে তোমার মুখ দেখিও না। আমাদের শাস্ত্রের এটি একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সব সময় চোখের জল ফেলাটা খ্রীশ্চানদের মধ্যে আছে। হিন্দুদের মধ্যেও অনেককে বলতে শোনা যায় ব্যাকুলতা চাই, তার জন্য চোখের জল ফেলতে হবে। কিন্তু সেই ব্যাকুলতা আলাদা। আধ্যাত্মিক পুরুষ বিশেষ করে যিনি জ্ঞানী, তিনি সব সময় প্রসন্ন থাকবেন। তাই বলে তার আচারণে কোন ছ্যাবলামো থাকবে না। চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, ঈশ্বরের যিনি ভক্ত তিনি কখনই গ্রাম্য কথা করবেন না, পরনিন্দা, পরচর্চা কিছুই করবেন না। একদিকে প্রসন্ন অন্য দিকে গম্ভীর, ভেতরটা গভীর কোন তল পাওয়া যাবে না। খুব কঠিন, কিন্তু এটাই পথ, *দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি*, ঋষিরা বলে গেছেন আধ্যাত্মিক পথ অত্যন্ত দুর্গম। হিমালয়ে কেদারবদ্রী যাচ্ছে,

অর্দ্ধেক পথ পেরিয়ে আসার পর আর কোন পথ থাকে না, এবার তাকে যেতেই হবে, এছাড়া আর কোন পথ নেই। মানবজীবন একবার যখন পাওয়া গেছে, তার মানে অর্দ্ধেক রাস্থা পেরিয়ে এসেছে, এবার আর তার কোন পথ নেই। যদি বলে আমি আর এই দুঃখ নিতে পারছি না, আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়েই থাকব, একটা স্ত্রী মরে গেলে আরেকটা স্ত্রী নিয়ে আসব, তার মানে হিমালয়ের পাহাড়ি রাস্থাতে সে বসে পড়েছে, বলছে আমি আর এগোব না। সে কিন্তু বাঁচবে না, যেখানে ছিল ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আধ্যাত্মিক জীবনে কোন কিছু হারিয়ে যাবে না, যতটুকু এগিয়েছে ততটুকুতেই দাঁড়িয়ে থাকবে, পিছিয়েও আসবে না, এগিয়েও যাবে না। সেইজন্য এগিয়ে চল, গম্ভীর হবে, ছ্যাবলামো চলবে না।

বেলুড় মঠের একাদশ প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ। তিনি যখন ব্রহ্মচারী ছিলেন তখনও তাঁর নাম ছিল সৌম্য চৈতন্য। গম্ভীর মহারাজ সব সময় চিন্তার জগতে বিচরণ করতেন আর লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অনেক দিন তিনি মঠের জেনারেল সেক্রেটারিও ছিলেন। একবার একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল। ফটো নেওয়ার সময় একজন মহারাজ তাঁকে বললেন 'মহারাজ একটু হাসুন'। উনিও সেই রকম মজা করে গম্ভীর ভাবে বললেন 'আমার নাম গম্ভীরানন্দ'। বলেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওনাকে হাসতে দেখা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল, একেবার গম্ভীর। হাসতেন না তা নয়, কখন সখন মজা করতেন। খুব কম। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল হাসি, হাহা হিহি করা বিশেষ করে ভক্তদের সাথে, কোন প্রশ্নই নেই। একবারে গম্ভীর আত্মা। আধ্যাত্মিক পথে যাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের এই গম্ভীর আত্মা হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লক্ষণ, যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে খুব সহজ সরল হবে। তার সাথে তাঁর ভাব হবে *দুর্বিগ্রাহ্যো*, অন্তরে ঈশ্বরীয় ভাব এতই গভীর যে তাঁর কোন তল পাওয়া যাবে, তাঁকে কখনই কেউ মাপতে পারবে না। আধ্যাত্মিক সাধনা না করা থাকলে বাইরেরটা গম্ভীর হবে না আর ভেতরের ভাবও গভীর হবে না। গম্ভীর, মানে বাইরেরটা একেবারে শান্ত, কোন রকম ছ্যাবলামো নেই আর গভীর মানে তাঁর ভেতরে ভাবের কোন তল পাওয়া যাবে না।

দুরত্যয়ঃ, তাঁর ভাব, জ্ঞান, ভালোবাসা সব অপার অসীম। একটা সাধারণ মানুষের জীবনের যদি ইতিহাস লিখতে বলা হয় তাহলে দু-চারটে বাক্যে সেই ইতিহাস লিখে দেওয়া যায়। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, একটা জিনিস যখন সবারই মধ্যে ছড়িয়ে যায় তখন তার গভীরতা হারিয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাব, এনাদের ভাবের যেমন গভীরতা তেমন বিস্তার। এনাদের জীবনী যদি লিখতে বসা হয় তখন এনাদের ব্যক্তিত্বের কত দিক এসে হাজির হয়ে যাবে, লিখে শেষ করা যাবে না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকরা একটা বিষয়কে নিয়ে অনেক গভীরে চলে গেছেন, কিন্তু ওই একটা বিষয় ছাড়া আর কিছু জানেন না। আগেকার ডাক্তাররা সব ধরণেরর রোগের চিকিৎসা করতে জানতেন, কিন্তু এখন যে ডাক্তার কানের রোগের ব্যাপারে জানে সে কানের পাশে যে চোখ আছে তার রোগের কথা জানে না। আর কিছু দিন পরে এও দেখা যাবে সে ডান কানের খবরই জানে বাম কানের ব্যাপারে জানে না। গভীরে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার পাশে কি হচ্ছে তা জানে না, তার মানে গভীর ভাবে তার আর বিস্তার হয় না। স্বামীজী ঠাকুরের নামে বলছেন, তাঁর ভাব অত্যন্ত গভীর কিন্তু সাংঘাতিক বিস্তার। যে কোন সাধক এই রকমই হবেন, গভীর আর তার সাথে বিস্তার। স্বামী গম্ভীরানন্দ মায়ের জীবনী খুব সুন্দর একটা আঙ্গিকে রচনা করেছেন। মায়ের ব্যক্তিত্বের এক একটা দিক নিয়ে এক একটি অধ্যায়কে সাজিয়েছেন। 'সঙ্ঘমাতা' নিয়ে একটা অধ্যায়, 'মাতৃভাব' নিয়ে আরেকটি অধ্যায়। মায়ের এক একটি ভাব নিয়ে লিখে গেছেন, আর কোন ভাবের সঙ্গে মিল নেই। অবতার বা বড় মহাত্মাদের ব্যক্তিত্বকে কখনই মাপা যায় না। পার্থিব শরীর চলে যাওয়ার পর একশ দেড়শ বছর পর তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানান ধরণের প্রবন্ধ লেখা চলতেই থাকে। কিছু দিন আগে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে

'শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ভাষা চিন্তন'। ঠাকুরের কথা বলার ভঙ্গিমাতেই নতুন একটা ভাষার জন্ম নিয়েছে। এই রকম কত দিক নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে যে আমরা এইটুকুর মধ্যে বেঁধে দেব, সেটা কোন ভাবেই হবে না। ভাগ্যিস তখন ভিডিওগ্রাফি ছিল না, তা নাহলে 'শ্রীরামকৃষ্ণের আঙ্গিকে নৃত্যের ঘরানা' নামে নাচের একটা আলাদা ঘরানাই সৃষ্টি হয়ে যেত, যেমন কথকলি, ওড়িশি নৃত্য আছে। সেই রকম ঠাকুরে গানের ব্যক্তিত্ব আরেকটা দিক, শ্রীরামকৃষ্ণের গানের শৈলী নিয়েও বিচিত্র বিচিত্র রচনা লেখা যায়। ঠাকুরের ভালোবাসা এটা আরেকটা ব্যক্তিত্ব। ঠাকুরকে একজন ব্রাহ্মভক্ত বলছেন মশাই আপনি জানেন না কি করে দল গড়তে হয়। কিন্তু আজ দেখুন ব্রাহ্ম সমাজ কোথায় হারিয়ে গেল আর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দিনে দিনে প্রসারিত হয়ে চলেছে। ঠাকুরই আবার ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনকে বলছেন, তুমি লোক দেখে শিষ্য কর না বলে তোমার দল ভেঙে যায়। ঠাকুরও জানতেন কীভাবে দল গড়তে হয়। *দুরত্যয়ঃ*, আমি তাঁকে কোন ভাবেই মেপে নিতে পারব না। যিনি মহাত্মা তাঁকে একটা দুটো কথা দিয়ে বাঁধতে পারব না। চৈতন্য সত্তা যখন নিজে থেকে তাঁর মধ্যে খেলা করতে শুরু করবেন তখন তিনি যেদিকেই মন দেবেন সেটাতেই তিনি প্রভুত্ব অর্জন করবেন।

অনন্তপারো, সমুদ্রের কোন কুল কিনারা পাওয়া যায় না। সাধকেরও কোন পার পাওয়া যাবে না। কোন কিছুতেই সমুদ্রে ক্ষোভণ হয় না। চারিদিক থেকে নদী, খাল, নর্দমার জল সমুদ্রে এসে পড়ছে কিন্তু তার জন্য সমুদ্রে কোন রকম ক্ষোভণ হয় না। সমুদ্রকে দেখে কেউ টের পায় না যে চারিদিক থেকে জলরাশি অনবরত এসে পড়ছে। গীতাতে যে কথা ভগবান বলছেন *তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে*, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। রাগ, দ্বেষের বৃত্তি সাধকের হৃদয়কে ক্ষোভিত করতে পারবে না। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন – আমাকে তোমার কি মনে হয়? আপনি মহাপুরুষ। কেন মহাপুরুষ মনে হচ্ছে? আপনার তো রাগ নেই। ঠাকুর হেসে বলছেন – কেন, সেদিন ঘোড়াওয়ালা আসবে বলে আসেনি তখন তার উপর রাগ করেছিলাম। ভক্ত তখন বলছেন – সেট তো লোকশিক্ষার জন্য।

ক্ষোভণ মানে? আমি আর আমার রাগ এক হয়ে গেল। কিন্তু আমি আর আমার রাগের বৃত্তি দুটো আলাদা। শুধু রাগের বৃত্তিই নয়, যে কোন বৃত্তি, কোন চিন্তা করছি, চিন্তাটা আলাদা আমি আলাদা, লোভ মানে লোভের বৃত্তি আলাদা আমি আলাদা, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, এই ইচ্ছা বৃত্তিটা আলাদা আমি আলাদা। আমরা আমি আর আমার বৃত্তি এই দুটোকে আলাদা করতে পারিনা। রেগে টং হয়ে একেবারে দাবানল হয়ে গেছে। কে দাবানল হয়েছে? যে রেগে গেছে। মানুষ কি কখন দাবানল হতে পারে? কারণ তখন তার মনে শুধু ক্রোধ বৃত্তিই আছে অন্য কিছুই নেই। ভগবানেরও এই অবস্থা হয়। ঠাকুরই বর্ণনা করছেন, নৃসিংহ অবতার যখন হিরণ্যকশ্যপুকে জানুতে বসিয়ে হিরণ্যকশ্যপুর বুকটা চিড়ে দিচ্ছেন তখন ভগবান এত রেগে গেছেন যে ভগবানের সামনে দেবতারা, এমনকি লক্ষ্মীদেবীও দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। তাঁকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। প্রহ্লাদ এসে স্তুতি করাতে তারপর তিনি আস্তে আস্তে শান্ত হলেন। ভগবান তখন তমোগুণকে আশ্রয় করে বধ করেছিলেন বলে এই রাগ বৃত্তিটাকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পর বিভীষণকে বলছেন 'যত দিন মানুষ বেঁচে থাকে তত দিনই শত্রুতা, মরে যাওয়ার পর আর কিসের শত্রুতা! রাবণ একজন বীর ছিলেন যাও সসম্মানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন কর'। শ্রীরামচন্দ্রের কোন ক্ষোভণ হয়নি, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংসারে থাকতে গেলে কিছু পেয়ে গেলে যেমন উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই তেমনি কিছু চলে গেলেও হতাশ হতে নেই।

আমাদের মনে যে চাঞ্চল্য হয়, আসলে বস্তুই ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করে দেয়। হিন্দু ধর্ম মতে, পাঁচটি তন্মাত্রা সংমিশ্রণে বস্তু তৈরী হয়, তেমনি এই পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়েই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৈরী। ইন্দ্রিয় আর

বস্তু সুযোগ পেলেই এক অপরের সাথে মিলিত হতে চায়। শুধু মিলতেই চায় না, কিছু ব্যাপারে মিলতে চায় আবার কিছু ব্যাপারে সরে আসতে চায়। সৌন্দর্য যে তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত চোখও সেই তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত, সুন্দর ধ্বণি যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরা আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ও সেই তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত। সেইজন্য কুৎসিৎ, কুরূপ থেকে চোখ সরে আসতে চায়, কর্কশ ধ্বণি থেকে কান সরে আসতে চায়। যদি সুন্দর দৃশ্য হয় তখন মানুষ সেই দৃশ্যের দিকে এগোতে চায়। ক্ষোভণ তখনই হয় যখন ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বস্তুর সংযোগ হয়। হঠাৎ যদি বলা হয়, একটা বিষধর সাপ, সবাই চমকে উঠবে, কারণ সবারই মৃত্যুভয় আছে। আমি বিষধর সাপ দেখলাম, আমার চোখে তার ছবিটা গেল, মস্তিষ্কে সেই সংবাদ গেল, জ্ঞানকে বিচারের প্রক্রিয়া করল, এরপর ভেতরের যিনি চৈতন্য তিনি এবার তার প্রতিক্রিয়াটা ছাড়লেন। আমাদের জীবন মানেই প্রতিক্রিয়া ছাড়া, সব কিছুতে আমরা প্রতিক্রিয়া করছি, ক্রিয়া কিছুই করছি না। আমার খিদে পেয়েছে, পেট থেকে সূচনা আসছে, আমি তখন প্রতিক্রিয়া করছি, মানে আমি খাচ্ছি। গরমে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভেতর থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে, আমি প্রতিক্রিয়া করছি। কেউ আমাকে একটা কথা বলল, আমি প্রতিক্রিয়া করছি। রাস্থায় যেতে যেতে একজন পরিচিতের সাথে দেখা হল, মস্তিষ্কে সিগন্যাল গেল, আমি তার সাথে কথা বলতে চাইছি। অপছন্দের লোক, মুখে কিছু বলা যাবে না, মনে মনে দুটো গালাগাল দিয়ে দিলাম। সবটাতেই আমরা প্রতিক্রিয়া করি। ক্রিয়া আমরা কখনই করি না, ক্রিয়া করি যখন আধ্যাত্মিক চিন্তন হয় বা সৃজনশীল পুরুষরা যখন কোন সৃজন করেন।

এখানে সমুদ্রের উপমা নিয়ে বলছেন, ইন্দ্রিয়ের বস্তু গুলো চুম্বকের মত এসে তোমাকে ধাক্কা মারবে, ধাক্কা মারলে তোমার ইন্দ্রিয়গুলো প্রতিক্রিয়া করবেই। ইন্দ্রিয় গুলো স্বভাবতই চঞ্চল, সব সময় নিজের বস্তুর সাথে মিশতে চায়, বাচ্চা দেখলেই যেমন আমাদের আদর করতে ইচ্ছে করে। যতক্ষণের মধ্যে ইচ্ছা হবে ততক্ষণে হাতটা এগিয়ে যাবে, এটাই স্পর্শসুখ। কিন্তু হাত তো নিজে থেকে যায় না, ওকে দেখল চোখ, চোখ নিয়ে ফেলে দিল ব্রেনে, ব্রেন ওখান থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে, এটা স্পর্শ সুখ, হাত তুমি এগিয়ে এসো। কত লম্বা প্রক্রিয়া অথচ আমরা বুঝতেও পারছি না। যাঁরা সাধক, যাঁরা যোগী তাঁরা ঐ প্রতিক্রিয়া করার যে শক্তি, ঐ শক্তিটা পুরো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। গ্রামের এক জমিদার একটা নতুন দুর্দান্ত ঘোড়ায় বসেছে আর ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে একজন কাজ করছিল সে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, বাবু এত দৌড়ে কোথায় চললেন? জমিদার বলছে, আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস কর। ঘোড়া তার নিজের মত দৌড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাই, আমরা জীবনে কিছুই করছি না, ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের দিয়ে যা করায় আমরা সেটাই করছি। ইন্দ্রিয়গুলো হল সেই দুরন্ত ঘোড়া, একটা দুটো ঘোড়া নয়, পাঁচটি দুর্দান্ত ঘোড়া আমাদের দৌড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের আটকানো মানে, ওরা যে প্রতিক্রিয়া করছে, ওটাকে টেনে নেওয়া। প্রতিক্রিয়াকে আটকানোর শক্তি তখনই আসে যখন ক্রিয়া করার শক্তি হয়। এই শক্তি একমাত্র জপধ্যান, তপস্যাতেই হয়, জপধ্যান, তপস্যা ছাড়া এই শক্তি হবে না। দত্তাত্রেয় এটাই বলছেন, *অক্ষোভঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ*, সমুদ্রে কত কিছু হচ্ছে, তাতেও সমুদ্র জোয়ার-ভাটা, তরঙ্গরহিত শান্ত, এই গুণগুলো আমি সমুদ্রের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি। আমাদের মন শান্ত, তরঙ্গরহিত হয়েছে কিনা তার একটাই পরীক্ষা, যদি কোন অশান্ত লোক এসে তাঁর পাশে এসে বসে তারও মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। আর আমার সামনের লোকটি শান্ত, পবিত্র কিনা বোঝা যাবে, তাঁকে দেখে আমার মনে পবিত্রতার ভাব জাগছে কিনা, মন শান্ত হচ্ছে কিনা। যদি কোন বড় লেখক বা বড় কোন ক্রিকেট প্লেয়ারের কাছে থাকা যায় তখন এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও মনে আসবে, ইস আমিও যদি ওর মত বড় প্লেয়ার হতে পারতাম।

আবার বলছেন, *সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ। নোৎসর্পতে ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ।।১১/৮/৬।। নারায়ণপরো মুনি* মানে ভগবৎপরায়ণ মুনি, যিনি ঈশ্বরে পুরোপুরি নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন একটা আদর্শকে নিয়ে নিয়েছেন, তা সে যে আদর্শই হোক, বিদ্যার আদর্শই হোক আর সেবার আদর্শই হোক, ঐ একটা আদর্শে তাঁর ভেতরটা একটা শক্তিতে এমন ভরে যাবে যে তাঁকে যদি কোন জাগতিক পদার্থ দিয়ে দেওয়া হয় তাঁতে তিনি এক বিন্দুও উল্লসিত হবেন না, আর তাঁর থেকে যদি কিছু নিয়েও নেওয়া হয় তাঁতেও তিনি বিন্দু মাত্র বিষন্ন হবেন না। *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং* সমুদ্র একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, ঐ পরিপূর্ণ সমুদ্রে যত জলই প্রবেশ করুক তাতে সমুদ্রে কোন ক্ষোভণ হবে না, আর সমুদ্র থেকে যদি কেউ এক বালতি জল নিয়ে নেয় তাতেও সমুদ্রের কোন কিছুই হবে না। বোঝাই যাচ্ছে, যাঁরা খুবই উচ্চমানের সাধক তাঁদের কথাই বলছেন। কিন্তু আমাদের মত সাধারণদেরও এই জিনিসটাকে দৈনন্দিন জীবনে একটু অনুশীলন করতে হয়, অন্তত সব কিছুর ব্যাপারে একটা লাইন টেনে দিতে হয়, এতটুকু ভোগ করা যেতে পারে, এতটুকু যদি চলেও যায় আমার কোন দুঃখ হবে না, একটা লাইন টেনে দিয়ে ঠিক করে নিতে হয় এই লাইনের বাইরে আমি যাবো না। ঠাকুর যেমন গৃহস্থদের বলছেন স্বদারা গমনে দোষ নেই কিন্তু সন্ন্যাসীদের বলছেন, সন্ন্যাসী স্ত্রীর চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। তার মানে গৃহস্থদের লাইনটাকে পরিষ্কার করে টেনে দেওয়া হল, এর বাইরে আর না। এই ধরণে উচ্চতম আদর্শের কথা শুনে শুনে নিজের রেখাটা টেনে দিতে হয়, আমি এর বাইরে আর যাবো না। এই ভাবগুলো জীবনে অবলম্বন করলে তখনই একটা শান্তি আসে।

১১) পতঙ্গ

দত্তাত্রেয়র একাদশ গুরু পতঙ্গ। পতঙ্গের চোখের লেন্স এমন ভাবে করা থাকে যার ফলে এরা আলোর দিকে আকর্ষিত হয়। শরীরে আগুনের তাপ লাগলে পতঙ্গও সরে যেতে চায় কিন্তু চোখের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ লেগে থাকে যে সবাই আগুনের মধ্যে গিয়েই পড়ে। বড় আগুন লাগিয়ে দিলে সব পোকা ঐ আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দেবে। পতঙ্গ থেকে দত্তাত্রেয় কি শিক্ষা পেলেন? *দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রলোভতঃ পতত্যান্ধে তমোস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ।।*১১/৮/৭। স্ত্রী হল দেবমায়া, দেবতাদের মায়া। দেবতাদের মায়া এই জন্যই বলছেন, দেবতারা প্রায়ই ঋষি মুনিদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য মেয়েদের কাজে লাগান। এই প্রথা প্রথম থেকেই চলে আসছে, সৃষ্টিতে কোন প্রলোভন যদি তৈরী করতে হয় সব সময় মেয়েদেরকেই ব্যবহার করা হয়। ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর অধীনে বিদেশে একটা গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে। কাউকে ট্র্যাপে ফেলার জন্য এরা সব সময় মেয়েদেরকেই কাজে লাগায়, এর নামই হল, হানি ট্র্যাপ। চাণক্য বিষকন্যা নামে একটা নতুন পদ্ধতি বার করলেন, কোন রাজাকে যদি মারতে হয়, বিষকন্যা তৈরী করে রাজার কাছে উপহার রূপে পাঠিয়ে দেওয়া হত। যে মেয়েকে বিষকন্যা তৈরী করা হবে তার রূপ এমন হত যে রাজা আকৃষ্ট হয়ে ওই মেয়েকে যদি চুম্বনও করে সেখানেই রাজা মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, এত তার শরীরকে বিষাক্ত করে দেওয়া হত। সত্যিই বিষকন্যা হত কিনা আমাদের জানা নেই, অন্য কোথাও এর উল্লেখ আমরা পাই না। তবে দেবতা থেকে শুরু করে ক্ষমতাবান লোকেদের কাছে আজ পর্যন্ত মেয়েদের দিয়ে কাউকে ফাঁসানোটা একটা খুব প্রচলিত পদ্ধতি। বলা হয় যে, কোন মেয়ে যদি ঠিক করে নেয় আমি কোন পুরুষকে ফাঁসাবো, সেই পুরুষকে ভগবানও আর বাঁচতে পারবেন না। একজন নামকরা মহিলা কিছু দিন আগে খুব গর্ব করে বলছিল, কোন পুরুষ জন্মায়নি আমরা মেয়েরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করব আর সে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, বিশেষ করে যারা কামী পুরুষ, নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর যাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন নারীরূপ দর্শন করে নিলে, নারীর চোখের চাহনি, হাত নাড়া, মিষ্টি কথা শুনে নিলেই এদের মন

চঞ্চল হয়ে ওঠে, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। পতঙ্গ যেমন আলোর প্রতি আকর্ষিত হয়ে আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষও ঠিক ঐভাবে নারীর রূপে আকর্ষিত হয়ে ঐ রূপের আগুনে দগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যায়। কোন পুরুষ যদি কোন মেয়ের চোখের জল মুছতে নেমে যায় বুঝে নিতে হবে সে এবার মরল। চামচ দিয়ে সমুদ্রের জল ছেঁচে ফাঁকা করে দেওয়া যাবে কিন্তু কোন মেয়ের অশ্রুজল বিমোচনে যদি নেমেছে, সে জীবনে আর ঐ জল শেষ করতে পারবে না। যে মেয়েই হোক, বিধবার চোখের জলই হোক, ডিভোর্সির চোখের জলই হোক, একবার ঐ চোখের জল মুছতে যদি কেউ নেমেছে ঐ পতঙ্গের মত অবস্থা হতে আর বেশি দেরী হবে না। কারণ পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শক্তি অনেক বেশি, মেয়েদের শক্তি অন্য দিকে থাকে। আর ইমোশানালি মেয়েরা একেবারে জিরো। জিতেন্দ্রিয় মানে, যার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আছে। সব কটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আছে কিন্তু তার মধ্যে যদি কোন একটা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলেও সে কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়। দত্তাত্রেয় মূল কথা বলছেন শুধু নারীকে নিয়ে।

এখানে শুধু মেয়ে বলছেন না, বলছেন রূপ। সংস্কৃতে শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় শোভন অধ্যাস। শোভন মানে সুন্দর, সুন্দরের প্রতি একটা আসক্তি। নারীর রূপের আকর্ষণের ব্যাপারে অজিতেন্দ্রিয়দের পরিণতি সম্বন্ধে যে শুধু ভাগবতই বলছেন তা নয়; বিশ্বের অনেক সাহিত্যে, প্রবন্ধেই বর্ণনা করা হয়েছে। আলডাস্ হাক্সলে খুব বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন, ওনার একটা বই আছে 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'। বইয়ের একটা ছোট্ট অংশে একটা চরিত্রকে নিয়ে লিখছেন, রাত্রিবেলা গাড়ি করে যাচ্ছে। গাড়ির হেডলাইটে দেখছে একটা মেয়ে শেয়াল এক পাশ থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার পেছনে একটা পুরুষ শেয়াল দৌড়াচ্ছে। মেয়ে শেয়ালটা পার হয়ে গেছে কিন্তু পুরুষ শেয়ালটা গাড়ির চাকার তলায় পিষে গেছে। যিনি মূল চরিত্র তিনি বলছেন মেয়েদের পেছনে দৌড়ালে এই পরিণতি। নারীকে নিয়ে এই সমস্যা চিরন্তন। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নিয়ে বলা হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার আসক্তিতে থেকে যে বিপদ আসে সেই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কপোত-কপোতীর থেকে। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসবে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে এটা নতুন কিছু না আর অস্বাভাবিক তো নয়ই। তাই বলছেন বাপু এই মোহের মধ্যে তুমি পড়বেই, সেইজন্য আগে থেকেই তুমি মোহের মধ্যে পড়তে যেও না। এই শিক্ষাটা পেয়েছিলেন পায়রার কাছ থেকে। কিন্তু পতঙ্গের কথা বলা হচ্ছে অজিতেন্দ্রিয়কে নিয়ে। অজিতেন্দ্রিয় যে কোন লোক সে রাজাই হোক মরবে, বিয়েথা করেছে কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় সেও মরবে, সন্ন্যাসী অজিতেন্দ্রিয় সেও মরবে। অজিতেন্দ্রিয় যেই হবে সেইই পতঙ্গের মত মরবে।

আট নম্বর শ্লোকে বলছেন, মানুষের যা কিছু আছে, ধন, সম্পদ, বিদ্যা, মান, যশ ওর মধ্যে একটা মেয়েকে নিয়ে আসা হোক, তার সব কিছু, অর্থের নাশ হয়ে যাবে, মান যশ চলে যাবে, শরীরের তেজ চলে যাবে। তীর্থে গিয়ে মানুষ নিজের স্ত্রীকে সামলায়, বাচ্চাকে সামলায়, তীর্থে গিয়ে ধর্ম করা আর হয় না। একটা ভালো কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হলে পূরণ করতে পারে না, ভাবে স্ত্রীকে দেব, সন্তানকে খাওয়াবো। সব জায়গার জল যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, ঠিক তেমন একজন পুরুষের যাবতীয় ধর্ম, অর্থ যা কিছু অর্জন করে সব ঐ একটি ঘোগের গর্তে গিয়ে ঢুকে যায়।

১২) ভ্রমর

অবধূতের দ্বাদশ গুরু ভ্রমর, বলছেন *স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা। গৃহানহিংসান্নতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ।।১১।৮।৯।।* মাধুকর হল মধুকর, মধুকরের দুটি অর্থ হয়, একটা হয় ভ্রমর আরেকটা অর্থ মৌমাছি। মধুকর মানে যে মধু পান করে, মধু দুজন পান করে, একটা ভ্রমর আর

অপরটি মৌমাছি। মধুর চাক মৌমাছিরও হয় আর ভ্রমরেরও হয়। এখানেও সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যেই বলছেন, কোন গৃহস্থকে সন্ন্যাসী পীড়া দেবে না। ভ্রমর বিভিন্ন ফুল থেকে মধু পান করে। একটা ফুল থেকেই সে মধু নেয় না। সন্ন্যাসীরও উচিত অনেক গৃহস্থ বাড়ি থেকে ভিক্ষা করা। একটা বাড়ি থেকে ভিক্ষা নিলে সেই গৃহস্থের পক্ষে সেটা বোঝা হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী ভ্রমরবৎ জীবন ধারণ করে কোন গৃহস্থকে উত্যক্ত করবে না। বলা হয় যে, ভারতের দুটো সম্প্রদায় কখনই অভাবগ্রস্ত হবে না। প্রথম হল সন্ন্যাসী আর দ্বিতীয় হল সৈন্য, সন্ন্যাসী আর সৈন্য কোন দিন অভাবগ্রস্ত হবে না। সৈন্যদের সরকার খাওয়ায় আর সন্ন্যাসীদের সমাজ খাওয়ায়। তাই সন্ন্যাসী কোন দিন মরবে না, সমাজ তাকে খাওয়াবে, সৈন্যও কখন না খেয়ে মরবে না কারণ সরকার তাকে খাওয়াবে। যদি সন্ন্যাসী কোন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে বলে আপনার বাড়িতে আমি ছয় মাস থাকব। গৃহস্থ কি করবে? সন্ন্যাসীকে যদি ভালোবাসে তাঁকে রাখবে। কিন্তু এখানে এটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অভাবগ্রস্ত, তার বাড়িতে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে সমস্যা হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন *স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং*, বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটু একটু করে নেবে। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, সন্ন্যাসী যে কোন বাড়িতে গিয়ে বলবেন, আপনারা যে রান্নাবান্না করেছেন তার থেকে এক গ্রাস ভিক্ষা দিন, এইভাবে তিনি সাত বাড়ি থেকে ভিক্ষা নেবেন। কোন কারণে যদি সাত বাড়িতে গিয়েও খাবার না জোটে তাহলে ঐ দিন সন্ন্যাসী অভুক্তই থেকে যাবেন। সাত বাড়ি কেন বলছেন? এইজন্যই বলছেন, তোমার সময় কত নষ্ট করবে, তোমার সময় লাগাতে হবে জপধ্যানে, আত্মচিন্তনে। সেইজন্য একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হল। এটাও বলছেন না যে পেট ভরার মত, বলে দিচ্ছেন সাত বাড়ি। যদি কোন বাড়ি থেকেই ভিক্ষা না পাওয়া যায় তাহলে বুঝে নেবে ঈশ্বরের ইচ্ছা নেই। চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকতেন, সারা দিন উনি জপধ্যান করতেন আর একটু সময়ের জন্য ভিক্ষায় যেতেন। ভিক্ষা করে শুকনো রুটি নিয়ে আসতেন আর রুটিকে জলে ভিজিয়ে রাখতেন। সেখান থেকে নিজের ইষ্টকে নিবেদন করে নিজে গ্রহণ করতেন। একদিন তাঁর ইষ্ট গোবিন্দ স্বপ্নে বলছেন, রোজ রোজ এই শুকনো রুটি চলে না, সাথে যদি একটু লবণ দাও। উনি কি আর করবেন, আরও তিনটে বাড়ি থেকে লবণ জোগার করতে লাগলেন। এরপর রুটি আর লবণ চলতে লাগল। কিছু দিন পর আবার স্বপ্নে গোবিন্দ দেখা দিয়ে রূপ গোস্বামীকে বলছেন, শুকনো রুটি গলা দিয়ে যায় না, একটু যদি ঘি লাগিয়ে দিতে। স্বপ্নেই উনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এর বেশি আমার দ্বারা হবে না, যদি আপনার এত কিছুর দরকার হয় তাহলে আপনি একজন বড়লোক ভক্ত জোগার করুন। তখন ভগবান দক্ষিণ ভারতের কোন এক রাজাকে স্বপ্নে বললেন, শুকনো রুটি আর লবণ খেতে আমার বড় কষ্ট। এরপর বৃন্দাবনে রঙ্গনাথ মন্দির তৈরী হল, সারাটা দিন ওখানে শুধু ভোগ নিবেদন হয়েই যাচ্ছে। মাধুকরি বৃত্তির এটাই হল সঠিক আদর্শ, নিজের ইষ্টকেও খাওয়াবার জন্য অতিরিক্ত গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা করবে না।

এগুলো হল যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি, সে সেই রকম শিক্ষা নেবে। এক একজন এক এক মনোভাব নিয়ে দেখছে। দত্তাত্রেয় ভ্রমরের মধুপানকে এইভাবে দেখেছেন। অন্য কেউ বলতে পারে 'আমাদের বাংলা সাহিত্যে ভ্রমরকে চরিত্রহীনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে অনেক ফুল চুষে বেড়াচ্ছে'। সাহিত্যিক ঠিকই বলছেন, তুমি যখন ঐ দিক থেকে দেখে বলছে অনেক ফুল থেকে রস নিচ্ছে সে চরিত্রহীন। কিন্তু অবধূত দেখছেন, বিভিন্ন ফুল থেকে নিলে কি হয়, কোন একটা ফুল থেকে বেশী নিতে হয় না। কিন্তু অবধূত তার থেকেও অনেক বেশী বলছেন একটা ফুলেই যদি সে মধু খেয়ে মত্ত হয়ে পড়ে থেকে বাসা করে নেয়, ফুলের পাপড়ি যখন বন্ধ হয়ে যাবে ভ্রমর তার মধ্যেই শেষ হয়ে পড়ে থাকবে। অনেক ভ্রমর এই ভাবেই মরে। পদ্মফুলের মধ্যে বসে মধু পান করতে করতে এমন মত্ত হয়ে যায় সন্ধ্যে হতে হতে কখন পদ্মফুলের পাপড়ি বন্ধ হয়ে আসে তার কোন হুঁশই থাকে না। কৌপিন কি ওয়াস্তে কাহিনীতে ইঁদুরের থেকে সাধু কৌপিন বাঁচাবার জন্য বেড়াল পুষলেন,

বেড়ালের দুধ চাই, গরু কেনা হল, গরুর দেখাশোনার জন্য একটা মেয়েকে আনা হল। সাধু এখন পদ্মফুলে আবদ্ধ হয়ে গেল।

পরের শ্লোকে আরও মজার কথা বলছেন *অণুভ্যশ্চ মহদ্‌ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ।।১১/৮/১০।।* প্রথম শ্লোকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বললেন, সেখানে মধুকর বৃত্তিকে ভ্রমরের উপমা দিয়ে বললেন, ভ্রমর যেমন বিভিন্ন ফুল থেকে অল্প অল্প মধু সংগ্রহ করে, কারণ ফুলকেও বাঁচতে হবে, ঠিক সেই রকম সন্ন্যাসী গৃহস্থ থেকে বেশি ভিক্ষা চাইবে না। দ্বিতীয় বলছেন, ফুল থেকে কি নেয়? মধু। মধুর আরেকটা মানে সার। ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে বলা হয়, যেটা ঠাকুরেরই কথা – দুটো বৃত্তি, একটা মধুকর বৃত্তি আরেকটা মক্ষিকা বৃত্তি। মধুকর সার টুকু নেয়, আর মক্ষিকা মানে মাছি, মাছি সবই নেয়। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, মাছি কখন সন্দেশে বসছে, কখন পচা ঘায়ে বসছে। অন্যান্য জায়গায় বলবে, সবটাই তো নেওয়া উচিত। ঠিকই সবটাই নেওয়া উচিত, কিন্তু সমস্যা হল উপমা সব সময় একদেশীয়, উপমা আমাদের যতটুকু বলতে চাইছে তার বাইরে তুলনা করতে যেতে নেই। এখানে উপমা দেওয়া হচ্ছে সার, যার মধ্যে বলছেন গুণগ্রাহী। মধুকর বৃত্তির একটা বৈশিষ্ট্য হল গুণগ্রাহী, যেখানে যার মধ্যে যতটুকু গুণ দেখা যাবে তার ঐ গুণটুকুই নেবে, যেখানেই দোষ দেখবে ওটা নেবে না। দোষটাও যদি নিয়ে নাও তাহলে ওটাই মক্ষিকা বৃত্তি হয়ে যাবে। সংসারের দোষগুণ সবটাই যদি নেওয়া হয় তখন সেটাই মক্ষিকা বৃত্তি হয়ে যাবে। মাছি সন্দেশে বসে সন্দেশের গুণটুকু নিচ্ছে, বিষ্ঠায় গিয়ে যখন বসছে তখন আবর্জনা সংগ্রহ করে। কিন্তু আমাদের স্বভাব এমনই যে আমরা পারি না, গুণটাও নিই দোষটাও নিই। একজন মুমুর্ষ লোক, ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি, সেখানে গিয়ে কারুর নিন্দা করা শুরু করা হোক, সেও চাঙ্গা হয়ে উঠে বসবে। এটাই আমাদের স্বভাব, সংসার চালাতে গেলে দু-চারজন লোককে আমরা অপছন্দ করবই, যাকে অপছন্দ তার নিন্দা শুনলে ভেতরটা খুশিতে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

যারা জীবনে শান্তি চায়, শক্তি চায় তাদের কারুর নিন্দা বা দোষগ্রহণ করতে নেই। কেন শান্তি বিঘ্ন হয় আর শক্তি ক্ষয় হয়? কারণ আমি যখন অপরের দোষ দেখছি, সাধারণ ভাবে দেখা যায় আমার ভেতরে ঐ দোষটা আছে বলে তখন আমি বাইরে ঐ দোষটা দেখছি। Strength, Power and Space এই তিনটে জিনিসই এক, আমরা যেটাকে শক্তি বলি, আর নিজের যে স্পেস, আমরা প্রায়ই বলি, আমার স্বামী আমাকে স্পেস দেয় না, ফ্রিডম দেয় না, আসলে সব একই শব্দ। যে ইমোশান গুলিকে নেগেটিভ বলা হয়, কাম, ক্রোধ, লোভাদি এই ছয়টি, যখনই কারুকে দ্বেষ করা হয় তখনই তার নিন্দা করে, বাচ্চারা বন্ধুদেরও যে নিন্দা করে সেখানেও সামান্য একটা ঈর্ষার ভাব থাকে। পরিহাস আর উপহাস দুটো আলাদা জিনিস, বন্ধুদের সাথে, নিজের লোকের সঙ্গে আমরা পরিহাস করি কিন্তু যাদের আমরা পছন্দ করি না তাদের আমরা উপহাস করি। যার প্রতি দ্বেষ তাকেই উপহাস করে। উপহাস করা মানেই যাকে উপহাস করা হচ্ছে তার প্রতি দ্বেষ আছে। দ্বেষ আছে মানে, তার স্পেসে সে ঢুকে পড়েছে। ভালোবাসা দেওয়াল গুলোকে দূরে ঠেলে দেয়, নেগেটিভ ইমোশান গুলো দেওয়াল গুলিকে কাছে নিয়ে আসে। আমি একটা ঘরে একা বসে আছি, সেই সময় একজন এসে ঘরে ঢুকল যাকে আমি পছন্দ করি না, তখন কি আমার মনে হবে না যে আমার স্পেস যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে? তখন কি মনে হয় না লোকটা বেরিয়ে গেলে বাঁচি? তার মানে যত কাছে সে এগোতে থাকে তত আমার স্পেসকে সঙ্কুচিত করছে। স্পেস যত কমে আসে তত আমার শক্তিও কমে যেতে থাকবে, কারণ আমি ডানা বিস্তার করতে পারব না। যদি আমার বন্ধু একজনকে নিয়ে আমার বাড়িতে এল যাকে আমি পছন্দ করি না, আমি বন্ধুর সাথে সেই ভাবে হাসিঠাট্টা করতে পারব না। আমার শক্তি কমে গেল, আমার ফ্রিডম কমে গেল, স্পেস

কমে গেল। তাই যাকে আমি নিন্দা করছি, যে কোন ভাবেই করা হোক না কেন, তার প্রতি নিশ্চয় আমার দ্বেষ আছে, তার প্রসঙ্গ এলেই আমি কুঁচকে যাচ্ছি, তার মানে স্পেস আমার কমে যাচ্ছে। যে জিনিসটা আমার স্পেস কমিয়ে দিচ্ছে সেই জিনিসটা আমার জন্য কখনই ভালো নয়। সেইজন্য সার টুকু নিলে তার যে দুর্বলতা আছে, তার যে দোষত্রুটি গুলো আছে, সেগুলো আর আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তখন শক্তিটাও বাড়বে। যে কোন জিনিস, যদি মনে হয় এটা ভুল হচ্ছে, ন্যায় সঙ্গত যদি না হয়, ইমোশান দ্বারা যদি চালিত হয় তখন বুঝতে হবে তার শক্তিকে শুষে বার করে নিচ্ছে। একটা মেয়ে যদি এসে যায়, সেখানে মেয়ের সারটুকু নিয়ে নিলেই হয়। তার রূপ কখনই তার সার নয়, সার হল তার গুণ, তার বুদ্ধি, সার হবে তার স্নেহ, যে স্নেহ পেয়ে মানুষ বড় হয়। স্বামীজী বলছেন, বন্ধুত্ব এমন জিনিস, ভালোবাসা এমন জিনিস যেটা দিয়ে মানুষ ঈশ্বর পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু আজকে একটা মেয়ের সাথে দেখা হতেই ছেলেটি বলবে, she is so divine, আর কাল কিছু একটা হয়ে গেলে বলবে তোমার মরা মুখ দেখলে ভালো হয়। নিশ্চয় তোমার কোথাও ভুল হয়ে গেছে, তুমি মেয়েটির সার নাওনি।

যে কোন জিনিসের একটা internal aspect থাকে আরেকটা external aspect থাকে, যেমন এখানে শাস্ত্র আলোচনা শুনে আমার ভালো লাগছে, শাস্ত্রের সারকে আমি নিতে পারছি। এরপর এই আচার্যই শাস্ত্র পড়ান আর অন্য কোন আচার্যই পড়ান তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। যদি সার টুকু শুধু নেওয়া হয় তখন সে কখনই কোন কষ্ট পাবে না। যদি দেখা যায় কারুর স্পেস কমে যাচ্ছে, তার শক্তিও কমে যাচ্ছে, ফ্রিডম কমে যাওয়া মানে তার জীবনে এমন কোন লোক জড়িয়ে আছে যার থেকে সে তার সার নেয়নি, তার বাহ্যিকটাই নিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সার কি? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসা মানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে ভালোবাসা, ভাবটাই তাঁর সার। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব কি? ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। ঠাকুরও একজন স্থূল শরীরধারী, কিন্ত তাঁর ভাবকে ভালোবাসছি, তিনিও আমাকে উঁচুতে তুলে দিচ্ছেন। এই জিনিস যে কোন লোকের ক্ষেত্রেই হবে। সমস্যা হল বেশির ভাগ লোকের সার এতই কম যে, সে আমাকে আকাশে তুলতে পারে না। কিন্তু আকাশে যদি নাও তুলতে পারে, আমি কেন নিজেকে ওখানে আবদ্ধ করে নেব, আমি কেন ওখানে জড়িয়ে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে নেব। কখন সঙ্কীর্ণ হয়? যখন তার বাহ্যিক জিনিসটাকে ভালোবাসছি। আভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস হয় যেগুলো আমরা নিজেরা অর্জন করিনি। যেমন একটা কোন বিশেষ পরিবারের লোকেদের দেখতে সুন্দর, আবার তার বাবা-মার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থেকে সে একটা কালচার পেয়েছে, বুদ্ধি পেয়েছে। এরপর যে জিনিসগুলো আমাদের নয় সেই জিনিসগুলো নিয়েই আমরা অহঙ্কার করতে থাকি, যেমন আমাদের রূপ, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের কালচার। মেয়েদের যেমন রূপের অহঙ্কার থাকবেই। রূপটা কি সে নিজে অর্জন করেছে? তোমার তো নিজের নয়, ভগবানের ঘর থেকে এসেছে বা তোমার বাবা-মায়ের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থেকে এসেছে। ঠিক এই একই জিনিস হয় যখন আমরা কাউকে ভালোবাসি, তার সার আমরা নিই না। সার হবে অর্জন করা, যেটা অর্জন করা নয় সেটাই বাহ্যিক। যেমন তার রূপ, তার বুদ্ধি, এগুলো তার সার নয়, এগুলো তার পাওয়া, অর্জন করতে হয়নি। তার যদি প্রচুর টাকা-পয়সা থাকে, সে অর্জন করেই তৈরী করেছে, কিন্তু টাকা-পয়সাটা তার সার হতে পারে না। একটা পরিস্থিতিতে কেউ বুদ্ধি লাগিয়ে ব্যবসা বা এমন কোন কাজকর্ম করেছে, যার ফলে সেখান থেকে তার প্রচুর টাকা এসে গেছে। তার কাজ করার যে দক্ষতা, যে ক্ষমতা সেটা তার সার। ঐ সারটুকুকে ভালোবাসলে আর কখনই সমস্যা হবে না। এখানে এটাই বলছেন, *অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ*, ভ্রমর যেমন ফুলের ছোট বড় বিচার না করে সকল ফুলের সার আহরণ করে ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত ছোট বড় বিচার না করে প্রত্যেকটি শাস্ত্রের সার কথাকে গ্রহণ করা। এক নামকরা হিন্দী কবির খুব

সুন্দর একটা কথা আছে, বিদ্যা যদি উত্তম হয় তাহলে ঐ বিদ্যা যেখানেই থাকুক, যার কাছেই থাকুক, যে শাস্ত্রেই থাকুক, ঐ বিদ্যাকে নেবে। সোনা যদি নোংরাতে পড়ে থাকে নোংরা থেকেও লোকেরা সোনাকে তুলে নেয়, সেইজন্য সোনা কখন অশুদ্ধ, অপবিত্র হয় না। এখানে বলছেন প্রত্যেকটি শাস্ত্রের সার জানতে হবে, তার মানে, বায়োলজিরও সার জানতে হবে, ফিজিক্সেরও সার জানতে হবে আর নাট্যশাস্ত্র, তার সারও জানতে হবে।

মস্তিষ্কের বিস্তার সব সময়ই হয়ে থাকে অনাবৃতকরণের দ্বারা। যত শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ হবে, যত শাস্ত্রের কথা গ্রহণ করবে তত তার মস্তিষ্কের সম্প্রসারণ হবে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা যত বৃদ্ধি হবে ধারণা করার শক্তিও তত বাড়বে। যিনি নিজের শাস্ত্র ছাড়া আরও পাঁচটা শাস্ত্র জানেন তিনি নিজের শাস্ত্রটাও ভালো জানবেন। যাঁরা সরোদ, সেতারে ওস্তাদ, তাঁরা নিজের বাদ্যযন্ত্র তো ভালো বাজাবেনই তার সাথে অন্য বাদ্যযন্ত্রও বাজাতে জানেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ কবি কিন্তু তিনি উপন্যাসও লিখেছেন, নাটকও লিখেছেন আবার ছবিও এঁকেছেন। যাঁরা একটাতে পারদর্শি তাঁরা আরও পাঁচটা জিনিস করতে পারেন। এখানে এটাই বলতে চাইছেন, প্রত্যেকটি মানুষের সার গ্রহণ করবে, প্রত্যেকটি শাস্ত্রের, বিদ্যার সার গ্রহণ করবে। রাজকুমারদের আগেকার দিনে চৌষট্টি কলার সব কটি কলাই জানতে হত। *পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ*, মৌমাছি, ভ্রমর এরা যেমন সব ফুলের থেকে সারটুকু গ্রহণ করে, ঠিক সেই রকম তুমিও প্রত্যেকটি মানুষের থেকে, প্রত্যেক শাস্ত্রের সার গ্রহণ করবে।

তার সাথে বলছেন *সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতম্। পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী।।১১/৮/১১।।* সন্ন্যাসীদের পেটটাই একমাত্র সংগ্রহের পাত্র, এর বাইরে কোন বাসন বলে কিছু নেই। সন্ন্যাস জীবনের উপর একটা নামকরা কথা আছে, করতল ভিক্ষা করতল বাস, হাতে যতটুকু ভিক্ষা ধরবে ততটুকু খেয়ে নেবে, ওর বাইরে আর কিছু তার লাগবে না। গৃহস্থদেরও খাওয়া-দাওয়াতে সংযম দরকার, যতটুকুতে শরীর চলে যাবে তার বেশি কিছু আয়োজন করতে নেই। যদি সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ কিছু সংগ্রহ করেছে, যেমন মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে জমাতেই থাকে, তারপর একটা দিন একজন এসে পুরো মৌচাকটা কেটে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে চলে যায়, শুধু চাকই কাটে না, তার সাথে মৌমাছির প্রাণটাও চলে যায়। কিছু সংগ্রহ না করা, সঞ্চয় না করা কি গৃহস্থদের পক্ষে সম্ভব? কখনই সম্ভব নয়, ঠাকুরও বলছেন গৃহস্থ সঞ্চয় করবে। এখানে সন্ন্যাসীদের ধর্ম নিয়ে বলছেন। যদিও সন্ন্যাসীদের ধর্ম কিন্তু সংসারীকেও একটা জায়গায় লাইন টেনে দিতে হয়, শুধু যদি সঞ্চয়ই করতে থাকে তাহলে সে কিন্তু আর এগোতে পারবে না, একটা জায়গাতে তাকেও থামতে হবে। কারণ ঈশ্বরের দিকে যাত্রা শুরু হয় সংসারে থেকেই।

জগতে দুই ধরণের লোক দেখা যায়, প্রথম ধরণের লোকেদের মধ্যে দেবতা বৃত্তি থাকে। দেব শব্দ থেকে দেবতা এসেছে, দেব শব্দের অর্থ আলো, এই আলো আধ্যাত্মিক আলো। আধ্যাত্মিক আলো থাকা মানে, যিনি নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক আলোর আধারে এগিয়ে নিয়ে যান। এই ধরণের মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের বেশি প্রভাব দেখা যায় না। এগুলো তাদেরও থাকা, ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া সবারই মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভাদি থাকবে। দ্বিতীয় ধরণের লোক যাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে। আসুরিক বৃত্তিতে লোভ, ক্রোধাদির মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। অসুর শব্দ আসে 'অসু' থেকে, অসু মানে প্রাণ। শরীরে যে বিভিন্ন ক্রিয়া চলে, এই ক্রিয়ার পেছনে যে শক্তি কাজ করে সেই শক্তিকে বলে প্রাণ। মানুষ যখন পুরোপুরি প্রাণশক্তিকে আধার করে চলে তখন আধ্যাত্মিক ভাবটা দমে যায়। যারাই প্রাণশক্তিতে চলে, যাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে, তাদের স্বভাবই হল সঞ্চয় করা। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্*, এটাকে আমি জয় করেছি, এরপর এবার এটাকেও জয় করব, ধরো, মারো, লুট করো এগুলোই তাদের প্রবৃত্তি। জীবনে এরা সব সময় goal setting করে যাচ্ছে, জীবনের একটা লক্ষ্য চাই, একটা প্রাপ্তি চাই। অন্য দিকে

রয়েছে যাদের মধ্যে দেবতার ভাব। জগতে মাঝারি ধরণের লোকের সংখ্যাই বেশি, এই দলেরও নয় ঐ দলেরও নয়। দৈবী সম্পদের অধিকারী সম্পন্ন লোক জগতে কমই হয়। আর ঘোর আসুরিক সম্পদে সম্পন্ন লোকের সংখ্যাও জগতে কম হয়। বেশির ভাগই হল মাঝারি, এদের সমস্যা হল এরা দৈবী সম্পদ সম্পন্ন লোকেদের সাথে দৈবী হয়ে যায় আর আসুরিক মনোভাবাপন্নদের সাথে আসুরিক হয়ে যায়, এদেরকে বলা হয় fence sitter, পাঁচিলের উপর বসে থাকে, যখন যেই দল ভারী সেই দিকে ঢলে পড়ে।

এখানে আমরা সবাই শাস্ত্রের কথা শুনছি, যতক্ষণ শুনছি খুব ভালো লাগছে, মনে মনে ভাবছি একটু ত্যাগ তপস্যা করতে হবে। আবার যখন খবরের কাগজ, টিভিতে পঞ্চাশ রকমের জিনিস দেখছি, তখন মনে হয়, কি জানি বাপু ধর্মের কথাগুলো ঠিক না ভুল। এর মধ্যেই সবাই দোদুল্যমান। শুধু সংসারীরাই না, সন্ন্যাসীরও পাকা বুদ্ধি যতক্ষণ না হয়ে যায়, তাঁরও মন দুলতে থাকবে। উত্তরকাশী, হরিদ্বার, হৃষিকেশে এক একটা আশ্রমের যা সম্পত্তি আছে দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। মনে হবে আমরা আর কি করলাম, সাধুরাই সব সুখ ভোগ করছে। এগুলো কিছু না, এদের মধ্যেও আসুরিক বৃত্তি আছে। এখানে শাস্ত্রের কথা শুনে আমাদের মনে হবে সঞ্চয় করা ঠিক নয়, সঞ্চয় করে কি হবে! কিন্তু বাইরে বেরোলেই পাঁচটা জিনিস দেখতে হচ্ছে, পাঁচ রকমের কথা শুনতে হচ্ছে, কোন উপায় থাকে না। একজন সাধু আশ্রমের সন্ন্যাসীদের প্রায়ই একটা কথা বলতেন, শাস্ত্র বুঝে নেওয়া থেকে শাস্ত্রের নিয়মিত আবৃত্তি করা অনেক শ্রেয়। আমরা প্রায়ই বলে থাকি, কেউ শুনে শেখে, কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। কিন্তু হোঁচট খেলেই কি আমরা শিখে যাই? কিছুই শিখি না। বোধে বোধ করে জীবনে ওটাকে কাজে লাগানো একমাত্র অবতার পুরুষরা আর খুব উচ্চমানের মহাপুরুষরাই পারেন। যেমন গান্ধীজী বললেন আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হব, এরপর মাথায় ডাণ্ডা পড়ুক, বাজ পড়ুক যাই পড়ুক, তিনি সত্যকে আর ছাড়বেন না। এই রোখ কদাচিৎ কখন সখন কারুর হয়। বাকিদের নিজেদের নিয়মিত মনে করাতে হয়। আমরা হলাম মন্দ বুদ্ধির সেইজন্য শাস্ত্রের আবৃত্তি না করলে, বার বার আঘাত না করলে কথাগুলো ভেতরে ঢুকতে চায় না। কারণ আমরা দৈবী গুণে সম্পন্ন নই, আর আসুরিক সম্পন্নও নই, আসুরিক মানসিকতার হলে এখানে শাস্ত্র কথা শুনতেই আসতাম না, আমরা হল ঠিক ঠিক পাঁচিলের উপর বসা, অসুরদের সাথে অসুরের মত হয়ে যাই, আর ভালো লোকেদের সাথে ভালো মানুষ হয়ে যাই।

১৩) হস্তি

অবধূতের ত্রয়োদশ গুরু হাতি, বলছেন *পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি। স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ।।১১/৮/১৩।।* ঠাকুরও এই কথা বলছেন, সন্ন্যাসী কাঠের তৈরী বা পাথরের তৈরী নারীমুর্তিকে পায়ের আংঠা দিয়েও স্পর্শ করবে না। এর আগে ঠাকুর অনেকবার বলছেন সন্ন্যাসী স্ত্রীর চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না, আর তিনি ভাগবত থেকে নিচ্ছেন, কাঠের নির্মিত যুবতী নারীর মুর্তিকে পা দিয়েও সন্ন্যাসী স্পর্শ করে দেখবে না। বুনো হাতিকে ধরার অনেক রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়। একটা কৌশল হল, যে পথ দিয়ে হাতিরা চলাচল করে সেই রাস্থাতে গর্ত করা থাকে আর এমন ভাবে পটকার আওয়াজ করতে থাকে হাতি ভয়ে দৌড়াতে গিয়ে ঐ গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। আরেকটা কৌশল হল খেদা, খেদান থেকে খেদা এসেছে। বিরাট বিরাট কাঠ দিয়ে চারিদিকে একটা পাঁচিলের মত তৈরী করে একটা জায়গাকে ঘিরে রাখে। আর বুনো হাতিকে পোষা হাতি দিয়ে এমন তাড়া করতে থাকে যে বুনো হাতিগুলো পালাতে শুরু করে। আর এমন কায়দা করে তাড়াতে থাকে একটা জায়গায় গিয়ে সব কটা বুনো হাতিকে ঐ ঘেরা জায়গাতে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। ঢুকিয়ে দিয়েই গেটটা বন্ধ করে দিল। বুনো হাতিগুলো আর পালাতে পারেনা। জংলী হাতিকে না হয় বেঁধে নেওয়া হল। কিন্তু এগুলোকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে হবে, তার ট্রেনিং কে দেবে? খেদাতে সব সময়

এরা মেয়ে হাতিদের ব্যবহার করে। পুরুষ হাতি কোন অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া হয় না, পুরুষ হাতি নিয়ে যাওয়া মানেই প্রচণ্ড মারামারি। মেয়ে হাতিকে দেখেই বুনো হাতিগুলো শান্ত হয়ে যায়। এটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের, যে কোন কারণেই হোক সারা বিশ্বে হাতিদের সব ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম। এই ভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার পর দু দিক থেকে দুটো মেয়ে হাতিকে নিয়ে যাবে। মেয়ে হাতিগুলোকে দেখে জংলী হাতিরা শান্ত হয়ে যায় আর সেই সময় ওদের পায়ে শেকল পড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনিং দেওয়ার সময়েও মেয়ে হাতিগুলোই থাকে। জংলী হাতির শক্তি সাঙ্ঘাতিক, পুরুষ পোষা হাতি যদি থাকে এক সঙ্গে দুটো তিনটে হাতিকে তুলে ফেলে দেবে। কিন্তু মেয়ে হাতিকে দিয়ে এইভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার পর কয়েক দিনের মধ্যে ট্রেনিং দিয়ে পুরো কব্জা করে নেওয়া হয়।

দত্তাত্রেয় নিশ্চয়ই দেখেছেন হাতিকে কীভাবে ধরা হয়। হাতি যে কিনা জঙ্গলের রাজা, তার হাঁটাচলা সব রাজকীয় কিন্তু সেই বুনো হাতি পোষা মেয়ে হাতির পাল্লায় পড়ে সারা জীবন মানুষের হয়ে খেটে মরে। দত্তাত্রেয় তখন বলছেন *পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি। স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ।।* দত্তাত্রেয় বলছেন আমি হস্তীর কাছে এই শিক্ষা পেয়েছি, কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত যদি কোন যুবতী নারীর মুর্তিও হয় সেটাকেও সন্ন্যাসী পা দিয়েও স্পর্শ করবে না। ঠাকুর ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণাদি শুনতেন। বুনো হাতিগুলো যেমন মেয়ে হাতিদের পাল্লায় পড়ে নিজের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা সব কিছুকে বিনষ্ট করে দেয় ঠিক সেইভাবে নারীর স্পর্শ সন্ন্যাসীকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে একটা খুব সুন্দর কাহিনী বলা হয়, কোন এক খ্রীশ্চান ফাদারের সাথে কনভেন্টের কোন সিস্টারের সাথে মেলামেশা চলছিল। ফাদারের সুপিরিয়র খুব আপত্তি করেছেন, ওরকমটি করো না। ফাদার বলছেন, কেন তাতে কি হয়েছে? আমরা তো পবিত্র, আমরা ভগবানের কথাই বলি। তখন উনি ফাদারকে বলছেন, মাটি খুব ভালো জিনিস, জলও খুব ভালো জিনিস, দুটোই প্রাণদায়িনী। কিন্তু দুটো মিশে গেলে হয়ে যায় পাঁক। নারী পুরুষ মিলন মানেই পাঁক, কেউ বাঁচাতে পারবে না। এগুলোর উপর প্রচুর কাহিনী মোটামুটি সব ধর্মেই ছড়িয়ে আছে। ঠাকুরের এক শিষ্য কোন মহিলার কাছে যেতেন, সেই মহিলার আবার বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, ওরে সাবধান! বাৎসল্য থেকেই তাচ্ছল্য ভাব হয়। আমাদের তিনটে ইন্দ্রিয় চোখ, কান আর নাক এদের বিষয়গুলো দূরের জিনিস কিন্তু জিহ্বা আর চর্মের সরাসরি সংযোগ দরকার। সরাসরি সংযোগের জন্য তার সুখের গভীরতাও বেশি হয়।

চর্মের স্পর্শ সুখকে নিয়ে দত্তাত্রেয় বলছেন *নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ। বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা।।*১১/৮/১৪। একটা তো হয়ে গেল ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদের জন্য, কিন্তু বিবেকী পুরুষরা কখনই স্ত্রীকে ভোগ্য রূপে গ্রহণ করবেন না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই কোন নারীকে ভোগ্যবস্তু রূপে দেখবেন না। তার মানে, কোন নারীকে যখন স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা হয় তখন সেই নারী কখনই ভোগ্য রূপ নয়, সেইজন্য স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী যজ্ঞে সঙ্গ দেবে, ঘর গৃহস্থের সব কিছু সামলাবে, স্বামীকে ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থ সাধনে সাহায্য করবে। ভোগরূপে নারীকে দেখা মানেই *বলাধিকৈঃ স হন্যেত*, তুমি তোমার বিনাশকে ডেকে আনছ। যে কোন হাতির পালে সাধারণত একটাই হাতি থাকে, বাকি সব হস্তিনী আর বাচ্চা হাতি থাকে। বানরের দলেও একটাই পুরুষ থাকে, বাকি সব মেয়ে বানর থাকে। একটা হাতি হয়ত তিরিশ চল্লিশটা হাতিকে নিয়ে আছে। এখন এই হাতিরও তো বয়স হচ্ছে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর তখন তারই গ্রুপের, হয়ত তারই সন্তান, তাকে চ্যালেঞ্জ করে। সে এখন নতুন যৌবন পেয়েছে, বুড়ো হাতিকে সে মেরে শেষ করে দেয় বা যদি নাও মেরে দিতে পারে, ঐ বুড়ো হাতি এবার দলছুট হয়ে যাবে। মানুষের ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় একজন নারীর প্রতি দুজন পুরুষ আসক্ত হয়ে গেছে, এবার একজনকে মরতে হবে।

মনুস্মৃতিতে বলছেন, পরনারী সঙ্গে যে পরিমাণ আয়ু ক্ষয় হয় অন্য কিছুতে এই ক্ষয় হয় না। পরনারী সংস্পর্শ বিষের মত। এই শ্লোকে শুধু সন্ন্যাসীকে বলছেন না, যাঁরা প্রাজ্ঞ, যাঁরা বিবেকী তাকে সব সময় নারী থেকে সাবধান থাকতে হবে, কারণ নারী তার জন্য মুর্তিমান মৃত্যস্বরূপা, হস্তিনী যেমন বুনোহস্তীর কাছে মৃত্যস্বরূপা। ঠাকুরও বারবার বলছেন নারীকে সব সময় মাতৃস্বরূপা দেখবে, ঠাকুরের ভাবই ছিল সন্তানভাব।

১৪) মধু সংগ্রহকারি

দত্তাত্রেয়র চতুর্দশ গুরু মধু সংগ্রহকারি, বলছেন *ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ লুব্ধৈর্যদ্ দুঃখসঞ্চিতম্। ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধহেবার্থবিন্মধু।।১১/৮/১৫।।* একদিন তিনি দেখলেন মধু সংগ্রহকারির দল মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করছে। মধু সংগ্রহকারীর কাছে থেকে তিনি শিক্ষা পেলেন; মানুষ কত কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে আর সেই অর্থকে ভোগে না কাজে লাগিয়ে, দান-ধ্যান না করে, মানুষের উপকারে না লাগিয়ে সঞ্চয় করে যাচ্ছে। টাকা মানেই দুঃখ, টাকা উপার্জন করার জন্য কত খাটতে হয়, খাটার জন্য দুঃখ, টাকা কাছে থাকলেই সব সময় ভয়, ছিনতাই না হয়ে যায়, চুরি না হয়ে যায়, ডাকাতি না হয়ে যায়, সব সময়ই দুঃখ। আর যখন হাত থেকে চলে যায় তখনও দুঃখ। অথচ মানুষ টাকাকে ছাড়তে পারে না। যেটা সহজে এসে যায় সেটাকে মানুষ খুব সহজেই ছেড়ে দেয়। কামারপুকুরে অনেক বাচ্চা, বাড়ির বউরা গাউডের কাজ করে। তখনকার দিনে সাধারণত চার আনা কি আট আনা দেওয়া হত। একবার কোন ভক্ত পরিবার গিয়েছিলেন, তাঁরা কিভাবে একটা বাচ্চাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে দিয়েছেন। ওর পাওয়ার কথা হদ্দ একটি টাকা আর পেয়ে গেছে দশ টাকার নোট। ভক্তদের সামনেই বাচ্চাটা দশ টাকার নোটকে এ্যরোপ্লেন বানিয়ে ফু দিয়ে ওড়াচ্ছে। দশ টাকাটা ও রাখবে, কিন্তু ফু মেরে ওড়াচ্ছে। এক টাকার নোট দিলে ঐ রকম করত না। কারণ এক টাকাটা ওর খাটনির, কিন্তু ঐ দশটি টাকার ওর কাছে বেশি হয়ে গেছে আর সহজে এসে গেছে। কজন আর সহজে টাকা পায়, কয়েকজন যারা আইটি ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, আর কিছু আছে শেয়ারে লোকেদের বোকা বানিয়ে টাকা রোজগার করছে, বাকি সবাইকে খেটে মরতে হচ্ছে দুটো টাকা আয় করার জন্য। সেইজন্য *ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ*, একটি পয়সা কাউকে দান করবে না আর নিজেও ভোগ করবে না, মধু সংগ্রহকারির মত আরেকজন এসে সেই সঞ্চিত ধন ভোগ করে চলে যায়। মানুষ মাত্রই কৃপণ, তাকে যদি এখানে প্রস্বাব করতে বলা হয় করবে না, ওর ভয় পাছে অন্যের লাভ হয়ে যাবে। এক খ্রীশ্চান ফাদার এক বিরাট বড়লোকের কাছে কিছু ডোনেশানের জন্য গেছেন। গিয়ে বলছেন 'আমাদের চার্চ আছে, গরীবের মধ্যেও আমরা অনেক কাজটাজ করছি, যদি কিছু ডোনেশান দেন'। ফাদারকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, মহা কৃপণ, এক পয়াসাও পাবেন না। যাই হোক বহু কষ্টে তিনি এ্যপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন। ধনী লোকটি ফাদারের কথা শুনে বলছে 'আপনারা এত কাজ করছেন? তা আপনি কি আমার ব্যাপারে সব কিছু জানেন'? 'হ্যাঁ জানি, আপনি এই শহরের একজন অন্যতম ধনী লোক, আপনার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে'। 'আপনি কি জানেন আমার এক বিধবা বোন আছে সে খেতে পায় না? 'আমার তো জানা নেই'। 'আপনি কি জানেন আমার এক অপঙ্গ ভাইপো আছে, যার কোন রোজগার নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই'? 'না জানা নেই'। এরপর ভদ্রলোক এক এক করে আমার অমুক আছে সে এই রকম, তমুক আছে সে এই রকম, এই করে বিরাট এক ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে। তখন ফাদার বলছেন 'স্যার! আমি জানতাম না আপনার উপর এত কষ্ট পাওয়া মানুষ নির্ভর করে আছে, আপনার কাছে ডোনেশান চেয়ে সত্যিই আমি খুব লজ্জিত, আমি আসছি'। ধনী লোকটি ছাড়বে না, বলছে, 'না না আপনি শুনে যান, ওদেরকে যখন আমি এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করি না সেখানে আপনাকে আমি কেন দিতে যাব'! এটাই মানুষের রোগ, সব জায়গাতে এই একই জিনিস হয়। কথামৃতেও ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন

কৃপণের ধন কীভাবে শেষ হয়। মানুষ চাকরি করছে, চাকরিতে প্রমোশন হচ্ছে, টাকা আসছে, সেই টাকা জমিয়ে রেখে দিচ্ছে। পরে তার ছেলে-মেয়েরা উড়িয়ে দিল, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কষ্ট করে, না খেয়ে একটি একটি করে পয়সা জমালেন। ছেলে বড় হয়ে এই করতে হবে সেই করতে হবে বলে টাকা চাইল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিলেন। দুদিন পর শুনলেন ছেলে সেই টাকা নিয়ে ফুর্তি করে উড়িয়ে দিয়েছে। বৌমা এল, দুদিন পর ৪৯৮এ একটা কেস ঠুকে দিল, পরে আইনের প্যাঁচ কশে সব টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চারিদিকে এই দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হয়।

হায়দ্রাবাদের নিজামকে কেউ আশীর্বাদ করেছিল, তোমার যা সম্পত্তি হবে তাতে তোমার সাত পুরুষের কোন অভাব থাকবে না। মুঘল রাজত্ব থেকে শুরু করে পুরো ইংরেজদের সময় পর্যন্ত নিজামকে কেউ হাত দিতে পারেনি। নিজামের যে কত সম্পত্তি তার খবর বাইরের কেউ আজ পর্যন্ত জানে না। ভারতের স্বাধীন হওয়ার পর নিজাম পরিবার ঠিক করল কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, পাকিস্থান চলে যাবে। যাওয়ার সময় কয়েকটা গাড়িতে ওরা শুধু সোনার পেটি গুলো রাখল, গাড়িতেও রাখার জায়গা হচ্ছে না। সোনার ভারে গাড়ির চাকা গুলো মাটিতে বসে গেছে। অষ্টম নিজাম মায়ের তরফে তুর্কি দেশের যে খালিফা তার নাতি। আর মহম্মদের তরফ থেকে তিনি ছিলেন, মহম্মদের ছেলে আবু বখর, তার বংশের। বাবার দিক থেকে তার সরাসরি লাইন আসছে মহম্মদের মেয়ে থেকে। সেই সময় বোম্বেতে কোন কারণে নিজামদের কিছু সোনা ছাড়াতে হয়েছিল, তাতে সোনার দামে রাতারাতি ধস নেমে গিয়েছিল, তাহলে ভেবে দেখুন কত সোনা গেছে। নিজামের যা হীরে ছিল, সংসারে কারুর ক্ষমতা ছিল না যে ঐ হীরে কেউ কিনে নিতে পারবে। সেই লোকটির শেষে একটি প্রজন্মে সব কিছু চলে গিয়েছিল। তার ঠাকুরদার হাজারটে বেগম ছিল, বিকেল বেলা সবাইকে একটা লনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত আর ঠাকুরদা যাকে পছন্দ করবে সেই রাত্রে সে তার সঙ্গে থাকবে, এই রকম তার প্রাচুর্য। অথচ এই প্রাচুর্যকে যে কাজে লাগাবে সেই ব্যাপারে কারুরই কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। তারপর দেখা গেল যে সব কিছু দেখাশোনা করত সে অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিল আর মামলা মকোদ্দমায় বাকিটাও চলে গেল। ঠাকুরও বলছেন এদের সঞ্চিত ধন মামলা মকোদ্দমাতেই চলে যায়। এত সম্পদ কারুর কোন কাজে লাগবে না। এখন যে নিজাম সেও জানে না অবশিষ্ট সম্পদ কোথায় কিভাবে আছে।

এটাই সংসারের বাস্তব চিত্র। সারাটা জীবন কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করে বৃদ্ধ বয়সে এসে দেখছে তার নামে কোটি কোটি জমে আছে, জানে না এই টাকা দিয়ে কি করবে। অনেকে মঠ মিশনে চিঠি লিখে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অথচ সারা জীবন কষ্টে কাটিয়ে শুধু সঞ্চয় করে গেছে। আমেরিকার একজন অন্যতম ধনী মহিলা ছিল, সে এমনই কৃপণ যে নিজের গাউনটাও কোন দিন ধুতে দিত না, কারণ ধুলে বেশি দিন টিকবে না। শুধু পায়ের তলাটা যেটা মাটিতে লোটাত ঐটুকু মাসে একবার জল দিয়ে ধুয়ে নিত। নিজের সম্পদ দেখাশোনার জন্য কোন অফিস চালাতো না। যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা আছে, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের অফিসে বসবে। ম্যানেজারের অফিসকে নিজের অফিস বানাবে, ওদেরই কাগজ নেবে, ওদেরই কলম নেবে। আর যদি কেউ একটু আপত্তি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে পুরো টাকা তুলে অন্য ব্যাঙ্কে রেখে দেবে। মহিলার শত শত কোটি টাকা ছিল। রাস্থার ধারে পড়ে থাকত, কেউ বিশ্বাস করত না যে মহিলার এত টাকা আছে। মহিলা যেদিন মারা গেল তারপরই জানা গেলে তার এত টাকা। মহিলাটির দু তিনটে সন্তান ছিল, ছেলে, ছেলের স্ত্রী, তাদের সন্তানদেরও কিছু খেতে পড়তে দিত না। মহিলা মারা যাবার পর ওরা ঐ সম্পত্তির মালিক হল, আর কিছু দিনের মধ্যেই মদ খেয়ে ফুর্তি করে সব টাকা উড়িয়ে শেষ করে দিল।

এটাই দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে বলছেন, *ভুঞ্জতে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু*, এত কষ্ট করে সঞ্চয় করে, নিজেও ভোগ করে না, অপরকেও ভোগ করতে দেয় না। টাকা-পয়সা তো নিজের সুখ সুবিধার জন্য। সঞ্চয় করাটা খারাপ নয়, সংসারীদের সঞ্চয় অবশ্যই করতে হয়, কিন্তু একটা সীমা টেনে দিতে হয়। আবার এক আধজন আছে যার এমনই কর্ম তার এই কষ্টটা হয় না। টাকা জমিয়েছে, বাড়ি বানিয়েছে, ভালো ছেলে, বৌমাও ভালো। তারপর নাতি হয়েছে সেটিও ভালো। এই এক আধ জনকে দেখে বাকিরা মনে করে আমারও এই রকমই হবে। কিন্তু বাকি নিরানব্বুইটা যে পথে বসে হাবুডুবু খাচ্ছে সেটা কেউ দেখে না। তখন বলে আমারই কপালে এই ছিল!

এখানে আবার দত্তাত্রেয় মজা করে বলছেন *সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ। মধুহেবাগ্রতো ভুঙক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্।।১১/৮/১৬।।* তুমি তো সব সময় দেখছ মধু সংগ্রহকারীর দল মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু তাদের ভোগের আগেই মৌচাক ভেঙে নিয়ে যায়। ঠিক সেই ভাবে গৃহস্থের অতি কষ্টের সঞ্চিত ধন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সেবায় খরচ হয়ে যায়। আগেকার দিনে অতিথি সেবার নিয়মই ছিল আগে অভ্যাগত সকলের সেবা করার পর গৃহস্থ নিজে গ্রহণ করবে। সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের কখন উচ্ছিষ্ট জিনিস দিতে নেই, সেইজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের বাড়িতে পৌঁছে গেলেই বাড়িতে যা রান্নাবান্না হয়েছে তার অগ্রভাগ দিয়ে তাঁদের সেবা করাতে হত। এই নিয়ম এখনও পালন করা হয়। যদিও অতিথিসেবা এখন আর আগের মত কেউ পালন করতে পারেনা আর করেও না। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের এখনও সব কিছুর অগ্রভাগ দিয়ে সেবা করার নিয়ম চলে আসছে। মৌমাছি ঘুরে ঘুরে মধু এনে মৌচাকে জমাতে থাকে, সে নিজেও একটু তৃপ্তি করে মধু খায় না, কিন্তু সঞ্চিত মধু অপরে এসে নিয়ে চলে যায়। ঠিক তেমনি মানুষ এত কষ্ট করে অর্থ রোজগার করছে, নিজে কষ্ট কর জীবন নির্বাহ করে সেই উপার্জিত অর্থকে সঞ্চয় করে যায়, অথচ সব সঞ্চিত অর্থ একদিন হাত থেকে বেরিয়ে চলে যায়। দত্তাত্রেয় বলছেন, এইসব দেখে আমি ঠিক করলাম কোন সঞ্চয় করব না। এখানে মূল প্রশ্ন ছিল, রাজা জনকের বংশধর যদু রাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি তো কোন কাজ করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার এত বুদ্ধি কি করে হল। তখন দত্তাত্রেয় বলছেন, আমি অনেক কিছু দেখেছি, যেখানে যা দেখি সেখান থেকেই একটা শিক্ষা পেয়ে যাই। কিন্তু মানুষ যে শিক্ষা পায় তার পেছনে একটা মূল তত্ত্ব হল, মানুষ যেটার জন্য প্রস্তুত সেটার বাইরে সে কিছুই শিখতে পারবে না। একটা সোনার ঘটি আছে, ঐ ঘটিতে ততটুকুই জল ধরবে যতটুকু ঘটির পাত্রতা আছে, তার বেশি দিলে বেরিয়ে যাবে। যদি কেউ ওর মধ্যে আরও বেশি জল ধরাতে চায় তাহলে আগে তাকে ঘটির পাত্রতা বাড়াবার জন্য হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সাইজটাকে বড় করতে হবে। হাতুড়ি পেটানোটা সব সময়ই হয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। যত হাতুড়ি পড়বে তত তার পাত্রতা বাড়বে। অভিজ্ঞতা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কেউই কিছু শিখতে পারবে না। আর লেকচার শুনে, বাক্য দিয়ে তো মানুষ কখনই শেখে না। অভিজ্ঞতা হলে অন্তত জেনে যায় যে জিনিসটা এই রকম, সে হয়ত পালন করতে পারে না, কিন্তু জেনে গেল।

১৫) হরিণ

অবধূতের পঞ্চদশ গুরু হল হরিণ, বলছেন *গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ। শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ।।১১/৮/১৭*। দত্তাত্রেয় বলছেন হরিণের কাছে আমি শিক্ষা পেলাম, সন্ন্যাসী যাঁরা একান্ত বাস করছেন তাঁদের কখনই গ্রাম্যগীত, গ্রাম্যগীত মানে বিষয় সম্বন্ধিত চর্চা বা গুণ কীর্তন শুনতে নেই। সাধুর জীবনে দুটো বিরাট বড় বিঘ্নের মধ্যে একটা হয় গ্রাম্যগীত আর আরেকটা হয় গ্রাম্য কথা। চৈতন্য

মহাপ্রভুও শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, না কহিবে কভু গ্রাম্যকথা। গ্রাম্যকথা মানে যে কোন বৈষয়িক কথা, সাংসারিক কথা সন্ন্যাসী কখনই আলোচনা করবে না।

কিন্তু এখানে বলছেন *গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্*, সিনেমার গান, আধুনিক গান, জীবনমুখী গান, ব্যাণ্ডের গান সন্ন্যাসী কখনই শুনবে না। যদি শোন তাহলে তোমারও হরিণের মত অবস্থা হবে। আগেকার দিনে হরিণ শিকার করা অত সহজ ছিল না, হরিণ প্রচণ্ড জোরে ছুটতে পারে। তীর মারা যায় কিন্তু তাতে হরিণকে জ্যান্ত ধরা যাবে না। অনেক সময় জাল ফেলে ধরা হয়। কিন্তু হরিণ, পাখি ও আরও কিছু পশু আছে এদেরকে জ্যান্ত ধরার জন্য শিকারীরা কোন গাছের তলায় বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আর মুখে এক ধরণের মিষ্টি আওয়াজ বা শিস্ দেয় আর হরিণকে ধরার জন্য এক ধরণের গান করে। এমন সুন্দর মিষ্টি সুরে গান করে যে ঐ সঙ্গীতে মোহিত হয় হরিণ ব্যাধের কাছে চলে আসে। হরিণ তখন ব্যাধের কাছে ধরা পড়ে যায়। জিম করবেট যে বাঘ শিকার করতেন সেখানেও বাঘকে ফাঁসানোর একটাই পথ ছিল, বাঘিনী বাঘের সাথে মিলনের ইচ্ছা হলে যে রকম আওয়াজ করে, জিম করবেট গলায় ঠিক সেই রকম আওয়াজ করতেন। তাতে জিম করবেটও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরেকজন শিকারীও একই জঙ্গলে ছিল, জিম করবেট বাঘের মত ডাক দিচ্ছেন, অন্য শিকারী অন্য রকম ডাক দিচ্ছে, আস্তে আস্তে এক অপরের দিকে এগোতে থাকছে, মানে জিম করবেটও এগোচ্ছেন আর ঐ শিকারীও এগোচ্ছে। তারপরে বন্দুকটা বার করে দেখে আরে এ তো একটা মানুষ। তাতে জিম করবেট প্রচণ্ড রেগে গেলেন, জেলা শাসককে চিঠি লিখলেন, আপনারা একই সাথে জঙ্গলে দুজনকে শিকারের পারমিশান দেবেন না।

একটা কাহিনীতে আছে যেটা সিনেমাও হয়েছে, খুব বড় শিল্পী রাজমহলে সরোদ বাজাচ্ছেন, এমন সুরের মুর্ছনা যে প্রকৃতি যেন স্তব্দ হয়ে গেছে, বন্য পশুরাও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাজনা শোনার জন্য সব রাজমহলে ঢুকে গেছে। যেমনি বাজনা বন্ধ হয়ে গেলে সব পশুরা প্রাণের ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। তবে যেটা খুব মজার ব্যাপার, হরিণরা যে ধরা পড়ে ওরা কিন্তু সঙ্গীতের জন্য ধরা পড়ে না, দেখা গেছে যদি একটা ছন্দে কোন আওয়াজ যদি বার বার করা হয়, এমনিতেও পশুপাখিরা ছন্দ ও তালকে খুব পছন্দ করে, তখন হরিণের কান ঐ ছন্দ ও তালের সাথে অভ্যস্ত যায়, আর আস্তে আস্তে ঐ আওয়াজের দিকে এগিয়ে যায়। শিকারীরা মনে করে হরিণ সম্মোহিত হয়ে যায়, কিন্তু হরিণ সম্মোহিত হয় না। তখন part of landscape হয়, landscape মানে, আমার যেমন সবাই এই ঘরে আছি, আমরা সবাই এক অপরকে জানি, এখানে অপরিচিত কেউ নেই, কিন্তু একটা বানর যদি ঢুকে যায় আমরা সবাই চমকে উঠব। কিন্তু রোজ যদি একই বানর দেখি আমরা ওটাতেই পরিচিত হয়ে যাব। ওদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। কোন আওয়াজ একই ছন্দ ও সুরে এক নাগাড়ে করতে থাকে তখন ঐ সুর ও ছন্দে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর দেখতে ইচ্ছে করে কোথা থেকে এই আওয়াজটা আসছে। শিকারীরাও কায়দা করে লুকিয়ে থেকে হরিণকে ধরে ফেলে।

হ্যারি হুডিনি জাদু খেলাতে খুব বিখ্যাত ছিলেন। হুডিনি দুজন ছিলেন, বর্তমান কালের যিনি হুডিনি তিনিও অনেক খেলা দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর থেকেও ওস্তাদ ছিলেন প্রথম যিনি হুডিনি, উনি ঠিক ঠিক ওস্তাদ লোক ছিলেন। একবার তাঁকে একটা বাদ্যযন্ত্র সারাবার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ঐ বাদ্যযন্ত্র থেকে নানা রকমের পশুপাখির আওয়াজ বাজানো যেত। বাদ্যযন্ত্রটাকে সারালেন, সারিয়ে পরীক্ষা করার জন্য হুডিনি ওটাকে জঙ্গলে নিয়ে গেলেন। একটা কোকিলের আওয়াজের মত ঐ বাদ্যযন্ত্রে বাজাতে লাগলেন। বসে বসে বাজিয়ে যাচ্ছেন, কিছুক্ষণ পরে দেখছেন চারিদিক থেকে বন্য কোকিল গুলো আসতে শুরু করে দিয়েছে। আওয়াজটা এতই বিশ্বাসযোগ্য যে পাখিগুলো এগিয়ে এসেছে। এখানে বলছেন, ঋষিরা যাঁরা বনচর হয়ে যান, গান তাঁদের

মুগ্ধ করে। আগেকার দিনে এইভাবে হরিণকে ধরতে দত্তাত্রেয় নিশ্চয়ই দেখেছেন। খবরের কাগজে কার সম্বন্ধে কি লেখা হচ্ছে, ম্যাগাজিনে কি কি আর্টিকেল বেরিয়েছে এই ধরণের কোন জাগতিক বিষয় সম্বন্ধিত লেখা পড়তে নেই, এগুলোকে এখানে বলছেন গ্রাম্যকথা। বিষয় নিয়ে চর্চা করলে আজ হোক, কাল হোক বন্ধনে পড়বেই। কিন্তু গ্রাম্যগীত বিশেষ করে সঙ্গীত, মিষ্টি মিষ্টি গান, লারেলাপ্পা গান সন্ন্যাসীর কখনই শুনতে নেই।

দত্তাত্রেয় আবার মহাভারত থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দৃষ্টান্ত আনছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বৈশিষ্ট্য হল তাঁর পিতা বিভণ্ডক মুনি তাঁকে ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে বড় করেছিলেন যাতে তিনি কোন দিন নারী মুখ না দেখতে পান। অঙ্গ দেশের রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ফাঁসাবার জন্য কিছু নর্তকীকে পুরুষ সাজিয়ে পাঠালেন তাঁর রাজ্যে নিয়ে আসার জন্য। পুরুষের বেশ ধরে এরা গীত-বাদ্য-নৃত্য করে করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বশীভূত করে বজরাতে বসিয়ে অঙ্গ দেশে নিয়ে এসেছিল। রাজা আবার তার কন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। রাজা দশরথ যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সেই যজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন। আমরা মনে করতে পারি ঋষশৃঙ্গ মুনির অঙ্গ দেশের রাজার ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে তো ভালই হয়েছিল, রাজকন্যা পেল, রাজ্য পেল আবার রাজা দশরথের যজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন। আমরা এইভাবে দেখছি, কিন্তু দত্তাত্রেয় দেখছেন অন্য ভাবে, নৃত্য-গীতে ঐভাবে বশীভূত হয়ে আধ্যাত্মিকতার একটা ভালো অবস্থা থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পতন হয়ে গিয়েছিল, এই পতন না হলে তিনি হয়ত আরও উঁচুতে উঠতে পারতেন। কিন্তু যেটা মূল কথা সেটাকে ছাড়া যাবে না, সেটা হল তুমি বশীভূত হলে এই মিষ্টি সঙ্গীতের জন্য।

একই ধরণের চিন্তা বিদেশী সাহিত্যেও পাওয়া যায়। ইলিয়ড ওডিসিতে এই ধরণের দুটো বর্ণনা আছে। সাইরিন দ্বীপে এক ধরণের মেয়েরা ছিল, যারা অতি সুন্দরী আর এত সুন্দর মিষ্টি গান করত যে তাদের গানের আকর্ষণে দ্বীপের পাশ দিয়ে যত জাহাজ যেত সব ঐ দ্বীপে এসে আটকে যেত। আরগো নামে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, সাইরিন দ্বীপের পাশ দিয়ে গেলেই তুমি ওখানকার মেয়েদের সঙ্গীতে ফেঁসে যাবে। তাকে বলে দিল তুমি এমন মিউজিশিয়ান নিয়ে যাও যারা ঐ মেয়েগুলোর থেকেও ভালো গান বাজনা করতে পারে। তা না করলে তোমার নাবিকরা সব পালিয়ে যাবে। আরগো জাহাজ এইভাবে ভালো মিউজিশিয়ানদের নিয়ে যাওয়াতে দ্বীপের পাশ দিয়ে খুব নিরাপদে বেরিয়ে গিয়েছিল। হারকিউলাস যখন ফিরছেন তখন তাঁকেও আগে সাবধান করে দেওয়া হয়ছিল। সাইরিন দ্বীপ থেকে এত সুন্দর সম্মোহিনী সঙ্গীত ভেসে আসবে তোমরা কেউ ফিরতে পারবে না, সব ঐ দ্বীপে বন্দী হয়ে যাবে। হারকিউলিস সব নাবিকের কানে মোম ঢেলে দিয়েছে যাতে কানে কোন শব্দ না শুনতে পায়। আর নাবিকদের বলে দিল তোমরা আমাকে জাহাজের মাস্তুলে ভালো করে বেঁধে দাও। আমি একটু এদের সঙ্গীতটা শুনতে চাই, আর আমি যতই চেঁচামেচি করি না কেন কোন মতেই আমার বাঁধন খুলে দিয়ে নামিয়ে দেবে না। হারকিউলাসকে মাস্তুলে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জাহাজ যখন সাইরিন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন সেই মধুর সম্মোহিনী গান ভেসে আসছে। হারকিউলাস চিৎকার করে যাচ্ছে, উন্মত্তের মত হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছে, বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার মত অবস্থা। নাবিকদের ধমক দিয়ে বলছে আমাকে খুলে দাও, তা নাহলে আমি তোমাদের একটা একটা করে গলা কেটে সমুদ্রে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব। হারকিউলাস ক্যাপ্টেন ছিল। কিন্তু নাবিকদের কানে তো মোম দেওয়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। নাবিকরা ভাবছে ক্যাপ্টেন গান শুনে আনন্দে হাত পা ছুঁড়ছেন। এইভাবে শেষে যখন দ্বীপটাকে অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল, সঙ্গীতের শব্দটাও মিলিয়ে গেল, তারপর আস্তে আস্তে হারকিউলাসের পাগলামোটা থামল।

সাধনার জগতে বলা হয় যে, ইন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ থেকে বাঁচার দুটো পথ, প্রথম পথ হল কানে ঠুলি দিয়ে দেওয়া, হারকিউলিসের জাহাজের নাবিকদের মত। কিন্তু কটা ইন্দ্রিয়ে ঠুলি দেবে! কান বন্ধ করবে, চোখটা বুজে রাখবে, নাক বন্ধ করবে, কত বন্ধ করবে, এভাবে কি জীবন চলতে পারে! আরগো জাহাজের ক্যাপ্টেন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণটা যদি বেড়ে যায়, ঈশ্বরের সঙ্গীত যদি ভেতরে অনুরণিত হতে শুরু করে তখন জাগতিক সব কিছুই অসার বোধ হবে। সেইজন্য এখানে শব্দটা বলছেন *গ্রাম্যগীতম্*, গ্রাম্যগীত যদি মানুষকে আকর্ষিত করে কিন্তু অন্তর্জগতে যদি ঈশ্বরের দৈবী সঙ্গীতের সুরের মুর্ছনা শুরু হয়ে যায় তখন এই গ্রাম্যগীত এক পাশে অসার হয়ে পড়ে থাকবে। মৌলবীর কাহিনী আছে, এক নর্তকীকে মৌলবীর খুব ভালো লাগত। মৌলবী লুকিয়ে লুকিয়ে নর্তকীর সেবা করত। একদিন ধরা পড়ে গেছে। নর্তকী বলল, ঠিক আছে আজকে আমি শুধু তোমার জন্যই আছি। সেজেগুজে নর্তকী এসে মৌলবীর কাছে বসেছে আর ঠিক সেই সময় আজান শুরু হয়েছে। তখন মৌলবীর মনে পড়ে গেল আমাকে এখন প্রদীপ জ্বালাতে হবে, দৌড়ে সেখান থেকে সে বেরিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেল। আল্লার ডাক যদি একবার মর্মে এসে আঘাত করে তখন সাংসারিকতা অসার হয়ে যায়। তবে কি হয়, ঠাকুর বলছেন চারাগাছকে প্রথমের দিকে বেড়া দিতে হয়, বেড়া না দিলে গরু, ছাগল খেয়ে নেবে, মারিয়ে দেবে। ইন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ থেকে বাঁচার এই দুটি পথ, একটা হল কানে ঠুলি দেওয়া আর দ্বিতীয় হল আরও উচ্চ জিনিসের দিকে যাওয়া। সংসারটা চিটে গুড়ের পানা আর ঈশ্বরের ভালোবাসা মিছরির শরবৎ। একবার মিছরির শরবতের স্বাদ পেলে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না।

১৬) মৎস্য

অবধূতের ষোড়শ গুরু মাছ। দত্তাত্রেয় বলছেন এবার আমি তোমাকে বলব মাছের কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা পেয়েছি। বড়শির টোপে যে মাংসের টুকরো দেওয়া থাকে, তার গন্ধে লোভে পড়ে মাছ এসে বড়শিটাকে ধরে মাংসের আস্বাদ করতে গিয়ে কখন যে তার গলায় বড়শিটা বিধে যায় টেরও পায় না। *জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ। মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্‌বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা।।১১/৮/১৯*। মাছ যেমন মাংসের স্বাদের লোভে প্রাণ দেয়, ঠিক তেমনি যে নিজের জিহ্বার স্বাদের লোভে বশীভূত হয়ে যায় সে মরবে। রসনার এমন টান যে ওখান থেকে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রমথন করে শেষ করে দেয়। বিবেকী পুরুষরা বাকি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন কিন্তু জিহ্বাকে বশে আনা খুব কঠিন। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন আধ্যাত্মিক জীবনে যে এগোতে শুরু করে তার কতকগুলি লক্ষণ আছে। প্রথমেই বলছেন তার খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বরটা কমে যায়। আগে বললেন অজিতেন্দ্রিয়, মানে যারা মেয়েদের দেখলেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে বলছে যারা জিহ্বার রসনায় আসক্ত, খাওয়া-দাওয়া যাদের পছন্দ। রসনার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই সে আজ হোক বা কাল হোক মরবেই। এখানে অবধূত খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন, আমার আপনার কথা বলছেন না। আমাদের একটু আপোষ হতে পারে, কিন্তু যিনি বনচর সন্ন্যাসী, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, তাঁর যদি রসনার দুর্বলতা এসে যায়, সর্বনাশ তাঁর হবেই হবে। আমরা যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলি, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাথে কর্মেন্দ্রিয়কেও যদি নেওয়া হয়, এই দশটি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি এক অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। একটা ইন্দ্রিয় যদি দুর্বলতা থাকে ঐ একটি ইন্দ্রিয় একাই বাকি নয়টি ইন্দ্রিয়কে নামিয়ে দেবে। সেইজন্য কোন ইন্দ্রিয়কেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। শরীর চালাতে ইন্দ্রিয়ের দরকার পড়বে ঠিকই কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে লাইন টেনে দিতে হয়।

বলছেন, *তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্, বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে।।১১/৮/২১।।* এখানে দত্তাত্রেয় কয়েকটি কথা বলছেন, রসেনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করলে সব ইন্দ্রিয়ই

বশীভূত হয়ে যায়। রসনা মানে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যে আসক্তি, রসনাকে জয় করলে সব ইন্দ্রিয়কেই জয় করা হয়ে যায়। অন্য ইন্দ্রিয়গুলো বশীভূত হলে মানুষ কিন্তু জিতেন্দ্রিয় হতে পারে না। কারুর যদি দেখা যায় তার রসেনেন্দ্রিয় বশীভূত তাহলে বুঝতে নিতে হবে যে তার বাকি সব ইন্দ্রিয়গুলোও বশীভূত হয়ে গেছে। বেলুড় মঠের একজন মহারাজ ছিলেন, খুবই ত্যাগী ও তপস্বী, দেহ রেখেছেন। উনি আমেরিকায় এক সেন্টারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে এসে দিল্লীতে ছিলেন। ওনার একবার কি মনে হল, আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে কিছুই তপস্যা করা হয়নি, এবার আমাকে খুব তপস্যা করতে হবে। উনি খুব মজা করে সাধুদের বলতেন, আরে ভাই! সেন্টারে খুব সুখে আছ, জিহ্বার যে কি টান কোন দিন বুঝতে পারলে না। উনি নিজে অত্যন্ত পেটরোগা ছিলেন, কিছুই খেতে পারতেন না, একটাই ওনার প্রিয় ছিল চা খাওয়া, প্রত্যেক এক ঘন্টা অন্তর চা খাবেন। সব কিছুতেই ওনার বৈরাগ্য ছিল কিন্তু চা খাওয়াটা কোন দিন ছাড়তে পারলেন না। উত্তরকাশীতে সন্ন্যাসীদের একটা কুঠিয়া আছে, ওখানে রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা নেই। তখনকার দিনে তো আরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ওখানে অন্নসত্র আছে সেখানে গেলে রুটি আর ডাল দিয়ে দেবে। এক রুটি আর ডাল খেয়ে কদিন আর চলতে পারে, মাঝে মাঝে একটু অন্য ধরণের খাওয়ার ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। একদিন ওখানে একটা নোটিশ পড়ল যে, মহাত্মারা আপনার আসবেন অমুক জায়গায় অমুক আশ্রমে আপনাদের চা দেওয়া হবে। মহারাজ যে কুঠিয়ায় থাকতেন ওখান থেকে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন পাহাড়ি জায়গা বলে কম করে তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হবে, তিন কিলোমিটার যাওয়া, তিন কিলোমিটার আসা, মোট ছয় কিলোমিটার হাঁটতে হবে। মহারাজ ভাবলেন আড়াইশ কি পাঁচশ চায়ের পাতা দেওয়া হবে, দু-তিন মাস ওনার চলে যাবে। তা নাহলে ওখানে সব কিছুই কিনতে হবে, কিন্তু পয়সা কোথায় পাবে! বিকেল চারটের সময় চা দেওয়া হবে, উনিও তিনটের সময় হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। ওখানে পৌঁছেছেন, পৌঁছানর পর সবাইকে এক কাপ করে চা খেতে দিয়েছে। উনি পরে এই ঘটনাটা সবাইকে বলতেন, এক কাপ চা খাওয়ার জন্য ঐ পাহাড়ি রাস্থায় তিন কিলোমিটার যাওয়া তিন কিলোমিটার আসা।

রসনা যে কী পীড়া উৎপন্ন করে সহজে বোঝা যায় না। আলাদা একা একা থাকলে তখন বোঝা যায়। সংসার জীবনে অনেক অশান্তি আছে, অনেক রকম ঝামেলা আছে, সংসারীদের অবশ্যই মনে হতে পারে, সন্ন্যাসীদের আর কি ঝামেল, যত ঝামেল আমাদেরই। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা সংসারীরা কল্পনাই করতে পারবে না, যে জিনিসগুলো যোগীদের কাছে, সন্ন্যাসীদের কাছে কি প্রচণ্ড সমস্যা। কোন মহাত্মার মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপল অমুক জিনিস খাওয়া যাক, হয়ত খুবই সাধারণ জিনিস তেমন কিছু না, কিন্তু তার জন্য তিন চারজনকে আমন্ত্রণ করবে, এরপর জিনিস-পত্র জোগাড়-যন্ত্র করতে নেমে পড়বে। রসনার প্রতি যদি একটু দুর্বলতা থাকে, ঐ একটু দুর্বলতাই এক এক করে সব কটি ইন্দ্রিয়কে টেনে নামিয়ে আনবে। এটাকে নিয়েই নারদ কৌপিন কে ওয়াস্তের কাহিনী বলছেন, একজন সাধুর কৌপিন ইঁদুরে কেটে দিত। ভিক্ষা করতে গিয়ে একজনের কাছে একটা কৌপিন চেয়েছে, সে আবার সাধুকে বুদ্ধি দিল ইঁদুরকে শায়েস্তা করার জন্য একটা বেড়াল রাখতে। সাধু বেড়াল পুষছেন, বেড়ালের জন্য দুধ চাই, দুধের জন্য একটা গরু চাই, গরুর দেখাশোনা করার জন্য একটা মেয়ে দরকার, এরপর ঐ মেয়েকে রাখার জন্য ঘরবাড়ি তৈরী করে নদের হাট বানিয়ে বসে গেল। আমরা যাই করি না কেন, যতই কান্নাকাটি করুক, সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। এত যে বৈরাগ্যের কথা বলছেন, এর একটিও জীবনে অনুশীলন করা যাবে না।

অথচ প্রকৃতি এমনই এক অদ্ভুত জিনিস যে শাস্ত্রে যা যা কথা বলছেন সবটাই প্রকৃতি আমাদের দিয়ে করিয়ে নেয়। আমরা বলছি বৈরাগ্যের অনুশীলন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতি তখন বলে, তুমি

বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে পারবে না বলছ, ঠিক আছে আমিই তোমাকে দিয়ে বৈরাগ্যের অনুশীলন করিয়ে নেব। মৃত্যু যখন আসবে তখন সে আমাদের পায়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে। সব কিছু এখানে পড়ে থাকবে। আর জন্মজন্মান্তর ধরে প্রকৃতি আমাদের টেনে বার করে আনার অনুশীলন করিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে আমরা অনুশীলন করতে চাইছি না। প্রত্যেক জন্মে আসছি আর প্রত্যেকবার বৈরাগ্যের পরীক্ষায় ফেল করে যাচ্ছি। যে মহারাজের কথা বলা হল উনি বলতেন 'দেখো ভাই আমার সময় হয়ে গেল আমি চললাম, মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি কিন্তু যখনই আমার জীবনের দিকে তাকাই তখন দেখছি আধ্যাত্মিক জীবনে আমার প্রাপ্তি শূন্য'। খুব দুঃখ করে সব সময় এই কথা বলতেন। আর বলতেন 'আমি সাধন-ভজন যে করিনি তা নয়, পাক্কা ছয় মাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এক আসনে বসে আমি টানা জপ করেছি'। অন্নসত্র থেকে ওনার রুটি ডাল কেউ নিয়ে আসত, সারাদিন পড়ে থাকত, এমনিতেই পেটরোগা ছিলেন, কোন দিন খেতেন, কোন দিন খেতেন না। প্রত্যেক জন্মে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যখন আবার পাঠাচ্ছে আমরা আবার ঐ একই কাজ করছি। বৈরাগ্য আসছে না, প্রকৃতি বলছে তুই ফেল করলি, ঠিক আছে আরেক জন্ম থাক। পরীক্ষায় ফেল করলে যেমন একই ক্লাশে রেখে দেওয়া হয়, প্রকৃতিও আমাদের দিয়ে বৈরাগ্যের চেষ্টা করিয়ে যাচ্ছে। আবার জন্ম নিয়ে চেষ্টা করছি, প্রকৃতি অনেক চড়, থাপ্পড় মেরে বৈরাগ্য শেখাচ্ছে, আমরা আবার ফেল করে একই ক্লাশে থেকে যাচ্ছি। এভাবে কত দিন চলবে? *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, যতদিন ফেল করব ততদিন এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকবে, সেই ভালোবাসা, সেই শত্রুতা। বৌদ্ধ ধর্মের যে মহাযান শাখা আছে তাতে তাঁরা বলেন মুক্তি সবারই হবে। আমাদেরও একটা মতে মুক্তি সবারই হবে। কিন্তু কবে হবে কেউ জানে না। বৈরাগ্যের অনুশীলন করা খুব কঠিন কিন্তু সবাইকে এটাই করতে হবে। মাছের পরে ভাগবতের খুব নামকরা কাহিনী বলছেন। এই কাহিনী অন্যান্য জায়গায়তেও আসে।

১৭) পিঙ্গলা নর্তকী

মিথিলা নগরীকে বলা হয় বিদেহ নগরী। বিদেহ শব্দের অর্থ যিনি এই দেহে থেকেও মুক্ত। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, নারকল শুকিয়ে একেবারে ঝুনো হয়ে গেলে ওর ভেতরের শাঁস খোল থেকে আলাদা হয়ে যায়, নারকলকে নাড়ালে ঢপর ঢপর আওয়াজ হয়। যিনি জ্ঞানী পুরুষ তাঁর শরীর আর জীবাত্মা পরিষ্কার আলাদা হয়ে যায়। আমি আর আমার জামা যেমন আলাদা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, জ্ঞানী পুরুষও ঠিক সেই রকম পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমি আর আমার শরীর আলাদা। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, আমার ঠিক ঠিক আমিটা আমার দেহ থেকে আলাদা। আমরা সবাই নিজেকে দেহ ছাড়া ভাবতেই পারি না, খুব হলে দেহ মন বুদ্ধি সবটাকে মিলিয়ে মনে করছি এটাই আমি। সাধনা মানে প্রথমে ধীরে ধীরে নিজের মনকে দেহ থেকে আলাদা করা। সারা দিন আমরা কত রকম কাজ করছি, একে গালাগালি দিচ্ছি, তাকে মিষ্টি কথা বলছি, কত বদমাইশি, হাসিঠাট্টা করছি, কিন্তু জপ করতে বসলে সব কিছু ধীরে ধীরে মন থেকে খসে যেতে থাকে, তখন মনে হয় ওকে গালাগাল না দিলেই ভালো হত, এত হাসিঠাট্টা করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু যেমনি জপ থেকে উঠে এলাম আবার সেই একই জিনিস শুরু হয়ে যাবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, হাতিকে যতই স্নান করিয়ে দাও আবার সে গায়ে ধুলো মাখবে। এইভাবে সাধনা করতে করতে যেদিন সমাধিবান পুরুষ হয়ে যাবে তখন আমি আর আমার দেহ আলাদা এই বোধটা স্থায়ী ভাবে হয়ে যাবে, আমি আর আমার দেহ এই দুটো আর কোন দিন এক হবে না। আমি আর আমার মন আলাদা, আমি আর আমার বুদ্ধি আলাদা, এটাই সমাধিবান পুরুষের বাস্তবিকতা হয়ে যায়। তিনি তখন দেখেন আমি হলাম শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, এটাই আমি, বাকি যা কিছু আছে আবরণের মত। এর জন্য সাধারণ লোকেদের সারা জীবন ব্যাপী বা অনেক জন্ম ধরে বিরাট

সাধনা করতে হয়, কিন্তু কিছু কিছু মহাপুরুষ আছেন তাঁদের এত করতে হয় না। রাজা জনক এই রকম ছিলেন, তিনি বিদেহ। যাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু শরীর এখনও চলছে, তাঁদের ব্যবহারটা পুরো আলাদা হয়ে যায়। তিনি জ্ঞানী কিন্তু দেহ থেকে আলাদা, নিজেকে আর দেহ মনে করছেন না, সেইজন্য তাঁদেরকে বলা হয় বিদেহ। যে কোন জ্ঞানী পুরুষকে বিদেহ বলা যেতে পারে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বিদেহ, স্বামীজী বিদেহ। কিন্তু বিদেহ এই শব্দকে বিশেষ ভাবে রাজা জনকের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। বিদেহ বলতে আমরা সবাই জানি রাজা জনক। কারণ তিনি ছিলেন আদর্শ, জ্ঞানী অথচ সাম্রাজ্য চালাতেন। বেদান্ত শাস্ত্রে বিদেহ মুক্তির কথা বলা হয়, বিদেহ মুক্তি খুব বিরল ব্যাপার। বিদেহ মুক্তি মানে, জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু শরীরটা থেকে গেছে, এর আরেকটা নাম জীবনমুক্তি। সচরাচর দেখা যায় বড় বড় জ্ঞানীদেরও মৃত্যুর ঠিক আগে জ্ঞান হয়। এটাই সাধারণ ধারণা, এই ধারণা ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মেও আছে, তারাও বলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। একমাত্র হিন্দু ধর্মেই জীবনমুক্তির উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্মও জীবনমুক্তিকে খুব গুরুত্ব দেয়। ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণেও বলা হয় যে মিথিলার রাজার উপর বর ছিল, এই বংশে অবিদেহ কেউ জন্মাবে না। মিথিলার রাজবংশে যাঁরাই জন্ম নেবেন তিনিই জ্ঞানী হবেন। সেইজন্য মিথিলার রাজাকে বিদেহ রাজ বলা হয়, আর পর পর মিথিলার যাঁরা রাজা হতেন সবারই নাম রাজা জনক, একটা পদের মত হয়ে গিয়েছিল। জনক মানেই হয় যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু সংসারে আছেন। কথামৃতে একজন ঠাকুরকে বলছেন, আমরা রাজা জনকের মত। ঠাকুর বলছেন, রাজা জনক কি এমনিই হওয়া যায়, তার আগে রাজা জনকের কত হেঁটমুণ্ডু তপস্যা ছিল।

রাজা জনকের খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে। শুকদেব জন্ম থেকেই জ্ঞানী, তাঁর পিতা ব্যাসদেব। ব্যাসদেব পুত্রকে সব শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাসদেবের শান্তি হচ্ছে না, ব্যাসদেবের মনে হচ্ছে শুকদেবের এখনও ঠিক ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, কারণ তিনি বাবা, বাবাকে আপন লোক মনে করছে। ব্যাসদেব তখন শুকদেবকে বললেন, তুমি রাজা জনকের কাছে যাও, তিনি তোমাকে শিক্ষা দেবেন। রাজা জনক জেনে গিয়েছিলেন যে শুকদেব তাঁর কাছে আসছেন। তিনি আগে থাকতেই দ্বারপালদের সব বলে দিয়েছেন কি করতে হবে। শুকদেব আসতেই দ্বারপালরা তাঁকে কোন গুরুত্বই দিল না। শুকদেব সাত দিন সাত রাত ওখানেই বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ একজন এসে বলল, আরে আপনি এখানে! শুকদেবকে খুব রাজকীয় সম্মান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা জনকের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, রাজা জনক শুকদেবকে বললেন, এই নিন এই তেল পূর্ণ পাত্র দিলাম, এই পাত্রকে মাথায় করে এই সভাকে প্রদক্ষিণ করে আসুন। সেখানে আবার রাজনর্তকীদের নৃত্য করার জন্য লাগিয়ে দিলেন। শুকদেব জন্ম থেকেই জ্ঞানী, ওনার কোন দিকেই হুঁশ নেই, তিনি মাথায় তেলের পাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করে এলেন। তখন রাজা জনক বললেন, আপনাকে আমার উপদেশ দেওয়ার কিছু নেই, তবে এখানে যখন এসেই গেছেন কিছু দিন এখানে অবস্থান করে যান।

এই জায়গাতেই আমাদের ধরতে হবে, এখানে ঈশ্বর দর্শন, জ্ঞান লাভ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? ঈশ্বর দর্শন মানে স্থির চিত্ত, একেবারে একাগ্র মন। এই জিনিসটাকেই রাজযোগে বলছেন *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, যোগ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ মানে, মনের মধ্যে কোন বৃত্তি নেই, মন absolutely one pointed। মন যে কেন্দ্রিত হয়, এটাই জ্ঞান। রাজা জনক এখন শুকদেবের সাথে আছেন। একদিন দুজনে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছেন, সেই সময় একটা রব উঠল, রাজমহলে আগুন লেগে গেছে। শুকদেব ত্যাগী পুরুষ, ওনার শুধু দুটো কৌপিন, একটা পড়ে থাকতেন আরেকটা ঘরে শুকোচ্ছে, এই দুটো কৌপিন ছাড়া শুকদেবের আর কিছু ছিল না। শুকদেব শুনলেন আগুন লেগেছে, তিনি দৌড়েছেন নিজের কৌপিনটা বাঁচানোর জন্য। রাজা জনক তখন হেসে বলছেন, *মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন*, পুরো মিথিলা

নগরী যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমার তাতে কিছু আসে যায় না। খুব নামকরা কথা, বলছেন পুরো জগতের যা কিছু হয়ে যাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। কেন আসে যায় না? কারণ আমি দেহ নই, দেহের সাথে আমার কোন একাত্ম বোধ নেই। এগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের কথা কোন সন্দেহই নেই, এসব কথা আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যতক্ষণ আমাদের দেহবোধ আছে, যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ সবারই খবর আমাদের নিতে হবে।

এই সেই বিদেহ নগরী, যার রাজা একজন আত্মজ্ঞানী, যে বিদেহ নগরের আসল নাম মিথিলা, সেই মিথিলাতে পিঙ্গলা নামে এক বণিতা বাস করত। পিঙ্গলার কাহিনী আমাদের বিভিন্ন সাহিত্যে, শাস্ত্রে ছড়িয়ে আছে। অন্য এক কাহিনীতে পিঙ্গলা নামে একটি মেয়ের টিয়া পাখি ছিল, সে টিয়া পাখিকে হরিনাম শেখাত, সেখান থেকে পিঙ্গলার জ্ঞান হয়ে যায়। এখানে বলছেন, পিঙ্গলার মিথিলাতে খুব নাম ছিল, যেমন বৈশালীতে আম্রপালী ছিল। আম্রপালী অবশ্য ঐতিহাসিক চরিত্র আর এখানে পিঙ্গলা একটি পৌরাণিক চরিত্র। বলছেন *সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতি। অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।।১১/৮/২৩।।* পিঙ্গলাকে দেখতে খুব রূপসী ছিল আর স্বেচ্ছাচারিণী ছিল, পিঙ্গলাকে কখনই কোন পুরুষ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। স্বেচ্ছাচারীর অর্থই হয় যে কাউকে মানে না। যেমন বাড়িতে বাবা-মা আছে তাদের কথা শুনবে না, দেশে রাজা আছে, তার কথা মানবে না। কিন্তু কোন স্ত্রীর জন্য স্বৈরাচারিণী বা স্বেচ্ছারিণী শব্দ যদি ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় তার স্বামী তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। এখানে সে বারবণিতা। সে কি করত? *কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতি*, এই লাইনটাই পরে অন্য ভাবে আসবে। পিঙ্গলা বাড়ির দরজার বাইরে সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। পরের শব্দটা ব্যবহার করছেন *সঙ্কেতোপজীবিনী*, যার অর্থ চোখের চাহনি দিয়ে নিজের জীবন নির্বাহ করা। খুব সেজেগুজে নিজের বাড়ির দরজার সামনে বা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে যেখানে খদ্দের পাওয়া যাবে। কিন্তু এদের চোখের চাহনিটাই অন্য রকম। চোখের চাহনি দেখলেই পুরুষরা বুঝতে পারে তার কি উদ্দেশ্য। ভালো লোকেরা তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যায়, গোলমেলে যারা তারা ওর কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকে। যারা ঘুরঘুর করে সঙ্কেতোপজীবিনীরা লোকটিকে মেপে নেয় তার ধন-সম্পদ আছে কিনা। যদি বুঝে যায় এর ধন-সম্পদ নেই তখন লোকটিকে এরা আর পাত্তা দেবে না।

সঙ্কেতোপজীবিনীদের নিয়ে অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। একজন ফরাসী সাহিত্যিকের একটা উপন্যাসে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি আবার খুব পতিব্রতা, তিনি একদিন এক সঙ্কেতোপজীবিনীকে দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন, দেখছেন মেয়েটি কি রকম চোখের চাহনি দিয়ে পুরুষদের ফাঁসাচ্ছে। সেটা দেখে মহিলার ইচ্ছে হল এর একটু নকল করে দেখলে হয়। নকল করতে করতে একজন পুরুষ মহিলার দিকে এগিয়ে এসেছে, খুব নিখুঁত নকল করছিল। লোকটি বলে গেল, ঠিক আছে আমি আসছি। মহিলাটি ভয় পেয়ে গেছে, তখন বলছে, না না আমি এসব করি না। এইবার নাটক শুরু হয়ে গেল। লোকটি ধরেই নিয়েছে মহিলাটি নিজের দর বাড়াবার জন্য এই রকম করছে। মহিলাটি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে গেছে, আতঙ্কে এখন লোকটিকে খুব করে আটকাচ্ছে। কিন্তু পুরুষটিও মহিলাকে ছাড়তে চাইছে না। বিরাট লম্বা কাহিনী। সঙ্কেতোপজীবিনীদের চোখের চাহনিটাই আলাদা, সব পুরুষ বুঝতে পারবে না, কিন্তু যারা এই লাইনে আছে, বিশেষ করে যারা ভোগী, যাদের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা প্রবল তারাই শুধু বুঝতে পারবে।

দত্তাত্রেয় বলছেন *মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ। তাঞ্জুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেহর্থকামুকা।।১১/৮/২৪।।* পিঙ্গলার উদ্দেশ্য পুরুষের সঙ্গ করা নয়, ধন-সম্পদের প্রতিই তার একমাত্র আকর্ষণ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, যখনই কোন পুরুষকে আসতে দেখছে তখনই ভাবছে লোকটি ধনী কিনা,

দ্বিতীয় *শুল্কদান্*, লোকটি আমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক মেটাতে চাইবে কিনা আর তৃতীয় লোকটি কামুক কিনা। এই তিনটে না থাকলে পিঙ্গলার মত মেয়ের কাজ হবে না। একজন লোকের টাকা থাকতে পারে কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না আর টাকা আছে, পারিশ্রমিকও দিতে রাজী কিন্তু মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, বাড়িতে কেউ মারা গেছে। তাকে কামুক হতে হবে, পারিশ্রমিক দেওয়ার মানসিকতা থাকা চাই আর তার পয়সা চাই। পিঙ্গলা কোন পুরুষকে দেখলেই মনে করত এ বিরাট ধনী এবং ধন দিয়ে সে তাকে উপভোগ করতে চাইছে। সে তার কলাকৌশল দেখাতে শুরু করে দিল। *আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী। অপান্যো বিত্তবান্ কোহপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ।।১১/৮/২৫।।* পিঙ্গলা হয়ত দেখল একজন পুরুষ এগিয়ে আসছে, আসার পর সেই পুরুষ যখন উপেক্ষা করে চলে যেত তখন পিঙ্গলার মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনটা ছটফট করতে শুরু করেছে, আশা করছে এবার হয়ত তার কাছে কোন ধনী পুরুষের আগমন হবে। *এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী। নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত।।১১/৮/২৬।।* অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেছে, *দুরাশয়া* পিঙ্গলাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে, কারণ রাত বারোটা হয়ে গেল এখন পর্যন্ত একটা খদ্দের সে পেল না। *ধ্বস্তনিদ্রা*, তার চোখের ঘুম উড়ে গেছে।

মহাভারত, ভাগবত বা কালিদাস, এনাদের যে ভাষা তাতে কিছু কিছু এমন সব শব্দের প্রয়োগ ও বিন্যাস থাকে তাতে, যে জিনিসটা বলতে চাইছেন সেটা এমন এক উচ্চস্তরে চলে যায় যে আলাদা করে বলার কিছু থাকে না। ওটাই সাধারণ কোন লেখকেরা করতে গেলে পুরোটাই কৃত্রিম মনে হবে। এখানে বলছেন, *এবং দুরাশয়া*, দুরাশা তাকে ঘিরে নিয়েছে আর *ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী*, বাড়ি প্রধান দরজাকে অবলম্বন করেই সে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ির ভেতরে আর যেতে পারছে না, ভাবছে এইবার বুঝি কেউ আসবে, তার ঘুমটাও উড়ে গেছে। *নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী*, কখন একটু ক্ষণের জন্য ভেতরে যাচ্ছে আবার বাইরে চলে আসছে। পিঙ্গলার অবস্থা খুব খারাপ, ওর দিব্য ভাবের বোধটাই পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার সময় স্বামীজীর জাহাজ কায়রোতে প্রায় বারো ঘন্টার মত দাঁড়াতে হয়েছিল। কায়রো শহরটা দেখার জন্য স্বামীজী আর তাঁর সঙ্গীরা ওই সময় জাহাজ থেকে নেমে শহরে ঘুরতে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে ওনারা কিভাবে রাস্থা ভুল করে ফেলেছেন। সব বন্দর এলাকার আশেপাশে অনেক রেডলাইট এরিয়া থাকে। নাবিকদের অনেক মাস ধরে জাহাজে কাটাতে কাটাতে ওদের মানসিকতাটা অন্য রকম হয়ে যায়, বন্দরের আশেপাশে এই ধরণের মেয়েরা থাকে। স্বামীজীরা পথ ভুলে ঐ ধরণের একটা এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। স্বামীজী দেখছেন বেশির ভাগ মেয়েরাই স্বল্পবাস, হাসাহাসি করছে, ইশারা করছে। সঙ্গীদের সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, তাই স্বামীজী প্রথমে বুঝতে পারেননি। সঙ্গীরা বুঝতে পেরে স্বামীজীকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তখন স্বামীজীর খেয়াল হল, আরে তাই তো আমরা এ কোথায় এসে গেলাম। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন নিজেকে সঙ্গীদের থেকে আলাদা করে নিলেন। যে মেয়েগুলো বেশি ইশারা করছিল স্বামীজী তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের কাছে যেতেই স্বামীজীর চোখ জলে ভরে গেছে। সঙ্গীরাও স্বামীজীকে আটকাবার জন্য পেছন পেছন এগিয়ে গেছেন। স্বামীজী তখন সঙ্গীদের বলছেন, দেখো! এদের ভেতরে যে দিব্যত্ব সেটাকে তার কিভাবে পুরোপুরি নিজেদের শরীরের উপর লাগিয়ে দিয়েছে, আর আজকে এদের কি দুরবস্থা! মেয়েগুলো স্প্যানিশ ভাষী ছিল, কিন্তু বুঝতে পেরে গেছে স্বামীজী কি বলতে চাইছেন। ওরা দৌড়ে এসে স্বামীজীর সামনে হাঁটু গেড়ে স্বামী জামার খোট ধরে চুম্বন করছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে Man of God। হৃদয় হৃদয়কে স্পর্শ করার দৃশ্য।

স্বামীজীর এই একটি কথা যদি মনে রাখা হয় তাহলে পিঙ্গলার ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে দিব্যত্ব আছে, দিব্যত্ব মানে sense of 'I'ness আমিত্ব বোধ। একটা যে এ্যটম তার মধ্যেও দিব্যত্ব আছে আর একটা সিংহের মধ্যেও দিব্যত্ব আছে, সবারই মধ্যে দিব্যত্ব আছে। সুন্দরী পতিব্রতা নারীর মধ্যেও দিব্যত্ব আছে আর একটা যে বারবণিতা তার মধ্যেও দিব্যত্ব আছে। যেটা দেখার তা হল এই দিব্যত্বকে সে কোথায় লাগাচ্ছে। যেখানে সে তার দিব্যত্বকে লাগাবে, সেখানেই সে উঠবে, কিন্তু ওঠার জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। যে কোন জিনিসেরই একটা মূল্য থাকে। দিব্যত্ব তাকে ওঠাবে, ঐ ক্ষেত্রে তাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যেমন একটা পাথর তার দিব্যত্বকে লাগিয়ে দেয় স্থবিরতাতে, আমাকে আর নড়তে চড়তে হবে না, আমি এভাবেই পড়ে থাকব। যদি কোন মুর্তিকারের কৃপাদৃষ্টি ঐ পাথরের উপর পড়ে যায়, তখন তিনি বলবেন এই পাথরকে আমি একটা মুর্তিতে দাঁড় করিয়ে দেব। তিনি দারুণ একটা মুর্তি বানালেন, সেই মুর্তি হয়ত কোন মিউজিয়ামে গিয়ে প্রশংসিত হচ্ছে বা কোন মন্দিরে সেই মুর্তির ঈশ্বরের বিগ্রহ রূপে পূজো হচ্ছে। পাথরের দিব্যত্বকে কেউ একজন পরিবর্তন করে দিলেন। এটা কেন হয় আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মানুষ যদি তার দিব্যত্বকে সৃজনশীল কার্যে লাগিয়ে দেয়, তখন তার ভেতর থেকে বিভিন্ন কবিতা, সাহিত্য, গান-বাজনা, ছবি বেরোতে শুরু হবে। আর দিব্যত্বকে যদি ছ্যাবলামোতে নামিয়ে দেয় তখন ছ্যবালামই হবে। কিন্তু ঐ দিব্যত্বকে যদি কেউ পুরোপুরি শরীরে নামিয়ে দেয়, তখন কি হবে? পুরো শহর তার পেছনে দৌড়াবে। তার সাজপোষাক খুব সুন্দর ফিটফাট, একেবারে উচ্চমানের হয়ে গেছে, কথাবার্তা তার এমন হবে যাতে মানুষকে আকর্ষিত করা যায়, যেখান দিয়ে যাবে মনে হবে যেন একটা সুগন্ধী ফুলের তোড়া চলে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই লোকজন সবাই তার পেছন পেছন যাবে। কিন্তু এর জন্য তাকে একটা মূল্য দিতে হবে। কিছু দিন পর দেখবে আগের মত অত লোক আর আমার পেছন পেছন আসছে না। তখন তাকে আরও কিছু করতে হবে, সেটার জন্য আরও কিছু করতে হবে, এইভাবে আরও কিছু, আরও কিছু করতেই থাকবে। এবার আস্তে আস্তে তার খদ্দের কমতে শুরু করবে। যে কোন লোকই যদি দেহের উপর নিজের দিব্যত্বকে ঢেলে দেয়, কত দিন আর দেহকে ধরে রাখতে পারবে! মেয়েরা মনে করে তাদের চোখের চাহনিতে জগৎ নাচছে। কিন্তু কত দিন? যে কোন মেয়েই, আঠারো থেকে শুরু হয়ে তিরিশ না পেরোতে পেরোতেই শেষ। যারা সঙ্কেতোপজীবিনী তাদের তিরিশের পর কি হবে? তিরিশের মধ্যে একেবারে একটা বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এদেরকেই স্বামীজী কায়রোর রাস্থায় দেখলেন, দেখে তাঁর চোখে জল বেরিয়ে এসেছে, এরা এদের দিব্যত্বকে নিয়ে কি করল!

যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় আমরা আমাদের দিব্যত্বকে কোথায় লাগিয়েছি? সত্যি বলতে আমরা কোথাও লাগায়নি, দিব্যত্ব যদি লাগাই সেখানে একটা massive passion থাকবে। যেটাতে দিব্যত্ব লাগাবে সেটাই তখন তার জীবন হয়ে যাবে। এটাকেই আমরা বলি জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন আমরা বলি One pointed, যখন বলছি জীবনের উদ্দেশ্য, তখন এগুলোই বিদেশী শব্দ হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ভাষায় বলা হয় তোমার ভেতরে দিব্যত্ব আছে সেই দিব্যত্বকে তুমি কোথায় লাগাচ্ছ। যেমন পাথরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার জীবনের লক্ষ্য কি, এর কোন অর্থই হয় না। কিন্তু পাথরের দিব্যত্ব স্বাভাবিক ভাবে লেগে আছে স্থবিরতায়, ভগবান বলছেন *স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ*, স্থবিরদের মধ্যে আমি হিমালয়। হিমালয়ের স্থাবরের মধ্যে তিনিই আছেন, তার মানে দিব্যত্ব আছে। কিন্তু দিব্যত্ব কিভাবে সে প্রকাশ করে? স্থবির রূপে, স্থৈর্য রূপে। কিন্তু যারা পুরো শরীরের উপর দিব্যত্ব দিয়ে রেখেছে তারা বলছে এটাই আমার জীবন, শহরের সব পুরুষকে আমি নাচিয়ে ছাড়ব। কিন্তু শরীরের সাথে দিব্যত্বকে জুড়ে দিলে তার পরিণতি স্বামীজীর এই ঘটনার মত হয়ে যায়। একটা অবস্থায় গিয়ে বলবে, এদের যে দিব্যত্ব এই দিব্যত্বকে কোথায় লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিল,

আজকে তার কি পরিণতি। এরা বারবণিতা, কিন্তু আগেকার দিনে নর্তকী বা গায়িকাদের কাজ ছিল নৃত্য বা গান দিয়ে ঈশ্বরকে খুশী করা, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হবে না। দিব্যত্বকে কোথাও লাগানো মানে সাধনা করা। একজন বারবণিতা কিসের সাধনা করছে? দেহসাধনা করছে। আমাদের অবস্থা আরও বাজে, আমাদের জীবনটা কিছুই না, সব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভেতরে যিনি অন্তর্যামী তাঁকে যতক্ষণ জীবনের কোন একটা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে লাগানো না হয় ততক্ষণ জীবনে কেউ উঠতে পারবে না।

পিঙ্গলার ঠিক একই পরিণতি, পিঙ্গলার যে দিব্যত্ব, তার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা, সেই চৈতন্য সত্তাকে সে লাগিয়ে দিয়েছে পুরুষদের ফাঁসানোতে। মেয়েদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক শক্তি, সেই কারণে আগেকার দিনে মেয়েদের দমিয়ে রাখা হত। তখনকার দিনে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে তাদের দিব্যত্বকে মাতৃত্বের মধ্যে ঢেলে দেওয়ার সুযোগ করে দিত। আগেকার দিনে পঁচিশ বছরের কোন মেয়ের কোলে শিশু দেখলেই তার মধ্যে মাতৃত্বের ভাব পরিষ্কার বোঝা যেত, মা বলে মনে হত আর এখনকার দিনে পঞ্চাশ বছরের মহিলাদের দেখলে মনে হয় আরেকটা বিয়ে করতে চাইছে, তাদের সাজগোজ, চোখের চাহনি, কথা বলা কোন কিছুর মধ্যে মাতৃত্বের ভাব নেই, মেয়েদের মধ্যে এতটা তফাৎ এসে গেছে।

দত্তাত্রেয় বলছেন *তস্য বিত্তাশয়া শুষ্যদ্‌বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ। নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ।।১১/৮/২৭।।* কিছু অর্থের আশায় পিঙ্গলা এখন দাঁড়িয়ে আছে। খুব উচ্চমানের সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া কাঞ্চনের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসা যে কোন মানুষের পক্ষেই খুব কঠিন। বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের অন্যান্য ইচ্ছাগুলো হয়ত চলে যায় কিন্তু তাকেও শরীরটা চালিয়ে যেতে হবে, শরীর চালানো মানেই খাওয়া-দাওয়া চাই, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা চাই, তার জন্য অর্থ চাই। আর সন্তান বা নাতিরা থাকলে তাদের খুশী দেখার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। আর যদি মনে করে একে ধরলে আমি কিছু টাকা পেতে পারি, তখন বড়লোকদের পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। ঠাকুরও মোসায়েবীর কথা বলছেন, মোসায়েবরা টাকার আশায় বড়লোকদের তোষামোদ করে। অথচ কোন টাকা আদায় করতে পারে না। যেমন যেমন রাত গভীর হচ্ছে তেমন তেমন পিঙ্গলার মনে দুরাশার ছায়া নেমে আসছে। আজ আর হয়ত কোন খদ্দের এল না। বিত্তবান পুরুষের আশায় অপেক্ষা করে করে পিঙ্গলার মুখ শুকিয়ে আসছে। *দীনচেতসঃ*, তার বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে, যোগের ভাষায় বলে তার বুদ্ধিটা পুরো দুঃখ বৃত্তিতে ঢাকা পড়ে গেল। তখন হঠাৎ তার এই বেশ্যাবৃত্তির উপর তীব্র বৈরাগ্য এসে গেল, এই বৈরাগ্য মানে বৃত্তিটার উপর ধিক্, এই ভাব এসে গেছে। এই ভাব আমাদের সবারই জীবনে বিভিন্ন সময় আসে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, দুই বন্ধু শহরে ঘুরতে এসেছে, একজন গেল ভাগবত কথা শুনতে আরেকজন গেল বেশ্যা বাড়ি। যে বন্ধু ভাগবত শুনতে গেছে, কিছুক্ষণ পর ভাবছে, সব মজা আমার বন্ধুই লুটছে আর যে বন্ধু গণিকা বাড়ি গেছে হঠাৎ তার দুঃখ বুদ্ধি এল, ছিঃ আমি কি করছি!

মানুষ মাত্রই নিজের স্বভাবে অবস্থিত থাকতে চায়, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সে শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত, মানুষের স্বভাবই হল তাই পরমানন্দ, মানুষের স্বভাবই হল চিরন্তন, সহজে মানুষ তাই মরতে চায় না। আর নিজেকে সব সময় শুদ্ধ পবিত্র রাখতে চায়, যদি নাও রাখতে পারে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র মনে করতে চায়। মানুষ নিজেকে সব সময় চৈতন্যবান মনে করে। মানুষ সব কিছুই মেনে নিতে রাজী, আমার টাকা নেই মেনে নেবে, আমার মান নেই মেনে নেবে কিন্তু আমার বুদ্ধি নেই কখনই মানবে না। যারা বলে আমার বুদ্ধি নেই, বুঝতে হবে কায়দা করে অহঙ্কার করছে। তেমনি মানুষ কখনই বন্ধনকে গ্রহণ করবে না। যেখানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিজেদের ভালোবাসায় বন্ধন তৈরী করে, সেই বন্ধনেও সে একটা মুক্তির আস্বাদ পায়, নিজের ডানা বিস্তার করতে পারে। ফলে, মানুষ যখন অপবিত্র কিছু করে, অশুদ্ধ কিছু করে তখন হঠাৎ তার

নিজের প্রতি ধিক্ এই ভাবনাটা আসে। এর উল্টোটাও কি হয়? পবিত্র থেকে অপবিত্রর দিকে যায়? অনেক কাহিনী আছে যেখানে দেখা যায় কোন সাধু বা সন্ন্যাসী কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেলেন। তবে তুলনা করলে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার দিকে বেশি মানুষ যায়। পবিত্র থেকে অপবিত্রে কেউ যেতে চায় না, আর যদি যায়ও, অপবিত্রতার দিকে যায় না, সে মনে করে ঐ জায়গায় গেলে আমার যে একটা বন্ধনের ভাব আছে সেটা সেটা ছাড়া পেয়ে যাবে। অনেক সময় অনুসন্ধিৎসা থাকে, পবিত্র থেকে অপবিত্র হতে চাইছে না কিন্তু ওর মনে একটা অনুসন্ধিৎসা জেগেছে, জিনিসটা কি, সেটাকে তাই অপবিত্র বলা যায় না। মানুষ যদি অপবিত্রতার মধ্যে থাকে, একটা সময় তার মনে ধিক্ ভাব জেগে উঠেবে, এসব আমি কি করছি।

পিঙ্গলারও ঠিক এই ভাবটা জেগেছে, 'এ আমি কি করছি'! যদিও এখানে কোন সন্দেহ নেই ওর মনে একটা চিন্তার উদয় হয়েছে, টাকার আশায় ছিল, কিন্তু পেল না, সেখান থেকে বৈরাগ্য, হতাশা আর দুঃখ থেকে বা যেভাবেই এই বৈরাগ্য এসে থাকুক, বৈরাগ্য সব সময় সুখেরই কারণ হয়। যেমন অমৃতের কুম্ভে যেভাবেই তুমি পড়ে গিয়ে থাকো, তুমি অমৃতই হবে। বৈরাগ্য যেভাবেই আসুক, বৈরাগ্য সব সময় সুখের কারণ হয়। গীতাতে অর্জুনের যে বিষাদ আর এখানে পিঙ্গলার বিষাদ, দুটো একই জিনিস। পিঙ্গলার মনে যে বৈরাগ্য এসেছিল তার পেছনে একটা চিন্তা, চিন্তা মানে একটা হতাশা। আসলে বৈরাগ্য সব সময় হতাশা থেকেই আসে। কিন্তু এই বৈরাগ্যই এমন তীব্র হবে যে সংসার বন্ধনকে একেবারে কেটে উড়িয়ে দেবে। বৈরাগ্যের জন্য যে হতাশা হতে হবে সেই হতাশারও তত জোর হতে হবে। যত বড় হতাশা তত বেশি বৈরাগ্য। তবে ঈশ্বর পথে যাওয়ার জন্য শুধু যে বৈরাগ্যই দরকার তা নয়, অন্যান্য কারণেও মানুষ ঈশ্বরের পথে আসে, গীতায় যেমন বলছেন, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থি। ঠাকুরের সাধনাও বৈরাগ্যপূর্ণ সাধনা ছিল না, ঠাকুরের সাধনা অন্য ধরণের। আর্ত, অর্থার্থি যে সেও আর্ত, যখনই কেউ কিছু চাইছে, তার মানে, তার অভাব হয়ে গেছে, সে আর্ত। যখন দেখে এই জগৎ থেকে আমার কিছুই পুর্তি হবে না, তখন সে ঈশ্বরের দিকে যায়। কিন্তু এখানে সে একেই গণিকা, সে খদ্দের ধরার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দের ধরতে চাইছে অর্থের জন্য, অর্থের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্থ এলো না, হঠাৎ তার হতাশা এসে গেছে। বলা হয় যে, তার পূণ্য ছিল বলে এই শুভ চিন্তা তার মধ্যে উদয় হল। আমাদের জীবনের যদি তাকাই, আমাদের জীবনটাও একটা দীর্ঘ হতাশার কাহিনী, কিন্তু আমাদের তো কিছুই বৈরাগ্য আসে না। ভগবান বুদ্ধ দেখলেন এক রুগী, এক বৃদ্ধ, এক মৃত ব্যক্তি আর এক সন্ন্যাসী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈরাগ্য এসে গেল। সেবা প্রতিষ্ঠানে গেলে এই চারজনকেই দেখা যাবে, বৃদ্ধও দেখা যাবে, রুগীও দেখবে, মরাও দেখবে আর সন্ন্যাসীকেও দেখবে, কিন্তু কজন বুদ্ধ হচ্ছে! তাহলে পিঙ্গলার কি করে বৈরাগ্য এলো? এখানে খুব সুন্দর বলছেন। জল বয়ে যাচ্ছে, সেই জলকে যদি বাধা দেওয়া হয় তখন সে ডান দিক দিয়ে বা বাম দিক দিয়ে নিজের পথ করে নেয়। যদি সুযোগ না পায় জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু জলের যদি গতি থাকে, সে সব কিছু বাধাকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে যাবে।

আঘাত মানুষের জীবনকে দু ভাবে প্রভাবিত করে, একটা কাঁচের মত আরেকটা স্টীলের মত। মানুষের ব্যক্তিত্ব যদি কাঁচের মত হয় তাকে সেখানেই শেষ করে দেবে, এরপর সে মৃতপ্রায়। ভেতরে যদি দম থাকে, লোহাকে আগুনে দেওয়ার পর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে লোহা যেমন স্টীল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আঘাতে মানুষের মনোবল আরও মজবুত হয়। বৃক্ষ থেকে বীজ পড়ে, বীজের খোসার মধ্যে কোন সার নেই, সে মাটিকে নিজের মত করে নেয়, আর ঐ বীজের খোসার মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেখান থেকে নতুন বৃক্ষ বেরিয়ে আসে। আমাদের জীবনে যখন হতাশা, নিরাশা, দুরাশা আসে, আমাদের দুমড়ে মুচড়ে দেবেই, কারণ ভেতরে কিছু নেই কিনা। গাছাপালা, কুকুর বেড়ালের সাথে মানুষের কিছুই তফাত নেই। তারাও খাওয়া-দাওয়া করে,

তারাও জন্মায়, তারাও মারা যায়। কিন্তু উপরের দিকে উঠতে হলে জীবনীশক্তি দরকার। জীবনীশক্তি তৈরীর অনেকগুলো পথ আছে, তবে কোন পথই সহজ নয়, সব পথেই খাটতে হয়। তখন যদি আঘাত প্রতিঘাত আসে মনে হয় যেন তাকে শেষ করে দেবে, কিন্তু শেষ করতে পারে না। সেখান থেকে একটা পুরো নতুন জিনিস অন্য একটা নতুন আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন বোঝা যায় না যে এই জিনিসটা সেই জিনিস। জীবনীশক্তি যদি ভেতরে থাকে তখন যতই নিরাশা আসুক, আঘাত আসুক, তাকে দেখে মনে হবে শেষ হয়ে যাবে, সেও নিজে মনে করবে আমি গেলাম, কিন্তু শেষ ও হয়ে যাবে না, ঠিক আবার উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু এবার যে দাঁড়াবে তখন আগের যে রূপটা ছিল ঐ রূপে থাকবে না, রূপটা পুরো পাল্টে যাবে। সেইজন্য সন্ন্যাসীদের সব কিছুই পাল্টে দেওয়া হয়, তাঁর পোষাক পাল্টে দেওয়া হয়, তাঁর চুল পাল্টে দেওয়া হয়, তার বাবা-মায়ের দেওয়া নামটাও পাল্টে দেওয়া হয়, বাবার স্থানটাও পাল্টে সেখানে তাঁর গুরু চলে আসেন। কারণ তখন তার সম্পূর্ণ আলাদা পরিচয় হয়ে যায়।

এখানে বলছেন, বৈরাগ্যের যে হেতু সেটা দোষের নয়, গিয়েছিল কটি টাকার জন্য, সেখানে তার অন্য রকম হয়ে গেল। ঠাকুরও বলছেন, কেউ যদি কাঁচ কুড়োতে গিয়ে হীরে পেয়ে যায় সেকি হীরে ছেড়ে দেবে? কখনই ছাড়বে না। ধ্রুব সাম্রাজ্য ফেরত পাওয়ার জন্য গিয়েছিল কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর দর্শন লাভ করে ভক্তি পেয়ে গেল। পিঙ্গলা কটি টাকার জন্য খদ্দেরের আশায় সেজেগুজে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল, সেদিন সে কোন গ্রাহক পেল না, তার মনটা অন্য রকম হয়ে গেল, বৈরাগ্যের উদয় হয়ে গেল। জগতের প্রত্যেকটি জীব মশা, মাছি থেকে মানুষ সবাই মুক্তির দিকে এগোচ্ছে, কারুর অনেক বাকি, কারুর কম বাকি। যাদের কম বাকি তাদের রূপান্তরটা পরিষ্কার বোঝা যায়, যাদের এখন অনেক বাকি তাদের রূপান্তরটা চোখে পড়ে না। দত্তাত্রেয় বিদেহ রাজ যদুকে বলছেন *তস্যা নির্বিন্নচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম। নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।।১১/৮/২৮।।* পিঙ্গলার এখন বৈরাগ্য এসেছে, এই বৈরাগ্যের জন্য তার একটা বোধদয় হয়েছে, এখনও জ্ঞান হয়নি কিন্তু বোধ এসেছে, সেই বোধ থেকে পিঙ্গলা একটা গান করতে শুরু করেছে। গানের বক্তব্য হল, মানুষ যেন আশারূপ ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলছে। ফাঁসির রজ্জু থেকে বাঁচার একটাই পথ একটা ক্ষুরধার তলোয়ার নিয়ে দড়িটাকে কেটে দেওয়া। গীতায় ভগবান বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা*, এই যে সংসার বৃক্ষ, এই বৃক্ষকে উন্মুলন করতে হলে বৈরাগ্য দিয়েই উন্মুলন করতে হবে। বাংলা সিনেমার গানে বলছে, কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে। তোমার নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে খেলা করাচ্ছে। কোথায় খেলাচ্ছে? বেদনার বালুচরে। ঐ দড়িটা কিসের? আশা। আশাই মানুষের জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানবজাতির যত উন্নতি সবটাই আশার দৌলতে। প্রকৃতির একটা অমোঘ নিয়ম হল, যে জিনিসটা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেই জিনিসটাই আমাদের পায়ের বেড়ি হয়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকার জন্য জীবনে অনেক স্থায়িত্ব আসে, আর ঐ সম্পর্কটাই মানুষকে বেঁধে ফেলে, এগোতে দেয় না। যে জিনিসটা আমাদের রক্ষা করে ঐ জিনিসটাই আমাদের বাড়তে দেবে না। একটা চারা গাছকে গরু ছাগলের থেকে বাঁচার জন্য একটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হল, বেড়ার জন্য চারা গাছটা বাঁচতে পারে। কিছু দিন পরে ঐ বেড়াটাই তার বন্ধনের কারণ হয়ে যায়। আশাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঐ আশাই এক সময় মানুষের পায়ের বেড়ি হয়ে যায়। একটা স্তরে গিয়ে ওটাকে কেটে দিতে হয়। মঙ্গল গ্রহে যে মহাকাশ যান পাঠানো হয় তাতে প্রথমে একটা বিরাট বড় রকেট থাকে, সেই রকেটটা মহাকাশ যানকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে নিয়ে যায়। এবার যদি রকেটের সাথে লেগে থাকে তখন অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে, সেইজন্য রকেটকে মহাকাশ যানটা ছেড়ে দিতে হয়। পোল ভল্টে একটা লম্বা ডাণ্ডা নিয়ে দৌড়ে এসে একটা উঁচু জায়গাকে লাফিয়ে পার

করে। ঐ ডাণ্ডাটা আছে বলে বিরাট উঁচুকে সে অতিক্রম করতে পারছে, কিন্তু ডাণ্ডাকে যদি ধরে রাখে তাহলে ঐ উঁচু জায়গাটা ডিঙাতে পারবে না, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ডাণ্ডাটা ছেড়ে দিতে হয়। ঠিক তেমনি আশাও মানুষকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, কিন্তু একটা জায়গায় পৌঁছে ওটাকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু আশাকে কি ছাড়া যায়? কখনই ছাড়া যায় না। যা কিছুই আমরা করি না কেন সবের পেছনে আশা লেগে আছে। কিসের আশা? নামযশের আশা, ভালোবাসা পাওয়ার আশা, আমার স্বীকৃতি চাই এই আশা। এই কথাই দত্তাত্রেয় বলছেন, *নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ*, এই আশা রজ্জুকে কাটার একটাই পথ, বৈরাগ্য রূপী তলোয়ার দিয়েই কাটা যায়।

দত্তাত্রেয় আবার বলছেন *ন হ্যাঙ্গাজ্জাতনির্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি। যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ।।১১/৮/২৯।।* হে রাজন্! এই শরীরের বন্ধন থেকে বেরোতে হলে তোমাকে বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হবে। আর বৈরাগ্যের অনুশীলন যদি না করা হয় তাহলে এই শরীর আর এই শরীরের সাথে যে নানান রকমের আবর্জনা জড়িয়ে আছে, এর থেকে কেউই বেরিয়ে আসতে পারবে না। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছে, সংসারে থেকে কি হবে না? ঠাকুর তাকে কি বলবেন! ঠাকুরের ধর্ম বেদের ধর্ম, বেদের ধর্মে দুটোই আছে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মও আছে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মও, সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, কেন হবে না। বলার পরেই আবার বলছেন, একটু সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস এগুলো করতে হয়। সাধুসঙ্গ আর নির্জনবাস মানেই তো বৈরাগ্য হয়ে গেল। সন্ন্যাসী মানেই তো বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ছাড়া সন্ন্যাসীর আর কি আছে। এখানে বলছেন, দেহের প্রতি বৈরাগ্য না এলে দেহের অশান্তি, সংসারের ঝামেলা থেকে ছাড়া পাবে না। দেহের প্রতি বৈরাগ্য না এলে কি রকম অসম্ভব? বলছেন, *যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ*, মানুষের বিজ্ঞান যদি না হয়ে থাকে, আত্মার জ্ঞান যদি না হয়ে থাকে তার মমতা অর্থাৎ আমি ভাব পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। অহংতা আর মমতা আমাদের শাস্ত্রের দুটো বহু প্রচলিত শব্দ, আমি ভাব আর আমার ভাব। আমি ভাব কাটে বৈরাগ্য দিয়ে আর আমার ভাব কাটে বিজ্ঞান দিয়ে। ভাগবত এখানে যদিও বলছেন বিজ্ঞান আর বৈরাগ্য দিয়ে অহংতা মমতা কাটে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আবার একটু অন্য রকম বলেন। দেহের প্রতি আসক্তি, তার সাথে দেহ কেন্দ্রিক যাবতীয় যা কিছু আছে তার যে আসক্তি, এই আসক্তি একমাত্র কাটে বৈরাগ্য দিয়ে। আর মমতা, আমার আমার ভাব, এই ভাব যাবে একমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা। কারণ আমরা সবাই অবস্তুর পেছনেই দৌড়াচ্ছি কিনা। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঈশ্বরই আছেন, সচ্চিদানন্দই আছেন, এই ভাব যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অবস্তুর পেছনে দৌড়ানটা বন্ধ হবে না। ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেলে মমতা চলে যাবে, তার আগে অহংতাটা যায় বৈরাগ্যে।

আসলে জ্ঞান আর বৈরাগ্য দুটো এক অপরের সাথে চলে। কেউ যদি বলে আমার বৈরাগ্য আছে কিন্তু জ্ঞান নেই, তাহলে বুঝতে হবে তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। পাগলদের সব কিছু থেকেই বৈরাগ্য, কিন্তু কিছুই জ্ঞান নেই। আর কেউ যদি বলে আমার জ্ঞান আছে কিন্তু বৈরাগ্য নয়, বুঝতে হবে সে পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলছে, মহা ধুর্ত, ঠগবাজ। যত বড় বড় বাবাজীদের দিনরাত নাম শুনছি, শুধু টাকা-পয়সা আর কামিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ বলে ব্রহ্মজ্ঞানী। কথামৃতের পাতায় পাতায় বলছেন জ্ঞানের প্রথম লক্ষণই হল বৈরাগ্য। যে কোন সাধু বা সন্ন্যাসী, তিনি যেই হয়ে থাকুন, এমনকি ঠাকুরও, যার জন্য ঠাকুর বলছেন, ঘরে যদি কোন মহিলা বেশিক্ষণ থাকে তাদের বলি, যাও মন্দির-টন্দির ঘুরে দেখ, আর যদি তাতেও না যায় আমিই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আসক্তি তো দূরের কথা, বাইরের আচরণেও যেন ধরা না পড়ে। বাইরে থেকেও যদি ধরা পড়ে সে একশ ভাগ গোলমেলে লোক। আর গোলমেলে লোক যদি বলে আমি পারছি না, চেষ্টা করছি এসব থেকে বেরিয়ে আসতে, সেটা তাও অনেক ভালো। কিন্তু যদি বলে, আমি জ্ঞানী, তাহলে বুঝে নিতে হবে

তার ইহকাল পরকাল দুটোই গেছে। জ্ঞান বৈরাগ্য একসাথে চলে। ভাগবতে প্রথমের দিকে নারদ বলছেন, ভক্তির দুটি সন্তান, জ্ঞান আর বৈরাগ্য। এখানে পূর্ণ বৈরাগ্যের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু একদিনেই তো পূর্ণ বৈরাগ্য হবে না। বৈরাগ্য তখনই হবে যখন একটু জ্ঞান হবে, ঈশ্বরের প্রতি তখন ভক্তি হবে। যেমন ঠাকুর বলছেন, দুটো সন্তান হয়ে গেলে ভাইবোনের মত থাকবে, যখন বার বার তার মাথায় এটা ঘুরতে থাকবে তখন তার বৈরাগ্য হয়ে যাবে, আমি বিয়েথা করেছি ঠিকই কিন্তু এবার ভাইবোনের মত থাকব। জ্ঞান হল বলে বৈরাগ্যটা এসেছে। যে কোন বৈরাগ্যের পেছনে একটা উচ্চ আদর্শ যদি না থাকে, এখানে উচ্চতম আদর্শ হল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরের জ্ঞান, এছাড়া যদি বৈরাগ্য হয় তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় গোলমাল আছে।

এই বলে তিনি পিঙ্গলা যে গান করছে সেই গানের কথাগুলো বলছেন *অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ। যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা।*।১১।৮।৩০। পিঙ্গলা এখন ভেঙে পড়েছে। আমাদেরই সবারই এই একই অবস্থা হয়, যখন একটা কিছুর খুব আশা করছি, তখন নিজের উপর কোঁদল করতে শুরু করে। কিন্তু সবাই নিজের উপর নেয় না, এখানে নিজের উপর নিচ্ছে। 'ছিঃ ছিঃ আমি কি রকম মোহগ্রস্ত হয়ে গেছি, ইন্দ্রিয়ের বশে অবশ হয়ে পড়েছি। আর আমার মোহের কি বিস্তার দেখ, দুষ্ট পুরুষ যারা তাদের পাল্লায় পড়ে আমার কি দুরবস্থা। যাদের কোন অস্তিত্বই নেই, অস্তিত্বরহিত এই বিষয় সুখের লালসায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, কি দুঃখের কাণ্ড! আমি সত্যিই মুর্খ'। অস্তিত্ব কার আছে? যে জিতেন্দ্রিয় তার অস্তিত্ব আছে। ইয়ং ছেলেদের হাতে এখন প্রচুর টাকা এসে গেছে, এদের অস্তিত্ব কোথায়! একবার যখন ভোগের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এই ধরণের গণিকাদের কাছে যাচ্ছে সব রোজগারের টাকা সেখানেই ঢেলে দিচ্ছে, সেখানেই তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেল। কথামৃতেও বর্ণনা আছে। ঠাকুরের শরীর যাবার পর একজন ভক্ত এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল। তার সবই হরণ হয়ে গিয়েছিল। সবই চলে যাওয়ার পর রিক্ত অবস্থায় সেই মেয়ের কাছেই আবার গেছে। ভক্তটি ভাবত মেয়েটি এখনও আমাকে ভালোবাসে, তাই আবার গেছে। মেয়েটি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই অবস্থায় অর্ধ বস্ত্রে বরানগর মঠে এসে সে হাজির হয়েছে। পুরুষ দেখছে মেয়েরা এই রকমই করে। আবার মেয়েরা দেখছে এই পুরুষগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই! যাদের কোন অস্তিত্বই নেই এদের জালে গিয়ে আমি ফেঁসে গেলাম। পিঙ্গলার গানেও এই আক্ষেপ, অনুশোচনা ও বেদনার সুর ফুটে উঠেছে।

পিঙ্গলা গণিকা, পিঙ্গলা চাইছে ভোগ। ভোগের জন্য তার টাকার দরকার। ফরাসী সাহিত্যে খুব নামকরা একজন লেখক ছিলেন, তাঁর নাম এমিল জোলা। এমিল জোলার একটা নামকরা বই আছে 'নানা'। নানা একটা মেয়ে, পেশা তার গণিকা বৃত্তি। একটা গণিকার জীবন কেমন হয় সেই নিয়ে লেখা, রীতিমত মোটা বই আর ফরাসী সাহিত্যে নানা উপন্যাসকে ক্লাশিক সাহিত্য বলা হয়। একটা গণিকার কাছে শেষ পর্যন্ত কে যায় বা গণিকাকে টাকা-পয়সা কে দেবে? সাধারণ ভাবে সিনেমা, উপন্যাসে দেখানো হয়, বিরাট দুঃখ, হতাশায় মানুষ শেষে কোন গণিকার কাছে যায়। সত্যিই কি জীবনে তাই হয়? দশ হাজারের মধ্যে একটাও এই ধরণের লোক পাওয়া যাবে না। যে পুরুষগুলো যায় সব কটাই বদমাইশ হয়, আর আরও যেটা দুর্ভাগ্যের, এই লোকগুলো যে টাকা উপার্জন করেছে, হয় সে ন্যায় ভাবে উপার্জন করেছে নয়তো অন্যায় ভাবে উপার্জন করেছে, উপার্জন করার দুটোই পথ। অন্যায় ভাবে করেছে তার মানে ঘুষ নিয়ে, অপরকে কষ্ট দিয়ে, চোরাপাচার করে আয় করেছে, সেখানে একেই সে অধর্ম পথে চলে গেছে আর সেই টাকা ওড়াচ্ছে একটা গণিকাকে ভোগ করার জন্য। আর সেই মেয়েটি অন্যায়োপার্জিত অর্থ নিয়ে ভোগ করতে চাইছে। আর যদি সে ন্যায় ভাবেও টাকা আয় করে থাকে, সেই টাকা দিয়ে তার স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান এদের পরিপালন করবে, তার অতিথি সেবা আছে, দেব সেবা আছে কিন্তু সেই টাকা একটা গণিকার পেছনে গিয়ে ওড়াচ্ছে। এর থেকে আর দুর্ভাগ্যের কি আছে। ধর্মের

বাইরে গিয়ে যে টাকা ওড়ায়, দুষ্ট পুরুষ ছাড়া সে আর কিছু হতে পারে না। পিঙ্গলা তাই বলছেন, আমি এই দুষ্ট পুরুষদের আশায় এভাবে আমার জীবনটাকে নষ্ট করছি। আমি কি করছি? একটা দুষ্ট পুরুষের কামনা, লালসার তুষ্টি সাধন করে যাচ্ছি।

পরের শ্লোকে পিঙ্গলা বলছে, *সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়। অকামদং দুঃখভয়াদিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা।।১১/৮/৩১।।* পিঙ্গলার কাহিনীতে এটি একটি খুব মূল্যবান শ্লোক। আমি কি রকম মুর্খ মেয়ে, যিনি আমার সব থেকে কাছে আছেন, যিনি *রমণং রতিপ্রদং*, *রতিপ্রদং* মানে যিনি সুখ দেন, যেখানে মানুষ ক্রিয়ার মাধ্যমে রমণ করে সুখ পায়, মনটা ওর মধ্যেই পুরো ডুবে যায়, *রতিপ্রদং* মানুষের শ্রেষ্ঠতম যে আনন্দ, সেই আনন্দ একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। *বিত্তপ্রদং*, তিনি পরমার্থের প্রকৃত সম্পদদাতা, *নিত্যম্* তিনি নিত্য। *রমনং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং* এর সব কটির সাথে নিত্যকে লাগিয়ে দিলে তখন হয়ে যাবে, যিনি সত্যিকারের, বাস্তবিক চিরস্থায়ী সুখ, আনন্দ, বিত্ত প্রতিক্ষণ দেন। কি সম্পদ দেন? যে সম্পদে বাস্তবিক আনন্দ আসে। তিনি কে? আমার যিনি অন্তর্যামী, যিনি ভগবান। মানুষের সুখের যে শ্রেষ্ঠতম অবস্থা, সেটা তার ভেতরেই আছে। এই সুখ কেউ তার থেকে কেড়ে নিতে পারে না। তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে পারে, তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারে, কিন্তু তার চিন্তার জগৎ থেকে তাকে কেউ সরিয়ে দিতে পারবে না। এগুলোকে নিয়ে অনেক লেখকরা উপন্যাস লিখেছেন। বিখ্যাত জার্মান লেখক Erich Maria Remarqueএর একটা নামকরা বই All quite on Western Front, সেখানে লেখক দেখাচ্ছেন কিভাবে মানুষকে বন্ধনে রেখেও তার চিন্তার জগতকে ভেঙে দেওয়া যায়। হয়ত ঠিকই বলছেন, কারণ তারা এগুলোকে কাছ থেকে দেখেছেন। কিন্তু সচরাচর এটা করা খুব কঠিন। একজন খুব নামকরা রাশিয়ান গাণিতজ্ঞ ছিলেন, বিভিন্ন কারণে বিশ্বাবিদ্যালয় তাঁর উপর রেগে গিয়ে শাস্তি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাথরুম পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। অথচ তিনি তখন বিশ্বের একজন অন্যতম সেরা গাণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে কোন কাগজ কলমও ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। একদিন দুদিনের জন্য নয় বছর এই শাস্তি বহাল ছিল। তিনি কি আর করবেন, বাথরুমের দেওয়ালে অঙ্ক করে রেখেছিলেন। পরে ঐ অঙ্কগুলোকে নিয়েই খুব নামকরা অঙ্কের বই তৈরী হয়েছিল। লোকমান্য তিলকও জেলে বন্দী ছিলেন, তিনিও জেলের দেওয়ালে পুরো গীতার ভাষ্যকে 'গীতা রহস্য' বইয়ে লিখে দিলেন। বড় চিন্তক যিনি তাঁকে বন্ধনে রেখেও আটকানো যায় না। তার নিজের ভেতরে যে সুখ সেটাকে কি করে কেউ কেড়ে নেবে! স্বামীজী গ্রীক কাহিনী বলছেন, যেখানে আলেকজাণ্ডার ব্রাহ্মণকে বলছেন, তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব না গেলে তোমাকে শেষ করে দেব। ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা জীবনে বলনি। তিনি মৃত্যুকেই জয় করে নিয়েছেন। তবে এনারা তাঁদের লেখাতে দেখান মৃত্যু খুব সহজেই হয়ে যায়, একটা কোপ দিলেই শেষ। কিন্তু বছরের পর বছর তার উপর শারীরিক মানসিক নিপীড়ন করা হবে, ঐটাকে সহ্য করে নেওয়া সহজ নয়। শারীরিক নিপীড়ণের কষ্টকে সহ্য করা সত্যিই কঠিন। যাই হোক, পিঙ্গলা বলছে, আমার যিনি সব থেকে কাছের, যিনি আমার অন্তর্যামী রূপে আমাকে নিত্য সুখ দিচ্ছেন, শান্তি দিচ্ছেন, সুখ শান্তি রূপী সম্পদ দিচ্ছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কি করেছি? *অকামদং দুঃখভয়াদিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা*, যিনি অন্তর্যামী তিনি আমাদের সব সুখ দিচ্ছেন, সেই সুখ ছেড়ে দিয়ে আমরা কি করছি, *অকামদং*, পিঙ্গলা বলছে যে পুরুষদের সেবায় আমি নিজেকে নিয়োজিত করছি এরা কেউই আমার একটি ইচ্ছাকেও পূর্ণ করতে পারে না। *দুঃখভয়াদিশোকমোহপ্রদাং*, উল্টে দুঃখ, ভয়, শোক, মোহ, ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সত্যিই আমি কি মুর্খ, যাঁর কাছে নিত্য সুখ তাঁকে ছেড়ে এই পুরুষগুলোর জন্য আমি দুঃখ, ভয়, শোক, ব্যাধিতে হাবুডুবু খাচ্ছি!

হিন্দী কবি ফণিশ্বর রেণু বাংলা জানতেন, উনি একজন বাঙ্গালী মহিলাকে দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সাথে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ হয়। উনি পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রায়ই যেতেন। ঠাকুর যে রসে বসে থাকার কথা বলছেন, এটাকে হিন্দীতে তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন '*রসমে বসমে তিন দিন*'। কবিতার বক্তব্য হল, পাটনা আশ্রমে ঠাকুরের উৎসব হয়েছে, তিন দিনের উৎসব। উনি তিন দিনই আশ্রমে এসেছেন, দুপুরে খিচুড়ি খাচ্ছেন, বিকেলে ধর্মসভায় ভাষণ শুনছেন আর রাত্রে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখছেন। উনি রাত্রে একটু মদ খেতেন। উনি লিখছেন, ঠাকুর তাঁকে নর্দমার নরক থেকে তুলে কিভাবে আশ্রমে নিয়ে ফেলেছেন আর তিন দিন আনন্দ রসে ডুবে ছিলেন। তৃতীয় দিনের বর্ণনা করার পর বলছেন, সব শেষ হয়ে গেল, আমি আবার ফেরত চললাম আমার সেই নোংরা নর্দমায়। একদিকে আছেন অন্তর্যামী, যাঁর চিন্তন করে চিরন্তন শাশ্বত আনন্দ পাওয়া যায়, সেটাকে ছেড়ে আমি এই নোংরা পাঁকের মধ্যে সুখ খুঁজতে গিয়ে পেলাম দুঃখ, ভয়, শোক, মোহ আর ব্যাধি।

এই ভাবকেই পিঙ্গলা আবার পরের শ্লোকে বলছেন *অহো ময়াহহত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্তয়া। স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোহনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী।। ১১/৮/৩২।।* আমাদের সমাজে দুটো বৃত্তিকে খুব খারাপ বৃত্তি বলা হয়, কোন মেয়ে যখন টাকার জন্য কোন লোককে ফাঁসায়, মানে বেশ্যাবৃত্তি, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আরেকটা অত্যন্ত নিন্দনীয় হল সাধুরা যখন বড়লোকেদের সঙ্গ করে। পিঙ্গলা এটাই বলছে, কি আক্ষেপের কথা যে আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছি আর অনর্থক আমার শরীর মনকে কষ্ট দিয়েছি, আমার শরীরটাই বিকিয়ে গেল আর যারা লম্পট লোভী এবং সমাজের নিন্দনীয় পুরুষ তারা এই শরীরটাকে কিনে নিয়ে শুধু খেলা করে গেল। আমি এতই মুর্খ যে এই শরীর দিয়েই অর্থ এবং রতিসুখ কামন করেছি।

পিঙ্গলা কেন শরীরের নিন্দা করছেন বলছেন। ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার বৈরাগ্য চিন্তনের উপায়ের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, ভেবে দেখ এই নারী শরীরে কি আছে। ঠাকুরের কাছে পুরুষরা বেশি যেতেন বলে নারী শরীরের কথা বলছেন। কিন্তু নারীও ঠিক এভাবেই পুরুষের শরীরকে বিচার করবে। ভাগবতে পিঙ্গলা নিজের শরীরের কথা নিয়েই বলছে, এই শরীরে কি আছে, শরীরটাকে যদি একটা বাড়ি রূপে ভাবা হয় তাহলে এই শরীরের নয়টি দরজা, বাড়ি করার সময় মানুষ বাঁশ কাঠ সব সোজা করে লাগায় কিন্তু আমাদের শরীরের হাড়গুলো ট্যারা বাঁকা করে লাগানো। চামড়া, লোম, নখ দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মানুষের বাড়িতে কত দামী দামী সম্পত্তি থাকে কিন্তু এই শরীরে মলমূত্র ছাড়া কিছু নেই, শরীরের সম্পদ বলতে মলমূত্র। আমি ছাড়া আর কোন মুর্খ নারী আছে যে এই শরীরের এত সেবা করবে। এগুলোই বৈরাগ্য পূর্ণ কথা, যখন বৈরাগ্য আসে তখন জাগতিক সব জিনিসকে এভাবেই দেখে। যখন ভোগে থাকে তখন ভোগ রূপে দেখে। আর যদি আত্মদৃষ্টিতে দেখা হয় তখন এটাও নয় ওটাও নয়, কিছুই নয়, যা আছে তা আছে। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শেষের দিকে একদিন নিজের হাতে হাত বুলাতে বুলাতে হাতটাকে দেখছিলেন। ওনার সেবক মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কি দেখছেন? মহারাজ খুব আস্তে করে বললেন, দেখছি, কেমন দেবতার শরীর। সেবক আবার জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কি বললেন? মহারাজ বলছেন, ও কিছু না। কারণ এই শরীরকে আশ্রয় করে সাক্ষাৎ আত্মা আছেন, ভগবান নারায়ণ নিজে এটাকে আশ্রয় করে আছেন। শরীরকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাধনা করতে করতে ঠাকুরের শরীরটাও ভেঙে গেল। একদিন ঠাকুরের শুধু মল বিসর্জন হয়ে যাচ্ছে। সারাটা দিন ধরে ঝাউতলার দিকে দৌড়াচ্ছেন। কোন ভাবে সংক্রামক হয়ে

গিয়েছিল। অত মল দেখে ঠাকুর বলছেন, শরীরে শুধু এই আছে! আর এই শরীরকে নিয়েই লোকের এত অহঙ্কার। এগুলো এক একটা মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

পিঙ্গলা বলছে, *বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ। যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাৎ কামমচ্যুতাৎ।। ১১/৮/৩৪।।* আমি মিথিলার মেয়ে, যে নগরীকে বিদেহ নগরী বলে, আমি সেই বিদেহ নগরীর মেয়ে অথচ কি দুর্ভাগ্য আমি দেহের ব্যবসা করছি, আমি সত্যিই অধম। এখানে পিঙ্গলা ঐতিহ্যকে নিয়ে আসছে। যদি এই ঐতিহ্য বোধটা পিঙ্গলার না থাকত তাহলে তার যে দুরাশা থেকে হতাশা এসেছে আর হতাশা থেকে একেবারে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেছে, সেখান থেকে তার উঠে আসাটা খুব কঠিন হয়ে যেত। ঐতিহ্যটা তাকে ধাক্কা দিয়েছে। নিজের ঐতিহ্য যদি জানা থাকে তাহলে জীবনে যদি কোন ধাক্কা আসে তখন হঠাৎ একটা চেতনা জাগবে, আমি কোন বংশের, আমি আগে কাদের সঙ্গ করেছি। শ্রীমার ভাইঝি রাধু সারা জীবন পাগলামি করে গেছে, মাকে কষ্টই দিয়ে গেল। মায়ের শরীর চলে যাবার পর রাধুর ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রাধুর মৃত্যুর সময় যখন এসেছে তখন সবাই বলল, রাধুকে কাশী নিয়ে যাওয়া যাক। রাধু কিভাবে বুঝে গিয়েছিল যে তাকে কাশীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাধু হঠাৎ একদিন বলছে, আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে হবে না, তোমরা ভুলে যেও না আমি মায়ের মেয়ে। পিঙ্গলাও বলছে আমি বিদেহ নগরের মেয়ে, কিন্তু আর না, এই বিষয়ভোগ আর অস্থির চিত্ত পুরুষদের স্বরূপ আমার জানা হয়ে গেছে। মেয়েদের নামে যেমন বলা হয় ছেলেদের নামেও বলা হয়। নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে অপরের স্ত্রীর কাছে যাচ্ছে, তাকে ছেড়ে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে, অস্থির চিত্ত না হলে কেউ এমন করতে পারে! আসলে কোন নারীকে ভোগ করার পর যখন তার মন ভরে যায় তখন সেই নারীর মুখ দেখলেই ভেতরটা গিজ্‌গিজ্‌ করতে থাকে। ছেলেদের এই সমস্যা আছে। কিন্তু যে ধর্ম ভাবে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী তার তো আর কোন পথ নেই। যে পুরুষের কাছে বাবা-মা ছেড়ে দিয়েছে তাকে ছেড়ে আর কোথায় যাবে! কিন্তু গণিকারা নিজেকে বিক্রী করে বেড়াচ্ছে। কার কাছে? অস্থির চিত্ত পুরুষের কাছে। কেন বিক্রী করছে? দুটো টাকা আয় হবে তাই দিয়ে আরও ভোগ করবে। এই সব দেখে পিঙ্গলার মনে ধিক্কার এসে গেছে। হতাশা, দুরাশা থেকে হঠাৎ তার মধ্যে চৈতন্য জেগে গেল।

পিঙ্গলা তখন বলছে 'অনেক হয়েছে, অনেক পুরুষের কাছে আমি নিজেকে বিক্রী করেছি, আর না'। *সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্। তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা।।১১/৮/৩৫।* আমার হৃদয়ে যিনি আত্মা ইনিই আমার পরম সুহৃৎ। *প্রেষ্ঠতমো*, তিনি সমস্ত প্রানীর সুহৃৎ, তাঁর মত শ্রেষ্ঠ হিতৈষী আর কেউ নেই। তিনিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু। আমি ঠিক করেছি আমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে এবার আমি নিজেকে বিকিয়ে তোমাকে কিনে নেব। এতদিন আমি যে খদ্দের খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিন গ্রাহক ধরার জন্য আমি যেসব কাজ করছিলাম, তাতে একটা পুরুষকে আমার শরীর দিচ্ছিলাম বদলে তার কাছ থেকে ওর টাকাটা নিয়ে নিতাম। এই আজ থেকে ঠিক করে নিলাম, আমার শরীর, আমার মন, আমার যা কিছু আছে সব আমার অন্তর্যামীকে দিয়ে দিলাম আর তার বদলে আমি তাঁকে কিনে নেব। তার মানে, পিঙ্গলা তার সব কিছুই তার অন্তর্যামীকে সমর্পণ করে দিল। সমর্পণ করার পর কি হবে? *রমেহনেন যথা রমা*, লক্ষ্মীদেবী যেভাবে ভগবান বিষ্ণুর সাথে রমণ করেন, আমিও আজ থেকে আমার অন্তর্যামীর সাথে ঐভাবে রমণ করব।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে বিয়ের সময় ছেলেকে মেয়ে বলে তোমাকে আমি এত পণ দিয়ে কিনে নেব যে তুমি অন্য কোন মেয়ের কাছে যেতে পারবে না। আবার মেয়েরা বলে ভালোবাসা দিয়ে ওকে কিনে নেব। মীরাবাঈ বলছেন আমি নিজে থেকেই তাঁর দাসী হয়ে গেছি। দাসী হওয়া মানে তাকে কিনে নিতে হবে। একটা মানুষকে কিনে দাস বা দাসী করতে গেলে টাকা লাগে, জিনিস কিনতে গেলে যেমন টাকা লাগে।

মানুষকে কিনতে গেলেও একটা মূল্য দিতে হয়। সেই মূল্যটা কি? ভালোবাসা। জগতে সব সময় কেনাবেচাই চলছে। পিঙ্গলা বলছে আমি কিনব। কাকে কিনবে? আমার যিনি অন্তরাত্মা, অন্তর্যামি। কি দিয়ে কিনবে? সব কিছু বিক্রী করে, যা কিছু আছে সব বিক্রী করে দেব। এটাই সন্ন্যাসীর ভাব। সন্ন্যাসী নিজের আত্মাকে কীভাবে কিনে নেয়? সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে। এটাই হল মূল্য দেওয়া। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে অসঙ্গ হয়ে গেল। এর আগে যে এত কিছু বলা হল সেটাতে একটা প্রস্তুতি দিলেন, মূল হল এই পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোক। আমি আজ পর্যন্ত যে ব্যবসা করছিলাম, সেই ব্যবসায় আমার শরীর দিচ্ছিলাম, পুরুষদের থেকে টাকা নিচ্ছিলাম, আজ থেকে আমি এই শরীরটা আমার অন্তর্যামীকে দিয়ে দিলাম। পিঙ্গলা এখনও সাজগোজ সবই করবে, কিন্তু যেটাই করবে তার অন্তর্যামীর জন্যই করবে। আমিও রমণ করব, প্রেম আমিও করব। কার সঙ্গে করবে? অন্তর্যামীর সঙ্গে। কিভাবে করবে? যেভাবে লক্ষ্মীদেবী ভগবান বিষ্ণুর সাথে করেন। এগুলোকে একটা শ্লোকে বা কাহিনীতে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়, কিন্তু জীবনে নামানো প্রায় অসম্ভব। গীতায় যেমন আর্ত, অর্থার্থি আর জিজ্ঞাসুর কথা বলছেন, যে অর্থার্থি যার অনেক টাকা-পয়সা পাওয়ার ইচ্ছে আছে, তারা যদিও কোন ভাবে ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে যায় কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি পাওয়াটা কঠিন, কারণ ভোগ তাকে ভক্তি থেকে টেনে নামিয়ে আনে। জিজ্ঞাসু হয়ে ঈশ্বরের পথে আসার সংখ্যাও খুব কম আর আর্ত সারা জগতে ছড়িয়ে আছে।

সংসারে কেউ নেই যার দুঃখের অবসান হয়ে গেছে, সবাই দুঃখের মধ্যে পড়ে আছে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম করে দুঃখ থেকে উঠে আসবে সেটাও সম্ভব নয়। কারণ জগতে কোন কিছুই পুরোপুরি একা চলে না, দুঃখ থাকলেও কিছুক্ষণের জন্য একটু সুখও এসে যায়। কাঙালী, ভিখারীরা একটা ভাঙা পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আমরা মনে করি আহা এদের কত দুঃখ, দুঃখের পরিসীমা নেই। কিন্তু তারও একটা প্যাটার্ন আছে, সেও জানে আমি যে সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, তিন দিন অন্তর আমি পাঁচটা টাকা পেয়ে যাব, ওর হিসেব করা আছে। কোন কারণে যদি না পায়, দেখা যাবে তিন দিনে না পেয়ে চতুর্থ দিনে পেয়ে গেল, এটাই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই যে একটু আশা, আশার কিরণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ঈশ্বরের দিকে মন যাবে না। এত দুঃখ কষ্ট চারিদিকে কিন্তু কারুরই ঈশ্বরের দিকে মন যায় না, কারণ ঐ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আশার কিরণ জ্বলছে। আর একটু ভালো যদি চলে তাহলে তো ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে, গোঁফে তা দিচ্ছে, এদের দ্বারা কোন দিন হবে না। যাদের এই বোধ হচ্ছে বেশ আছি, এদের কোন দিন হবে না। এগুলো কোন নিরুৎসাহিত করার কথা নয়, এটাই একেবারে কঠোর বাস্তব। ঠাকুর বলছেন, কলকাতার লোকগুলো এসে বলে আমাদের কি হবে না, যদি বলে দেওয়া হয় কিছু হবে না, তাহলে এদিকে আর আসবে না, তাই বলে দিই হবে না কেন তবে এক হাতে কর্ম কর আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধর, কর্ম যখন আর থাকবে না তখন দু হাতে ঈশ্বরকে ধর। তাতেও কি কিছু হয়েছে? মানুষ যেমনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ছিল এখনও তেমনি আসক্ত হয়ে আছে।

একদিন সন্ন্যাসীরা খাওয়ার পর ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে মুখ ধোওয়ার জন্য গেছেন, সব সন্ন্যাসীরা এক সঙ্গে এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মিলিয়ে প্রায় পাঁচশ জন। সেখানে একজন মহারাজ অন্য এক মহারাজকে মজা করে বলছেন, ভাই! একবার ভেবে দেখ তো, হঠাৎ যদি ভারতবর্ষে পাঁচশ জন ব্রহ্মজ্ঞানী দাঁড়িয়ে যান তাহলে ভারতবর্ষের কি হবে! এর মানে কি? অসম্ভব, ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন নেউলের লেজে ইট বাঁধা আছে। গৃহস্থই হোক, সন্ন্যাসীই হোক, যেই হোক সবার লেজে ইট বাঁধা। সংসারীরদের লেজে অনেক বেশি ইট বাঁধা, সন্ন্যাসীদের অবশ্যই তার তুলনায় কম। খুব কঠিন, ঈশ্বরের দিকে মন যেতে চায় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে উপায় কি? ঠাকুর তখন বলছেন, কেন, গীতায় বলছেন

অভ্যাস, অভ্যাসযোগ। এখানে একটা কাহিনীর মাধ্যমে একটা ভাবকে বোঝাতে চাইছেন, মানুষের মনে যখন দুঃখ-কষ্ট হয় তখন সে কোথায় যাবে? ভগবান ছাড়া তো তার কেউ নেই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়া অসম্ভব। এই জপ করে যাচ্ছে, গতানুগতিক ভাবে প্রার্থনা, উপাচারাদি করে যাচ্ছে, করতে করতে কিছুটা যদি হয়। উইলিয়ম জেমস্ খুব নামকরা দার্শনিক আর মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন। The Varieties of Religious Experiences ওনার একটা খুব নামকরা বই, সেখানে উনি sudden conversion এর কথা বলছেন। ঠাকুরও হঠাৎ সিদ্ধের কথা বলছেন, এখানে ঠিক সিদ্ধির কথা বলছেন না। অনেকে সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস কর, আপনি কি করে সাধু হলেন। আমরা যদি একটু ক্ষণের জন্য ভাবি, পিঙ্গলা যতক্ষণ ধরে এইসব কথা ভাবছে আর হঠাৎ যদি সেই সময় কোন বড়লোক খদ্দের এসে যেত তখন পিঙ্গলার কি হত? তখন এই বৈরাগ্যটা থাকত কিনা বলা খুব মুশকিল। এখানে কাহিনী রূপে আসছে বলে ধরে নিতে হয় যে, এই ধরণের কিছু হবে না। কিন্তু একটা কাহিনীতে আছে, এক বৃদ্ধা জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ আনতে যেত আর রোজ খুব দুঃখ করে বলত হে আল্লা আর পারি না। একটা দুষ্টু ছেলে ঠিক করল বুড়িটাকে একদিন জব্দ করতে হবে। যে গাছের তলায় বসে বৃদ্ধা কাঠের বোঝা বাঁধত সেখানে ছেলেটি একটা লাল ফিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা এসে যেমনি বলেছে আর তো পারি না, এবার নিয়ে চলো। তখন ছেলেটি গাছের উপর থেকে লাল ফিতেটা ফেলে বলছে, দড়ি ঝুলিয়ে দিলাম ধরে উপরে চলে এসো। বৃদ্ধা তখন বলছে, ইস্ জুম্মে মে নেহি আগলে জুম্মে মে, এই শুক্রবার না, আগামী শুক্রবার। মানুষ মরতে চায় না, সব মুখের কথা।

পিঙ্গলা বলছে *কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ। আদ্যন্তবন্তো ভার্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ।।১১/৮/৩৬।।* বেশির ভাগ কাহিনীতে দেখা যায় পুরুষ নারীকে নিয়ে প্রলাপ করে, কোন মেয়ের কাছে হয়ত ধোকা খেয়েছে, এবার সে প্রলাপ করতে থাকে। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম, নারী প্রলাপ করছে পুরুষের কাছে ধোকা খেয়ে। পিঙ্গলা বলছে, মন বলো তো আজ পর্যন্ত তোমাকে কোন পুরুষ সুখ দিয়েছে? পিঙ্গলা অনেক পুরুষের সঙ্গ করেছে, এটাই ওর জীবিকা। যারা নিজেরাই পঞ্চাশ রকম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে তারা তোমাকে কিসের সুখ দেবে! দেবতারাও কি তাঁদের স্ত্রীদের সুখী করতে পেরেছেন? সুখ আর ভোগ দুটো আলাদা জিনিস, ভোগ সব সময় ইন্দ্রিয় দিয়ে হয় আর সুখ সব সময় ভেতর থেকে আসে, যদিও আমরা সুখভোগ একসাথেই ব্যবহার করি। আমাদের মন বুদ্ধি খুবই সাধারণ বলে সব মিশিয়ে ফেলি। আমরা প্রায়ই ভোগকেই সুখ বলে মনে করি, মনে করি ভোগ করলেই জীবনে সুখ পাব। পিঙ্গলা বলছে, আমি যে সারা জীবন পুরুষের মাধ্যমে ভোগ করলাম, ভোগ করার চেষ্টা করলাম বা পুরুষরা যে আমাকে ভোগ করে গেল তাতে আমি কি সুখ পেলাম? সুখ কোথা থেকে দেবে! সুখ তো ভেতর থেকে আসে। যে মানুষ নিজেই ভেতরে সুখে প্রতিষ্ঠিত নয় সে অপরকে কি সুখ দেবে! সবাই হাভাতে কাঠা। ঠাকুর বলছেন, একটা পাখি বসলেও ডুবে যায়। এটাই পিঙ্গলা বলতে চাইছে, যারা নিজেরা সুখে নেই তারা আমাকে কি সুখ দেবে! ঠিক আছে পুরুষদের ছেড়ে দেবতাদের ধরো। দেবতা মানে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এনাদের কথা বলছে। দেবতারাও ভোগ দিয়ে নিজেদের জায়াদের সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। এই দেবতারা নিজেরাই দুরবস্থায় পড়ে আছেন, কাল তাঁদেরও ধরে রেখেছে। গীতায় বলছেন *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, ভালো কর্মের জোরে দেবতা হয়ে জন্ম নিয়েছে, পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে ওখান থেকে আবার নেমে আসতে হবে। দেবতারা নিজেরাই কালের ভয়ে আর্তনাদ করছেন, তাঁরা নিজের স্ত্রীকে কি সুখ দেবেন আর আমাকেই বা কি সুখ দেবেন!

পিঙ্গলা বলে যাচ্ছে, *নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণ্য। নির্বেদোহয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ।।১১/৮/৩৭।।* অবশ্যই আমার কোন শুভকর্ম আছে, যে শুভকর্মের জন্য ভগবান বিষ্ণু আমার

উপর বিশেষ প্রীত হয়েছেন, যার জন্য *নির্বেদোহয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ*, এই দুরাশা থেকে, হতাশা থেকে আমার সুখের জন্ম হল। দুরাশা আর হতাশা সবারই আছে। দুরাশা থেকেই মানুষের মনে বৈরাগ্যের সূচনা হয়। কিন্তু কারুরই তো দুরাশা থেকে বৈরাগ্যের জন্ম হচ্ছে না। তবে যদি কারুর অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকে তখন তার মধ্যে বৈরাগ্যের জন্ম হবে। ঠিক এই বাক্যটাই পরে আসবে যেখানে চিলের মুখে মাছের কাহিনী আসবে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ একটু ক্ষীণ আশা থাকবে ততক্ষণ যে বৈরাগ্য আসবে সবটাই মর্কট বৈরাগ্য। যখন আশা দুরাশাতে চলে গেল তখন ঈশ্বরীয় কৃপা যদি হয় তবেই সেখান থেকে বৈরাগ্য হবে। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তবেই ঈশ্বরকে ডাকা শুরু হয়, তার আগে হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সব সময় দুঃখ দিয়েই হবে তা নয়, মীরাবাঈ যেমন কোন একটা অবস্থায় গিয়ে তাঁর মনে হতে লাগল কৃষ্ণই আমার স্বামী। এরপর তিনি আর অন্য কোন দিকে তাকালেন না। ঠাকুরও একটা জিজ্ঞাসু বৃত্তি নিয়ে সাধনার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায়, বেশির ভাগই যাঁরা ঈশ্বরের পথে এগিয়েছেন, কোথাও যেন একটা দুরাশা ছিল। দুরাশা সবারই হয়, যখন মনে হবে আমার সব গেল, চলেও যায়, আত্মহত্যাও করে নেয় বা কাউকে খুন করে দিচ্ছে, অশান্তি সৃষ্টি করে দিচ্ছে, কোন সময়ই শান্তি পায় না। কিন্তু কখন সখন দেখা যায়, যদিও খুব বিরল, ঐ দুরাশা থেকে কেউ ঈশ্বরের পথে চলে গেল। পিঙ্গলার বক্তব্য এটাই, আমার কিছু এমন শুভকর্ম আছে যার জন্য ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এর আগে যখন সে বিদেহ নগরীর কথা, তার হতাশার কথা বলছিল, সব কিছুকে এক করে এই জায়গাতে একটা যুক্তি দ্বারা জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে, কারুর দুরাশা হলেই যে ঈশ্বরের পথে চলে যাবে তা নয়, একটা রহস্যপূর্ণ পদ্ধতি আছে, যেটা আমরা জানি না এটা কেন হয়। ভল্টায়ার ফরাসী লেখক ছিলেন, তিনি খুব মজা করে ব্যঙ্গ করে লিখছেন, একজনকে বলছেন, দেখো মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই। সে বলছে, আমি একজনকে ভালোবাসি, মেয়েটি আমাকে কোন দিন ছাড়তে পারবে না। একটা কাহিনী বানিয়ে মেয়েটিকে বলা হল তোমার ভালোবাসার লোকটি মারা গেছে, মেয়েটি শুনেই মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে, কোন হুঁশ আসছে না। যে খবর নিয়ে গেছে সে দেখতে খুব সুপুরুষ। মেয়েটির হুঁশ ফিরিয়ে এনে সে বলছে, তুমি মন খারাপ করো না। তোমার বয়স কম, দেখতেও রূপসী, তুমি আরেকজনকে সহজেই বিয়ে করে নিতে পার। মেয়েটি চিৎকার করে বলছেন, প্রশ্নই নেই, জীবনে আমি একজনকেই ভালোবেসেছি আমি আর কারুর দিকে তাকাতে পারব না। লোকটি ভালোবেসে মেয়েটিকে আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, দু ঘন্টা বুঝিয়ে গেল, তারপর নিজের পরিচয় দিল। লোকটি রূপবান, সুপুরুষ, দু ঘন্টা পরেই মেয়েটি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমি এখন আসছি পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। ছেলেটিকে গিয়ে বলল, দু ঘন্টার মধ্যেই আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেছে। তাই বলে কি মেয়েটির আগের প্রেমিকের মধ্যে বৈরাগ্য এসে যাবে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? কোন দিন হবে না, আরেকটা মেয়েকে খুঁজবে। এভাবেই জীবন চলে। কথামৃতে ঠাকুরের এই ধরণের কত কাহিনী আছে, গুরু শিষ্যকে বড়ি খাইয়ে দিয়েছে, শিষ্য ট্যারাব্যাকা হয়ে মরার মত পড়ে আছে। ঘর থেকে বার করা যাচ্ছে না, দরজা কাটতে হবে। স্ত্রী কান্নাকাটি করছিল, দরজা কাটতে হবে শুনে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বলছে, দরজা না কেটে ওর পা কেটে বার করে নাও। লোকটিও সোজা হয়ে বলছে, তবে রে খ্যাপী আমার পা কাটতে বলছিস! ঠাকুর ওখানে বলছেন, লোকটি সন্ন্যাসী হয়ে গেল। কিন্তু এখানে বলছেন, দুরাশা হলেই যে সব সময় ঈশ্বরের দিকে যাবে তা নয়। প্রচুর শুভকর্ম যদি করা থাকে তবেই যেতে পারে, এই জিনিসটাকে পিঙ্গলার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিলেন।

পিঙ্গলা বলছে, আমি যদি সত্যিকারের অভাগিনী হতাম, তাহলে কিন্তু আমার এমন দুঃখ হত না, যে দুঃখ থেকে এই রকম বৈরাগ্য হতে পারে। এখানে ব্যাপারটা খুবই সামান্য কিন্তু একটা জিনিস বোঝার আছে। একটা মেয়ে দুরাশায় চলে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে সেই রকম হতাশা আসেনি, নতুন নতুন যে ফন্দি ফাঁদবে

সেটাও করছে না, কিন্তু হঠাৎ তার perceptionটা পাল্টে গেল, সেখান থেকে বৈরাগ্য এসে গেল। এই জিনিসটাকে নিয়েই বলছে, আমি যদি অভাগিনী হতাম তাহলে দুঃখটা এত জোরালো হত না, এর থেকে কম দুঃখ হত। পিঙ্গলার দুঃখ গভীর, কিন্তু বলছে আমি যদি অভাগিনী হতাম আমার দুঃখ কম হত, দুঃখ যদি কম হত তাহলে আমার এই বৈরাগ্য আসত না। আমার সৌভাগ্য ছিল বলেই দুঃখটা বেশি এসেছে। এতটাই দুঃখ এসেছে যে তার আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এই বর্ণনাকে আধার করে আমরা বলতে পারি, যদি সে তখন একজন বড়লোক খদ্দের পেয়ে যেত তাতেও সে আর ঐদিকে মন দিতে পারত না। ঠাকুর বলছেন, গিন্নী সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে, কাজকর্ম সেরে যেই স্নানে বেরিয়ে গেল তখন তাকে ডাকলেও আর ফেরত আসবে না। খেলা শেষ, আর সে ফিরে তাকাবে না।

পিঙ্গলা বলছে, ভগবানের এই অপার কৃপাকে আমি নতমস্তকে গ্রহণ করছি আর যত রকমের বিষয়ভোগ আছে সব আমি ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হলাম। *সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী। বিহারম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ।।১১/৮/৪০।।* এবার আমার প্রারব্ধানুসারে যতটুকু আমি পাব ততটুকু দিয়েই আমি পরম সন্তোষে ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার জীবনধারণ করব। আর অন্য পুরুষের উপর দৃষ্টি না দিয়ে আমার হৃদয়ে যিনি পরমেশ্বর আছেন তাঁর সাথে রমণ করব। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, যদি আমার আবার জন্ম হয় তখন আমি বালবিধবা হব, এক টুকরো জমি থাকবে তাতে শাক বুনব, সেই শাকভাত খাব আর ঈশ্বরের নাম করব। পিঙ্গলার এই ভাব, একটু কাজকর্ম করে যা জুটবে তাতে শাকভাত খেয়ে হরিনাম করব। কঠিন কোনটা? দিনের পর দিন শাকভাত খেয়ে থাকা না হরিনাম করা? আসলে শাকভাত খেয়ে থাকা অত্যন্ত সহজ। গান্ধীজী যেদিন থেকে পথে নামলেন সেদিন থেকে তিনি কোয়াশের ঝোল আর ভাত খেয়ে থেকে গেলেন। সারা জীবন শাকভাত খেয়ে কে থাকতে পারেন? যাঁর জীবনে একটা আদর্শ আছে।

বুকার টি ওয়াশিংটনের একটা খুব নামকরা বই আছে Up from Slavery, সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে লড়াই করে তাকে বড় হতে হয়েছে। উনি একটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর ছিলেন আমেরিকার কৃষি বিজ্ঞানে ওনার বিরাট অবদান। আজ যে আমরা পিনাট বাটার খাই, পিনাট বাটার তিনিই প্রথম তৈরী করেছিলেন। সারা জীবন অবিবাহিত থেকে গিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে পাঁচ ডলার করে চেকে মাইনে দেওয়া হত, সেটাও তিনি ভাঙাবার সময় পেতেন না। একটা দুটো পোষাক দিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছেন। ওনাকে বিয়ের কথা বললেই বলতেন, বিয়ে তো করতে চাই কিন্তু সময় কোথায়। ভোর চারটে থেকে গাছেদের সাথে আমি কথা বলতে শুরু করি, প্রত্যেকটি গাছকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি কেমন আছ, কি খবর। কোন স্ত্রী কি এটা সহ্য করবে? উনি কি খাচ্ছেন, কি খেতে দিচ্ছে জানতেন না। যে কোন কীর্তিমান মানুষ প্রথম যেটাকে মারবেন সেটা হল খাওয়া-দাওয়া। যা দিল খেয়ে নিল, ওখানেই শেষ। ঠাকুরও বলছেন, আধ্যাত্মিক যাত্রা যাদের শুরু হয়ে গেছে তাদের সামান্য ঝোলভাত হলেই হয়ে যায়, খাওয়া-দাওয়ার কোন আড়ম্বর থাকে না। সমস্যাটা হল আদর্শের অভাব, আর আদর্শের মধ্যে সব থেকে কঠিন আদর্শ হল ঈশ্বরের নাম করা। আর ঈশ্বরের নাম করব বলে শুধু ঝোলভাত খেয়ে থাকব, এ জিনিস অসম্ভব। পেটরোগারা ঝোলভাত খায়, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কোন আদর্শ নেই আর ঝোলভাত খেয়ে থাকবে, কখনই সম্ভব নয়। আদর্শ যদি থাকে, সে বেচারি সময়ই পাবে না যে পাঁচ রকমের আয়োজন করবে। সেইজন্য ঝোলভাত খেয়ে থাকাটা কঠিন না, হরিনাম করাটাই কঠিন। পিঙ্গলা ছিল সঙ্কেতোপজীবিনী, সে যদি এখন বিশেষ খাওয়ার আয়োজন করার ইচ্ছে করে তাহলে তাকে আবার এই পথে নামতে হবে, এখন তার কোন প্রশ্নই নেই। আর দু এক জায়গায় যা কাজ করবে সেখান থেকে যা পেয়ে যাবে তাই দিয়ে কোন রকমে

জীবন চালিয়ে নেবে আর বাকি সময়টা হরিনাম করে কাটাবে। এখানে বলছেন প্রারব্ধবশতঃ যা আমার কাছে আসবে, সেখানে প্রারব্ধটা কিভাবে আসবে, কারুর বাড়িতে হয়ত কাজটাজ করবে বা যা পয়সা সঞ্চিত আছে সেটা দিয়েই চালিয়ে নেবে, কিন্তু অন্য কারুর মুখাপেক্ষি হয়ে থাকবে না।

জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কে বাঁচাতে পারেন? পিঙ্গলা বলছে *সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্। গ্রস্তং কালাহিনাহহত্মানং কোহন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ।।১১/৮/৪১।।* জীব সংসারের অন্ধকূপে পড়ে আছে আর বিষয় তাকে অন্ধ করে রেখেছে তার উপর কাল রূপী অজগর সাপ তাকে গ্রাস করে আছে, এই অবস্থায় ভগবান ছাড়া আর তাকে কে রক্ষা করবে? একটা কুয়োতে অজগর সাপ আছে, সেই কুয়োত কেউ পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে। আর বাঁচবে কি করে! আমরা বলব, ভালোই তো, মরে যাবে, মরে গেলে সব ল্যাটা চুকে যাবে। এটাই মুশকিল, অজগর সাপ তাকে তো খেয়ে নিল, দুদিন পর তার আবার জন্ম হবে, আবার কুয়োতে পড়বে, আবার অজগর সাপে ধরবে, ধরে আবার গিলবে। এটাকেই বলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। একবার খেয়ে নিলে ঝামেলা চুকে যাবে, তাহলে তো আর কোন সমস্যা থাকবে না। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে গেলেই হয়, সবা ঝামেলা মিটে যাবে। কিন্তু তা হবে না, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*। কে বাঁচাতে পারেন? ঈশ্বরই বাঁচাতে পারেন, আর কেউ পারবে না। এগুলো উপমা, উপমাতে বলছেন তোমার বাঁচার পথ আছে। কি পথ? তুমি যদি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তুমি বেঁচে যাবে। পিঙ্গলা সব শেষে বলছে, *আত্মৈব হ্যত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ। অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ।। ১১/৮/৪২।।* জীব যখন সমস্ত বিষয় থেকে, ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বিরক্ত হয়ে যায় তখন নিজের রক্ষা নিজেই করে নিতে পারে। তখন দেখার হল কাল রূপী অজগর থেকে কিভাবে বাঁচা যায়। সংসারটা অন্ধকূপ, বিষয় তাকে অন্ধ করে রেখেছে আর কালরূপী অজগরের মুখের গ্রাস হয়ে আছে। একবার সে যদি বিষয় থেকে সরে আসে তার দৃষ্টিটা ফিরে পাবে, তার মানে জ্ঞানদৃষ্টিটা জেগে উঠল, প্রভুর দিকে মন দেওয়ার চেতনাটা জেগে গেল, পরের ধাপে অজগর সাপের থেকে বাঁচা। কিভাবে বাঁচবে? কোন গুরুর আশ্রয় নিল, ঈশ্বরের শরণাগতি নিয়ে নিল। বলছেন তখন সে নিজেই সক্ষম হয়ে যায়। যে শাস্ত্রই পড়া হোক, যে গ্রন্থকেই অনুসরণ করুক, ঘুরে ফিরে ঐ একটা পয়েন্টকে নিয়ে আসবেই, যে করেই হোক বিষয়াসক্তি থেকে নিজেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আস। বিষয়াসক্তি না যাওয়া পর্যন্ত এই অন্ধকূপ, কালরূপী অজগর এগুলো থেকে বাঁচতে পারবে না। এই হল পিঙ্গলোপখ্যান, আমাদের ঐতিহ্যের খুব নামকরা উপখ্যান।

কাহিনীকে গুটিয়ে এনে এবার অবধূত বলছেন *এবং ব্যবসিতমোতির্দুরাশাং কান্তর্ষজাম্। ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা।।১১/৮/৪৩।।* পিঙ্গলা নিশ্চিত করে নিল, আর সে ধনীদের প্রত্যাশা করবে না, যাদের কাছে টাকা-পয়সা আছে আর কোন দিন সে তাদের পেছনে দৌড়াবে না। এবার সে শান্ত মনে নিজের বিছানায় গিয়ে নিদ্রাগত হল। জীবনে যদি কেউ জয়ী হতে চায়, যে কোন জায়গায়, সেখানে তার শত্রুকে সব সময় পালাবার একটা সুযোগ দিতে হয়। শত্রুকে যদি পালাবার একটু পথ খুলে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তার জয় নিশ্চিত। বড়দের সাথে ছোটরা তর্ক করতে গেলে ছোটরা সব সময় ভাববে আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক, এই ব্যাপারে সে একেবারে দৃঢ়। বড় যিনি তিনি দেখছেন সব ভুলভাল বলছে, তিনি হেসে বলে দিলেন, হয়ত তাই হবে। তিনি একটা তাকে পথ দিয়ে দিলেন, যেখানে সে একটা সম্মানের সাথে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বড়রা যদি তাকে সেখানেই পুরো শেষ করে দেন, তখন সে তাঁর সারা জীবনের মত শত্রু হয়ে যাবে। যে কোন পরিস্থিতিতে শত্রুকে সব সময় পথ দিতে হয়। যদি একটু পথ দিয়ে দেওয়া হয় সে পালিয়ে যাবে। যদি পথ না দেওয়া হয় তখন সে তাকে মরণ কামড় দেবে। তর্কাতর্কি করতে করতে যে মানুষ

হাতাহাতিতে নেমে পড়ে, এটাই তার কারণ। এখানে প্রকৃতি পিঙ্গলাকে পালাবার সুযোগ দিল না, না দেওয়াতে সে লড়াইয়ে নেমে গেল, যাঃ আমার আর কিছু লাগবে না। সেইজন্য সংস্কৃতে খুব নামকরা যে কথা সেটাই এখন দত্তাত্রেয় বলছেন, *আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা।* ।১১/৮/৪৪। আশার মত বড় দুঃখের আর কিছু নেই, দুঃখের মূলে আশা, মোহ। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন শোক আর মোহ এটাই সংসার। শোক মানে, কিছু ছিল সেটা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, মোহ মানে, হাতে এখন নেই কিন্তু আশা করছি পেয়ে যাব, মোহেরই আরেকটা শব্দ আশা। *নৈরাশ্যং পরমং সুখম্,* জগৎ থেকে যদি নিরাশা হয়ে যায় তখন এর থেকে সুখ আর কিছুতে হতে পারে না। তাই যে কোন কিছুর আশা করে না সেই প্রকৃত সুখ পায়। যেমন এই পিঙ্গলা পুরুষের আশা ত্যাগ করে দেওয়াতে শান্তিতে শয্যায় গিয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারল।

বেদান্তী সন্ন্যাসীদের নামে একটা কথাই বলা হয় *অশোকমন্তঃ,* তাঁরা শোকের পারে চলে যান। পরমহংস উপনিষদে বলছেন, *যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ,* যেটা আসার আসছে, যেটা চলে যাওয়ার চলে যাচ্ছে। যদি কল্পনা করা যায়, যদিও এগুলো করা খুব কঠিন, একটা কাঠের পুতুল, পুতুলে এক গাদা ছিদ্র রয়েছে, আমি সেই পুতুল বানিয়েছি। ঐ ছিদ্র দিয়ে বাতাস আসছে বাতাস যাচ্ছে, পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। নিজের শরীর মনকে যদি এই রকম বানিয়ে নেওয়া যায়, নানান রকমের যে চিন্তা-ভাবনা, নানান রকমের যে ঘটনা আমাদের ভেতরে ঢুকছে বেরোচ্ছে, কোনটাতেই জড়াতে নেই। তবে এভাবে থাকা বা করা খুব কঠিন। কঠিন বলেই তো সংসারে আধ্যাত্মিক মানুষের সংখ্যা কম। সবাই বলেন, সংসারে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষের সংখ্যা সব সময় খুব কম থাকে। কারণ সুখ বলতে যে জিনিসটাকে সংসারী মানুষ বোঝে, ওটাকে কেউ পেরোতে পারে না। একটু যদি বিচার করে দেখা হয়, আমাদের সবারই দুঃখ আছে। দুঃখের মূলে কি আছে? হয় একটা জিনিস হাতের মুঠোয় ছিল সেটা বেরিয়ে গেছে আর তা নাহলে একটা জিনিস পেতে চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না, এছাড়া আর কিছু না। দুঃখের মূলে এই দুটি জিনিস, এই দুটির পারে চলে গেলে যেটা আছে সেটাই সুখ, এই সুখকে তাই বলা হয় আত্যন্তিক সুখ। ধর্ম মানে, যে জিনিসটা এই দুটোকে পেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়। ধর্ম বলতে আমার সাধারণত বুঝি, মন্দিরে যাওয়া, প্রসাদ খাওয়া, তীর্থে যাওয়া, এগুলোতেও যে হয় না তা নয়, হয়। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি প্রচণ্ড নিষ্ঠা ছিল আর বর্তমানে মুসলমানদের নমাজের প্রতি, মক্কায় হজ করাতে এমন নিষ্ঠা যে ধর্মের নামে তারা অনেক কিছুকে সহ্য করে নেয়। তবে যত দিন এইসব বাহ্যিক আচরণের মধ্যে থাকবে তত দিন তার শোক মোহের পারে যাওয়াটাও ওঠা নামা করবে। কিন্তু একবার যদি আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন আর শোক মোহের পারে যাওয়াটা আর কোন পরিস্থিতিতেই পাল্টাবে না। এই যে ভাগবতে অবধূতের চব্বিশ গুরুর আলোচনা চলছে, এখানেও ঘুরে ঘুরে ঐ একই বিষয়কে নিয়ে বলে যাচ্ছেন। আমাদের পুরো ধর্মশাস্ত্রে আর যে কোন ধর্মেরই ঐ একটিই কথা, প্রথমেই জগতকে ছাড়, যতটুকু আসছে আসতে দাও, যতটুকু বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে যেতে দাও, ধরে রাখার চেষ্টা করতে যেও না। ধরার চেষ্টা করলে তখনই শোক আর মোহ আসবে। শোক আর মোহ আসা মানেই নিজের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরে গেল।

১৮) কুরর পক্ষী

এরপর আসছে চিলের মুখে মাছ। কথামৃত পাঠকদের কাছে এই কাহিনী খুবই পরিচিত। একটা চিল মুখে করে মাছ নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। চিলের মুখে মাছ দেখে হাজার হাজার কাক কা কা করতে করতে চিলের পেছনে ধাওয়া করেছে। চিল যেদিকে যায় সেদিকেই কাক গুলো ধাওয়া করছে। কাকের চিৎকারে চিলের

নাজেহাল অবস্থা, কোথাও শান্তি পাচ্ছে না। কোন ভাবে চিলের মুখ থেকে মাছটা পরে যেতেই সব কাক চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে চলে গেল। চিল তখন স্বস্তিতে একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসল। যখনই বিষয়-আশয় সম্পত্তি থাকবে তখন যত রকম চিন্তা-ভাবনা, লোকজন মানুষকে বিবশ করে রাখবে। যেমনি বিষয় সম্পত্তি চলে গেল তখন কেউ আর তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

ভাগবতে যে কুরর পাখীর কথা বলা হয়েছে এই পাখি চিল হওয়ার কথা নয়, বর্ণনা অনুযায়ী কুরর পাখি আরও ছোট পাখি আর তার মুখে মাছের বদলে মাংসের টুকরো ছিল। কুরর পাখি থেকে যে শিক্ষা পেলেন সেটাই দত্তাত্রেয় বলছেন *পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্। অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান যস্ত্বকিঞ্চনঃ।* /১১/৯/১। মানুষ নিজের অতি প্রিয় বস্তুকে কখন কাছ ছাড়া করতে চায় না, কিন্তু সঞ্চয়ের এই প্রবণতাই তার যত দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন জিনিসকে নিয়ে মানুষের শোক আর মোহ করবে? যে জিনিসটা তার ভালো লাগে বা তার প্রিয়। ভালো লাগা বস্তুকে একত্রিত করাটাই সংসারের মূলে। যেটা মানুষ ভালোবাসে সেটাই মানুষ সংগ্রহ করে, সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখতে চায়। মহিলাদের সোনার গয়নার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সোনা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আগেকার দিনে নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না, সেইজন্য সোনা জমিয়ে রাখত। শুধু সোনাই না, যেটাকেই ভালোবাসে সেটাকেই মানুষ জমিয়ে রাখতে চাইবে। বাচ্চারা খেলনা ভালোবাসে, ওরা খেলনা জমায়। যে পুরুষের যেটা ভালো লাগে সে সেটাকে জমাতে থাকে। এটাই দুঃখের কারণ, সঞ্চয় করার প্রবণতটাই দুঃখের মূল। সাময়িক কোন অঘটন ঘটলে আমরা অবশাদগ্রস্ত হয়ে যাই। অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেলে অনেক সময় সব ফেলে দেয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁর বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি বলতে সব সময় বোঝায় যাঁর বিবেক আছে, কোনটা ভুল কোনটা ঠিক জানেন আর সেই অনুসারে বুদ্ধিকে কাজে লাগান, এটাই বুদ্ধির আধ্যাত্মিক অর্থ, আধ্যাত্মিক অর্থেই বুদ্ধিকে নেওয়া হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে নিয়ে প্রথম থেকেই অকিঞ্চনভাবে কালাতিপাত করেন, কোন কিছুতে জড়ান না আর মনে মনেও কোন বস্তুর আকাঙ্খা করেন না, একমাত্র তিনিই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে পারেন। এনাদের ছাড়া আর কেউ সুখী হয় না।

তাহলে কি মানুষ সঞ্চয় করবে না, সঞ্চয় না করলে তার জীবন চলবে কি করে? আসলে এই শাস্ত্রগুলো অনেক আগেকার, আগেকার দিনের মানুষরা পারতেন। আলেকজাণ্ডেরর সেনাপতি ডাইরি লিখতেন, যেখানে যেখানে আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে যেতেন উনি সব ডাইরিতে লিখে রাখতেন। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে এলেন তারও অনেক বর্ণনা সেনাপতির ডাইরি থেকে পাওয়া গেছে। আলেকজাণ্ডার খবর পেলেন এখানে অনেক ব্রাহ্মণরা আছেন, তাঁরা সবাই ঋষি, ওনারা সবাই বিনা বস্ত্রে থাকেন। আলেকজাণ্ডার এ্যরিস্টটলের ভক্ত ছিলেন, তিনি চাইলেন এনাদের সাথে দেখা করবেন। ঋষিদের কাছে যেতেই ঋষিরা আলেকজাণ্ডারকে ভাগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের কথা শুনতে হলে তোমাকেও কাপড় খুলে আসতে হবে। ওখানে যা গরম, পোশাক ছাড়া ঐ রোদের তাপকে সহ্যই করতে পারবে না, পাঠানরা তাই লম্বা লম্বা পোষাকে সারা শরীরটা ঢেকে রাখে, গ্রীসদের পক্ষে তো রোদের ঐ তাপ সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু তার মধ্যে সব ঋষিরা একেবারে নির্বস্ত্র। আলেকজাণ্ডার একদিন সব ব্রাহ্মণদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। ব্রাহ্মণরা সবাই খেতে গেছেন। তবে একে সেনাপতি তার উপর গ্রীক, ওদের লেখাকে বিশ্বাস করা যায় না, সব কিছুকে অতিরঞ্জিত করে লিখত। কিন্তু এছাড়া তো আমাদের জানারও এখন কোন উপায় নেই। যাই হোক ব্রাহ্মণরা আলেকজাণ্ডারের ওখানে খেতে গেছেন। কিন্তু কেউ বসলেন না, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চামচ ছেড়ে হাত দিয়ে খেলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, পুরো খাওয়ার সময় ওনারা সবাই এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঋষিরা ঐ গরমে বস্ত্রহীন, হয়ত কৌপীন পড়ে আছেন, কিন্তু এক পায়ে দাঁড়িয়ে খেলেন আর যা দিয়েছেন সবই খেয়েছেন। কার সামনে? আলেকজাণ্ডার, যিনি বিশ্বজয়ী।

ভাগবতাদি রচনা এইসব ঋষিদের পরম্পরায় রচিত হয়েছে, সবাই খুব উচ্চমানের ঋষি। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগের চেষ্টা করবে। সেইজন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ কখনই সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। সাধারণ লোক যখন ভাগবত শোনে সেখানে তখন তাদের একটাই টপিক, রাসলীলা। রাসলীলার ভেতরের সার তত্ত্বে তাদের কোন আগ্রহ নেই। এখানে যে টপিক চলছে, এই ধরণের টপিকই ভাগবতের অধ্যায়গুলিতে ছড়িয়ে আছে, সাংসারিক লোকেদের পক্ষে তাই ভাগবতের কথা ধারণা করা সম্ভবই না। তবে শুনতে শুনতে ভেতরে একটু ছাপ পড়ে। সেখান থেকে সে ধীরে ধীরে ভোগ বিলাসিতার ব্যাপারে একটা লাইন টানতে শুরু করে। যার যার বিলাসিতার ব্যাপারটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে, কারণ এক একজনের বিলাসিতা এক একটা জিনিসে থাকে, তার মাত্রাটাও আলাদা হবে। কোন মেয়ের মনে হবে আমার পঁচিশটা শাড়ি হলেই হয়ে যাবে আবার কোন মহিলার মনে হবে দুশো শাড়ি। কোথাও একটা লাইন টেনে দিতে হবে, দুশোটা শাড়ির পর আর নেব না।

এই একটি কথা খুব ভালো করে মনে রাখলে আর কোন অসুবিধা হবে না, ধর্ম মানে একটাই জিনিস, সব সময় ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত থাকা। ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত থাকাটাই ধর্ম। সংসার মানেই যেখানে ঈশ্বরের বোধ নেই। সাধনাও একটাই, দ্বিতীয় আর কোন সাধনা হয় না, সেটা হল ত্যাগ। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপর তলায় যাব, সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, যদি একটা সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকি, আমাকে ওখানেই আটকে থাকতে হবে, যতক্ষণ সিঁড়িটা না ছাড়ছি ততক্ষণ ওপর তলায় যাওয়ার জন্য পরে ধাপের সিঁড়িতে যেতে পারছি না। নীচের ধাপ ছাড়া, এটাই ত্যাগ। যে কোন পথ, যে কোন যোগ যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, ভক্তি পথে যাচ্ছে সেখানেও ত্যাগ, কর্ম পথে যাচ্ছে সেখানেও ত্যাগ, তেমনি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ যে যোগেই যাওয়া হোক সেটাও ত্যাগ। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন unselfishness is God, নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর। নিঃস্বার্থপরতা মানেই ত্যাগ। সংসার মানে আঁকড়ে ধরে রাখা, সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, নিজের স্বামীকে, নিজের স্ত্রীকে, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি, মান, সম্মান সব কিছু আঁকড়ে ধরে রাখবে।

হানিবল নামে এক রাজা ছিল, প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু খুব শক্তিশালী রাজা। হঠাৎ একদিন তার মনে হল তার শরীর আর তার সাথ দিচ্ছে না। নিজের লোকেদের ডাকল, ডেকে আদেশ দিল, তোমরা আমাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দাও, আমি আর বাঁচতে চাই না। তাই হল, সে মরে গেল। তার ছিল, আমি যতদিন বাঁচব রাজার মত বাঁচব, শরীরকেও আমি কোন পাত্তা দেব না। যে মানুষ সারাটা জীবন সুখে কাটিয়েছে, তার কখনই মনে হবে না যে আমি ধর্মের দিকে যাই। সমস্যা হল, আবার তো তাকে জন্ম নিতে হবে, কোন জন্মে কোথাও না কোথাও গিয়ে তাকে ধাক্কা খেতে হবে। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, মানুষ যতক্ষণ জীবন থেকে, জগৎ থেকে একটা ধাক্কা না খাবে ততক্ষণ ধর্মের দিকে তার মন যাবে না। ধাক্কা খাওয়া মানেই দুঃখ, দুঃখ মানেই শোক আর মোহ, শোক আর মোহ মানে, কিছু জিনিস চলে গেল আর কিছু জিনিস চেষ্টা করেও পাচ্ছে না। এই তিনটে জিনিস, ঈশ্বরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাটাই অধ্যাত্ম, সাংসারিকতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা এটাই সংসার আর এটা থেকে ওটাতে যাওয়ার একটাই পথ ত্যাগ, এছাড়া আর কিছু না। এই কটি জিনিসকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব শাস্ত্রে বলছে। যেমন মুসলমানদের বলা হয় দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বে, মূলতঃ কি বলতে চাইছে, তুমি যেটাই করছ, যেটাতেই তুমি আসক্ত হয়ে আছে, তুমি খাচ্ছ, তুমি কাজ করছ, বন্ধুর সাথে কথা বলছ, যেটাই করছ, একটা লাইন টেনে দাও। স্কুল কলেজে ক্লাশ যতই ভালো চলুক, টিচার যতই ভালো পড়াতে থাকুন, চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল, ঘন্টা পড়ে গেলে ওখানেই ক্লাশ শেষ। এগুলোই কোথাও আমাদের ত্যাগের প্রস্তুতি করে দিচ্ছে। ত্যাগ মানেই তাই, একটা জায়গায় গিয়ে লাইন টেনে দাও। পাঁচবার যে

নমাজ পড়ছে, ওখানেই তাকে ত্যাগের ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কোন ধর্মের যত রকম বিধি উপাচার আছে সবেতেই মানুষকে ত্যাগের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে জপ করবে, তার মানে তোমার আলস্য ত্যাগ কর। জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও, কোথাও না কোথাও তোমাকে একটা লাইন টানতে হবে। ঐ লাইনটা এখন কোথায় টানবে, কিভাবে টানবে নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে।

১৯) বালক

দত্তাত্রেয়র ঊনিশতম গুরু বালক। ঠাকুরও বলছেন পাঁচ বছরের বাচ্চা ত্রিগুণাতীত, তার মধ্যে কোন গুণের আঁট নেই। কোন মান অপমান বোধ নেই। পায়খানা করে এসে সবাইকে নিজের পেছন দেখিয়ে বলবে দ্যাখো তো পরিষ্কার হয়েছে কিনা। বন্ধুদের সঙ্গে এই ঝগড়া করল, পর মুহূর্তেই আবার তার সঙ্গে গলাগলি। কোন কিছুতে আঁট নেই। ঠাকুরও এই 'আঁট' শব্দ অনেকবার ব্যবহার করছেন। বাচ্চা সব সময় মস্ত হয়ে থাকে, আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে। দত্তাত্রেয় বাচ্চার থেকে শিক্ষা পেলেন *ন মে মানাবমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্। আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ।*।১১/৯/৩। বালকের মান, সম্মান, অপমান কোন দিকেই দৃষ্টি নেই, আর বালকের ঘরবাড়ির চিন্তা, সংসারের চিন্তা, কোন চিন্তাই নেই। যখন খেলা করে নিজের মনেই নিজের সাথে খেলা করতে থাকে, কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, নিজের মধ্যেই বুঁদ হয়ে আছে। বালকের এই আচরণ দেখার পর আমিও তাদের মত থাকতে শুরু করলাম। আমাদের ঐতিহ্যে বালকের মত থাকার যে ভাব, এই ভাব ঠাকুরের জীবনে আমরা অনেক বেশি দেখতে পাই। ঠাকুর বলছেন, পরমহংসদের অনেক রকম স্বভাব থাকে, যেমন জড়বৎ বলছেন, কখন উন্মাদবৎ, কখন পিশাচবৎ আর বালকবৎ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণের কথা বলছেন, ওটা জ্ঞানীর একটা স্বভাব, একটা টাইপ কিন্তু জ্ঞানী পূর্ণাঙ্গ টাইপ নয়। জ্ঞানীর পূর্ণাঙ্গ টাইপ হল ঠাকুরে যে চার রকম স্বভাবের কথা বলছেন। ঠাকুর সব কিছুর পরেও দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে গিয়ে বলছেন, মা আমি শিশু কিনা, শিশুর তো মা চাই। কথামৃতে এর বর্ণনা এসেছে। কথামৃতে আসা মানে, শিষ্যরা তখন তাঁকে অবতার রূপে মানছেন, নরেনের মত যুক্তিবাদী যুবকরা আসতে শুরু করে দিয়েছেন, ঐ অবস্থাতেও তিনি নিজেকে শিশুর মত দেখছেন, বালকবৎএর বাইরে খুব কম তিনি থাকতেন। শেষ দিন পর্যন্ত বালকের মতই থেকে গেলেন। অন্য ভাবও নিতেন, জ্ঞানীদের মত থাকতেন, যুবকের মত থাকছেন, ফষ্টিনষ্টি করছেন কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই বালকবৎ। বালকবৎ এর বিশেষত্ব হল, দায়ীত্ব পুরো ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত। দত্তাত্রেয় বলছেন, আমিও বালকের মত থাকতে শুরু করলাম, আমারও কোন মান অপমান বোধ নেই। আমি নিজের আত্মাতেই রমণ করি আর নিজের সঙ্গেই খেলা করি।

আমাদের কি এই জিনিস চলবে? বাচ্চাদের এই ভাব পুরোটাই চলবে। ঠাকুর বলছেন বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত থাকতে, বাড়ির দাসী আর বাচ্চার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। দাসীকে কাজ একটু বেশি করতে হয়, কিন্তু সে জানে যে এগুলো আমার কিছু না। বাচ্চাকে কাজ অনেক কম করতে হয়। পরমহংস বাচ্চার মত থাকতে পারেন, গৃহস্থরাও বাচ্চার মত থাকতে পারে শুধু তফাৎ হল কাজটা একটু বেশি করতে হয়, এছাড়া আর কিছু তফাৎ নেই। কিন্তু একবার যদি কেউ ঠিক করে নিল আমি সব ভার ঠাকুরের উপর দিলাম, এরপর যে কাজটা আমার দায়ীত্বের মধ্যে পড়ছে করে দিলাম, এর কোন ফলই আমার লাগবে না, এবার কিন্তু সে সত্যিই বালকের মত মজায় থাকবে। একবার কোন এক সেন্টারের অধ্যক্ষ মহারাজ অফিসে বসে আছেন, সেই সময় একজন ব্রহ্মচারী এসে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে ওনার চোখে চশমা নেই। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চোখে চশমা দেখছি না। মহারাজ হেসে বললেন, চুরি হয়ে গেছে। চুরি হয়ে গেছে মানে? ট্রেনে আসছিলেন, তখনকার দিনের অর্ডিনারি স্লীপারে রাত্রে শুয়েছিলেন, দুটো ব্যাগ ছিল দুটোই চুরি হয়ে গেছে।

ঘুমনোর সময় চশমাটা খুলে ব্যাগে রেখেছিলেন, সেটাও চলে গেছে। ব্রহ্মচারী বললেন আপনাকে টিটি ধরল না? না টিকিটটা ছিল। মহারাজ খুব আনন্দ করে বলছেন, দুটো ব্যাগ ছিল, দুটোই চুরি হয়ে গেছে। জামা-কাপড় যা ছিল সব চুরি হয়ে গেছে। যেন একটা মজার ঘটনা, মজা করেই বলছেন। এই যে ভাব এটারই কথা বলছেন, আমি কাঁদলেও ব্যাগ চলে আসবে না, হাসলেও আসবে না, ও চলে গেছে। চলেই যদি যায় তাহলে কেঁদে লাভ কি। কিন্তু আমরা পারি না। উপায় কি? উপায় একমাত্র অভ্যাস। মহারাজ যখন দেখলেন ব্যাগ নেই, একটু ক্ষণের জন্য তাঁরও মনটা একটু খারাপ হয়ে থাকবে, কিন্তু ঐটুকুই। বাচ্চারা ঠিক এভাবেই চলে। তামসিক লোক ওই নিয়েই কত কাণ্ড বাঁধিয়ে দিত। এই কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, সিদ্ধ পুরুষরা যেটা অনায়াসে করেন, সাধারণ মানুষকে সেটাকেই চেষ্টা করে করতে হয়, এটাই সাধনা। নির্বিকার চিত্ত তো একদিনে হওয়া যাবে না, চেষ্টা করতে হয়ে।

পরের শ্লোকে দত্তাত্রেয় খুব সুন্দর কথা বলছেন *দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুত। যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ।।১১/৯/৪।।* জগতে দুজনই আনন্দে থাকে, একজন বালক আর দ্বিতীয় গুণাতীত। গুণাতীত মানে যিনি কোন কিছুর বন্ধনে নেই, সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণেরই তিনি পারে। এই দুজন ছাড়া জগতে আর কেউ আনন্দে থাকতে পারবে না, সন্ন্যাসীরও মনে জ্বালা, সংসারীরও মনে জ্বালা, পুরুষের মনেও জ্বালা, নারীর মনেও জ্বালা, সবারই জ্বালা, আনন্দে থাকে এক ছোট বাচ্চা আর দুই ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ। আমরা বাচ্চা কেউ হতে পারব না, সেই সুযোগ পেরিয়ে গেছে, এখন একটাই পথ, কিভাবে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। কিন্তু এর জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। আর যদি বলে, এতেই বেশ আছি, তাহলে থাকো। ঠাকুর বলছেন উট কাঁটা গাছ খায়, মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত বেরোচ্ছে তাও সে কাঁটা গাছ খাওয়া ছাড়তে পারছে না। যারা বলে কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, ধর্ম কিন্তু তাদের জন্য নয়।

২০) কুমারী কন্যা

কুড়ি নম্বর গুরু কুমারী কন্যা। *ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্। স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু।।১১/৯/৫।।* ছোট্ট একটা কাহিনীর মাধ্যমে দত্তাত্রেয় দেখাচ্ছেন তিনি এই কুমারী কন্যার থেকে কি শিক্ষা পেয়েছেন। একদিন কুমারী মেয়েটির বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে বরপক্ষ থেকে কয়েকজন অতিথি এসেছে। সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব মেয়েটিকেই নিতে হয়েছিল। মেয়েটির পরিবার খুব দরিদ্র। সেদিন বাড়িতে কিছুই ছিল না। অতিথিদের খাওয়াতে হবে, বাড়িতে একা। মেয়েটি তাই ধান কাঁড়তে শুরু করল। এটা খুব মজার ব্যাপার, আমরা মনে করি আগেকার দিনে মেয়েদের অনেক কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত, কিন্তু এখানেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির বয়স কম নয়। কারণ ধান ভাঙছে মানেই পনের ষোল বছরের নীচে হবে না। সব মেয়েদের বাল্যবিবাহ হত, এই ধারণাটা ভুল। ইসলাম ধর্ম আসার পর আমাদের ধর্মে এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের আসল ধর্মটাই ভুলে গেছি। এখানে কুমারী কন্যার কথা বলছেন। যাই হোক, মেয়েটি হাতে শাঁখের চুড়ি ছিল, চুড়ি পড়ার প্রথাও আমাদের অনেক পুরনো। ধান ভাঙার সময় তার হাতের চুরি গুলো থেকে ঝন ঝন আওয়াজ হচ্ছিল। আওয়াজে অতিথিরা বুঝে নেবে কি হচ্ছে। খুবই লজ্জার ব্যাপার, বাড়িতে অতিথি এল আর তারপর আমি ধান কাঁড়ছি। অর্থাৎ বুঝে ফেলবে যে এদের অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল নয়, ঘরে চালটুকুও নেই। মেয়েটিকেই এখন সব কিছু করতে হবে। আওয়াজটা বন্ধ করবার জন মেয়েটি হাত থেকে এক জোড়া চুড়ি খুলে রেখে দিল। আওয়াজ একটু কমল, কিন্তু তাও আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়নি। এবার সে আরও এক জোড়া খুলে রেখে দিল। এই করে করে যখন দু হাতে একটি করে চুড়ি থেকে গেল তখন আর কোন আওয়াজ নেই। অবধূত খুব সুন্দর কথা বলছেন

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দরম। লোকাননুচরন্নেতাঁল্লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া।।১১/৯/৯।। মানুষ কিভাবে থাকে, মানুষের কি স্বভাব এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যদি আমাদের মনে না থাকে তাই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে রাজা জনকের পূর্বপুরুষদের গল্প বলছেন, সেখানে রাজা যদুর কথা বলতে গিয়ে অবধূতের চব্বিশ গুরু প্রসঙ্গে চলছে। রাজা যদু দত্তাত্রেয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি শিক্ষা কি করে পেলেন। তখন তিনি বলছেন, আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকেই একটা শিক্ষা গ্রহণ করছি। দত্তাত্রেয় তাই চোখা-কান খোলা রেখে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। অবধূত এটাই বলছেন, আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলাম দেখতে এখানে কি হচ্ছে আর কেন হচ্ছে। অবধূত দেখছেন দুটো চুড়ি তাতেও আওয়াজ হচ্ছে, তখন মেয়েটি একটাকে ভেঙে দিয়েছে, একটি চুড়ি থেকে গেল।

এটা দেখতেই তাঁর চোখ খুলে গেল। *বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি। এক এব চরেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ।।*১১/৯/১০। যেখানেই অনেক লোকজন একত্র থাকে সেখানেই নানা কথাবার্তা, কলহ আর সেখানেই অশান্তি। যখন কেবল দুজনও থাকে তখনও কথাবার্তা চলতেই থাকে, সেইজন একা একা বিচরণ করাই উৎকৃষ্ট পথ। একা হয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। কুমারী কন্যার কঙ্কণ থেকে কি শিক্ষা পেলেন? একা থাকলে কোন অশান্তি হবে না। যেখানেই একাধিক সেখানেই কথাবার্তা আর অশান্তি। কিন্তু একা থাকা সম্ভব না, বাচ্চারা একা থাকতে পারে না। বাচ্চাদের মত আমাদেরও মনটা খুব কাঁচা, সেইজন্য আমাদের সঙ্গ চাই। বহুলোকের সঙ্গ ভালো লাগছে, তার মানে সে গোল্লায় গেছে আর একজনের প্রতি দুর্বলতা আছে, তার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে তাহলে বুঝতে হবে *ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি*, তার মধ্যে এখনও বার্তার দুর্বলতা আছে। তমোগুণী লোক অনেকের মধ্যে থাকতে চায়, রজোগুণীরা নিজের পছন্দের একটা বিশেষ গোষ্ঠির সাথে থাকতে চায়, সত্ত্বগুণীরা দুজনের সাথে থাকত চায়, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*। সত্ত্বগুণীকে সুখ আর জ্ঞান এই দুটো বেঁধে ফেলে। তোমার সাথে কথা বলে কত সুখ পাই, তার মানে তার বন্ধন আছে, সত্ত্বগুণের বন্ধন। পাঁচজনের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, পাঁচজনের সাথে থাকতে ভালো লাগে, রজোগুণের বন্ধন। আর চারিদিকে যা হচ্ছে, মিটিং, মিছিল, সিনেমা, খেলা, লোকে লোকারণ্য, খুব মজা পাচ্ছে, তমোগুণের বন্ধন। একা মানে ত্রিগুণাতীত, তাঁর আর কোন কিছুতেই বন্ধন নেই। সেকি সম্ভব? একবারও বলা হচ্ছে না যে এটা সম্ভব। এখানে চব্বিশ ক্যারেট সোনার কথা বলা হচ্ছে, চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে যেমন গয়না হয় না, তেমনি এনাদের দিয়ে জগৎ চলে না। জগৎ চালানোর জন্য খাদ মেশাতে হয়। খাদ কত কম মেশাতে হবে, কত বেশি মেশাতে হবে সেটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। জগাতের চরম সত্যকে এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিগুণাতীতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যিনি ত্রিগুণাতীত তিনি কারুর সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে না, মানে দরকার পড়ে না। ঠাকুর বলছেন বিষয়ী লোকেদের সাথে কথা বলে বলে মুখ পুড়ে যাচ্ছে, তিনি যে সঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেটা তাঁর ছিল না। কারণ সমাধিতে সব সময় থাকার জন্য তো তিনি আসেননি, তাঁর শিক্ষাটা কাকে দেবেন, আধার খুঁজছেন, তাই এই কথা বলছেন। পরমহংসরাও জগতের মাঝখানে বিচরণ করেন তাঁরাও তখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় নেন, কিন্তু ভেতর থেকে ত্রিগুণাতীত। তার থেকেও মজার হল, অবধূত বলছেন কিভাবে তিনি ঘুরতে ঘুরতে ওখানে এসে দেখছেন ঝন ঝন চুড়ির আওয়াজ হচ্ছে আবার আওয়াজটা ধীরে ধীরে কমতে কমতে একেবারেই থেমে গেল। কিভাবে জিনিসটা হল, সেটার খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। জগতে সব কিছুকে চোখ-কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিন্তু আমরা সবাই উদভ্রান্তের মত দৌড়েই যাচ্ছি, কোন দিকেই আমাদের দৃষ্টি নেই। হাওড়া স্টেশনে দশ

মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, এক একটা ট্রেন এসে থামছে আর কিভাবে হাজার হাজার লোক দৌড়াচ্ছে, কারুর সাথে কথা বলারও সময় নেই। একজন বলল আটাশ চলে গেছে? ছটা আটাশের ব্যাণ্ডেল লোকাল কি চলে গেছে সেটারও বলার সময় নেই, শুধু আটাশ চলে গেছে। ইলেক্ট্রনের মত সবাই দৌড়াচ্ছে।

২১) বাণ নির্মাতা

এবার একুশ নম্বর গুরুর কথা বলছেন। এই কাহিনীও কথামৃতে অন্য ভাবে ঠাকুর বলছেন। এক বাণ নির্মাতা একাগ্র চিত্তে একটা বাণ তৈরী করছিল। বাণ তৈরী করা খুব কঠিন কাজ। বাণ তৈরীর সব থেকে কঠিন কাজ হল বাণের ডাণ্ডাটা একেবারে সোজা থাকতে হবে, ফলাটা ধারাল করতে হবে, তা নাহলে ওর ব্যালেন্সে গোলমাল হয়ে যাবে, বাণ চলার সময় এলেমেলো হয়ে যাবে। প্রত্যেকে রাজার তীর বানাবার জন্য খুব দক্ষ লোক থাকত, আর তাদের খুব সম্মান ছিল। এক একটা তীরের খুব দাম হত, সেইজন্য যুদ্ধের পর কিছু লোক ছিল যারা ব্যবহৃত তীরগুলো সংগ্রহ করে বেড়াত, সেই তীরগুলো আবার চলে যেত যারা তীর বানায় তাদের কাছে। ওরা দেখে নেয় তীরের লাইনটা ঠিক আছে কিনা। সামান্য একটু যদি ওজনের এদিক সেদিক থাকে তাহলে লক্ষ্যের দিকে চালাতে গেলে তীরটা বেঁকে যাবে। দত্তাত্রেয় একদিন দেখছেন একজন বাণ তৈরী করছে, সেই বাণ নির্মাতা এত একাগ্র হয়ে কাজ করছিল যে কোন দিকে তার হুঁশ নেই। পাশ দিয়ে রাজার বরকন্দাজ চলে গেলেও সে কোন টের পেল না। দত্তাত্রেয় বলছেন বাণ নির্মাতার থেকে আমি শিক্ষা পেলাম *মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ। বৈরাগ্যভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ।*/১১/৯/১১। যে কজন গুরুর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এই শ্লোকটিই most practical। বলছেন, প্রথমে আসনকে স্থির করে শ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তারপর বৈরাগ্য ও অভ্যাস সহযোগে নিজের মনকে বশ করতে হবে এবং খুব সংযমের সাথে ইষ্টে মনকে সংলগ্ন করতে হবে। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা করছেন উপায় কি? ঠাকুর বলছেন, কেন গীতায় আছে অভ্যাস যোগ, অভ্যাস যোগ মানে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করে যাওয়া। গীতায় ভগবানকে অর্জুন বলছেন, আপনি যে কথাগুলো বলছেন শুনতে খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু আমাদের মন দুর্নিগ্রহ, বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন কঠিন, তেমনি মনকেও নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য। তখন ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি ঠিকই বলছ, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই খুব কঠিন, কিন্তু অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণর করা যায়। যে জিনিসটা মনকে চঞ্চল করছে সেই জিনিসটা থেকে সরে আসার অভ্যাস করতে হয়। যে জিনিসটা মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে দিতে হয়। এই অভ্যাস করলে কি হয়? বলছেন, *জিতশ্বাসো জিতাসনঃ*, এখানে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলছেন। মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগে দুটো জিনিসের কথা বলা হয়, একটা হল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়মিত করা আর দ্বিতীয় আসন জয় করা। যাদের আসন স্থির হয়নি তাদের মনও স্থির হবে না। স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, উনি গৌর বর্ণ ছিলেন আর ভারী শরীর ছিল। উনি মন্দির উদ্বোধনে কানপুরে গিয়েছিলেন। একজন ভক্ত তার বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, মেয়েটি খুব ছটফটে। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করানন্দজী মহারাজ বসে আছেন। একটা মাছি বার বার তার গালে এসে বসছিল। মহারাজ হাতটা নাড়িয়ে মাছিটাকে তাড়িয়েছেন। মেয়েটিকে বলে দেওয়া হয়েছিল, ওখানে গিয়ে ছটফট করবে না, চেঁচামেচি করবে না, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু এবার বাচ্চা মেয়েটি আর থাকতে পারেনি, চেঁচিয়ে বলছে, মা মা দেখ ঠাকুর হাত নাড়ছে। মেয়েটি এতদিন ঠাকুরের মুর্তি দেখে এসেছে। শঙ্করানন্দজী বসে আছেন একেবারে মুর্তির মত বসে আছেন, মেয়েটির স্থির ধারণা যে এটাও ঠাকুরের মুর্তি। মহারাজ হাত নেড়েছেন আর ও মনে করছে মুর্তি যেন হাত নেড়েছে, শুধু মুর্তিই না, ঠাকুর। মা মা দেখ ঠাকুর হাত নাড়ছে। *জিতাসনঃ*, আসন জয় করা মানে এই রকম, মনে হবে যেন মুর্তি বসান আছে। কি

আসন করে বসে আছেন সেটা কোন ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হল স্থির হয়ে যাওয়া। *জিতশ্বাস*, মন যদি স্থির হয়ে যায় তখন কুম্ভক হয়ে যায় তার সাথে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মতি হয়ে যায়। মন যদি স্থির হয়ে যায় তখন মনের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, মুখস্ত করার ক্ষমতা বেড়ে যায়, স্মৃতি শক্তি বেড়ে যায়, নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ বেড়ে যায়। অন্য দিকে বলছেন *ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ*, অত্যন্ত সংযম চিত্ত সহকারে এক লক্ষ্যে মনকে সংযুক্ত করা। বাণ তৈরী করাটা খুব সূক্ষ্ম কাজ, শুধু বাণ তৈরীর ক্ষেত্রেই নয়, ছুঁচের কাজ বা যে কোন সূক্ষ্ম কাজ করার সময় মন এমন একাগ্র হয়ে যায় যে আর কোন দিকে হুঁশ থাকে না। এখানে দেখাচ্ছেন কিভাবে সব জায়গা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়, যে কোন সূক্ষ্ম কাজ অনেকক্ষণ ধরে করলে মনটা স্থির হয়ে যায়। কোন কিছু একদিনেই হয়ে যাবে না, অভ্যাস করে করে রপ্ত করতে হয়। আমাদের মন অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে রয়েছে, মনের স্বভাবই হল যাকে সে আপন মনে করে তার সাথে জড়িয়ে থাকে। মনের আপন হল ইন্দ্রিয়গুলো আর ইন্দ্রিয়ের আপন হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের শেষ নেই, ফলে মানুষ কিছুতেই শান্তি পায় না। জীবনে যদি কেউ কিছু পেতে চায়, জাগতিক কোন কিছুই হোক আর আধ্যাত্মিক কোন কিছুই হোক মনকে সব সময় একটা জিনিসে লাগাতে হয়। যখন দেখা যাবে একসাথে অনেক কিছু করছে, বুঝে নিতে হবে এর দ্বারা কিছু হবে না। গীতায় ভগবান বলছেন *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্*, যারা অব্যবসায়ী তারা এক সঙ্গে অনেক কিছুতে মন লাগিয়ে রাখে। এই যে বাণ তৈরী করছে, সে মনকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে এনে একটি জায়গায় দিয়ে রেখেছে। দত্তাত্রেয় বলছেন কর্মবাসনা থেকেই মনের চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়। কর্মবাসনা শূন্য হলেই মন ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায়। এই স্থির মনকে যদি পরমাত্মাতে স্থাপন করে দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত কর্মবাসনা শেষ হয়ে যাবে। আর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির ফলে রজোগুণ আর তমোগুণকে সত্ত্বগুণ দাবিয়ে দেয়, ফলস্বরূপ মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়।

সৃষ্টির যে উৎস, উৎসটা হল শুদ্ধ গুণ, এই গুণ তিনটে সত্ত্ব, রজো আর তমো। সত্ত্ব, রজো ও তমো যখন সাম্য অবস্থায় থাকে তখন কোন সৃষ্টি হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টির যখন সময় হয় তখন এই তিনটে গুণের সাম্য ভাবটা ভেঙে যায়। কেন যে সাম্য অবস্থাটা নড়ে যায় আমরা কেউ জানি না। আমাদের ঋষিদের যে বিভিন্ন দর্শন তাতে ওনারা বলেন, আত্মা যেমনি কাছে আসেন তখনই তিনটে গুণের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। যেমন লোহার টুকরোর কাছে নিয়ে যদি একটা চুম্বককে নাড়ানো হয় সব লোহার টুকরো গুলো নড়তে শুরু করে। ঠিক তেমনি আত্মা যেমনি কাছে আসে তখন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়, ওদের স্বভাবের মধ্যেই এই জিনিসটা আছে, সেইজন্য এর একটা নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি মানেই স্বভাব, স্ব স্ব ভাব। আমরা এখানে যে কজন আছি সবারই প্রকৃতি আলাদা, ঠিক তেমনি যেটা আলাদা তখন বলবে ওর এটাই স্বভাব। প্রকৃতি মানে স্বভাব, তার ভেতরের যে স্বভাব। প্রকৃতি, নেচার, স্বভাব সব একই কথা। সত্ত্ব, রজো আর তমো এই যে তিনটে গুণ এটাই প্রকৃতি। প্রকৃতি একা যখন থাকে তখন সে চুপচাপ শান্ত হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু যেমনি কেউ ওর কাছে এলো সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনজন তিনজনকে দাবাতে শুরু করে। এই যে এক অপরকে দাবিয়ে যাচ্ছে এটাই সৃষ্টি। জগতে আমরা কত রকমে রঙ দেখছি, জগতটা যেন রঙের খেলা, কিন্তু জগতে মূল তিনটে রঙই আছে, ঐ তিনটে রঙ থেকেই জগতে এত বিচিত্র রঙের খেলা চলছে। আমাদের মনেও সত্ত্ব, রজো আর তমো আছে, আমাদের পোষাকও সত্ত্ব, রজো আর তমো, আমাদের খাওয়া-দাওয়াতেও সত্ত্ব, রজো আর তমো আছে। আগের আগের জন্মের যে কর্ম বাসনাগুলো সঞ্চিত হয়ে আছে, আর পূর্বজন্ম যদি নাও মানা হয়, এই জন্মে যে কর্মগুলো করা হয়েছে, সেই কর্মের সংস্কারে আমাদের অনেকগুলো প্রবণতা হয়েছে, এই নানা রকমের প্রবণতা থেকে আমাদের ভেতরে অনেক কিছু করার ইচ্ছা জাগে, এটাকেই বলে কর্মবাসনা। কর্মবাসনা থেকে যখন ইচ্ছা জাগে তখন সাধারণ ভাবে এর দুটো প্রতিক্রিয়া হয়, একটা

রজোগুণ, যার থেকে কর্মে প্রবৃত্তি আসে, আরেকটা তমোগুণ, ধ্যুৎ থাক, কে করবে! তমোগুণ মানে পলয়ানবৃত্তি, ছেড়ে দাও, আরও অনেক করার লোক আছে। রজোগুণ মানে যুদ্ধবৃত্তি, আমাকে জয়ী হতে হবে।

আমাদের সারা জীবনটাই তমো আর রজোর খেলার মধ্যে চলে যায়, সত্ত্বে কখনই যায় না। যে কোন জিনিসে এই তিনটে গুণকে থাকতেই হবে, সেইজন্য কোন কিছুই পুরোপুরি ভালো হয় না আর কখনই কোন জিনিস পুরোপুরি খারাপ হয় না। সব কিছুতে তিনটে গুণ থাকবেই, কিন্তু বেশি কোনটা আছে? আমি যখন ঘুমোতে যাচ্ছি, তখন আমার শরীর মনের আটানব্বুই শতাংশ তমোগুণ নিয়ে নেয়, আর ওয়ান পয়েন্ট নাইন রজোগুণ নিয়ে নিল, সেটা দিয়ে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, শরীরের ক্রিয়া চলছে। আর একটু সত্ত্বগুণ আছে। যখন গভীর নিদ্রায় চলে গেল তখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সারাটা জীবন সাধারণ ভাবে তমোগুণ আর রজোগুণ দিয়ে চলে। কর্মবাসনা পেছন থেকে ঠেলছে, পরিস্থিতি গুলো নিজে থেকে আসছে বা ভেতর থেকে চাড়া দিচ্ছে। আমাদের যে প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়া সব সময় হয় তমোগুণ আর রজোগুণ। অনেক সময় তমোগুণটা আসে রজোগুণের রূপ ধরে। সত্ত্বগুণীর চরিত্র সব সময় পুরো আলাদা হয়। তাদের কি হয়? আমি এটা করতে পারি কিন্তু করব না। কেন করব না? আমি এর পারে চলে গেছি। খুব সহজ উদাহরণ, বাচ্চারা গুলি খেলতে ভালোবাসে। যারা খেলতে চায় তারা যেমনি দেখছে গুলি খেলছি ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মানে রজোগুণ। অনেকে আছে, কাছে গেলেই ওরা ঝগড়া করে, সে ওখান থেকে সরে এল, এটা তমোগুণের লক্ষণ। যিনি সত্ত্বগুণে চলে গেছেন, তিনিও চলে আসবেন, কারণ তিনি এসবের উর্ধ্বে চলে গেছে, এটা তমোগুণের লক্ষণ নয়, উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা হল। বিভিন্ন বয়সে কর্মবাসনা, ইচ্ছা এগুলো পাল্টে যায়। তখন রজোগুণ আর তমোগুণ তাকে টানতেই থাকে। সেইজন্য বলছেন, সত্ত্বগুণে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তার একটাই উপায় ঈশ্বরের দিকে মনকে নিয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের দিকে মন গেলে রজোগুণ আর তমোগুণের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে। সত্ত্বগুণের লক্ষণকে গীতায় দুটি শব্দে বলে দিয়েছেন, সুখ আর জ্ঞান। বই পড়ে আনন্দ পাচ্ছে, লেখালেখি করে আনন্দ পাচ্ছে, বুঝতে হবে এখন সে সত্ত্বগুণে আছে। ঈশ্বরের জ্ঞানে নিমগ্ন হয়ে যেতে চাইছে, তখন বুঝতে হবে সত্ত্বগুণের আধিক্য চলছে। ঈশ্বরের নামের প্রতি রুচিকে ঠাকুর দুই রকম বলছেন, প্রথমে ভজনান্দ আর পরে ব্রহ্মানন্দ। যখন পরমাত্মাতে মনকে পুরোপুরি লাগিয়ে দেওয়া হয়, সব সময় তাঁরই নামগুণগান করছে, তাঁরই কথা আলোচনা করছে, পড়ছে তখন বুঝতে হবে তার সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে।

বাণ নির্মাতা বাণ তৈরী করছিল, সে কাজ করছিল। আমাদের দৃষ্টিতে কাজ করাটা রজোগুণ, কিন্তু এখানে রজোগুণ নয়, কারণ বাকি সব জায়গা থেকে বাণ নির্মাতার মনটা পুরোপুরি সরে এসেছে। মন সব কিছু থেকে সরে একটা জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে যাওয়াটা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। রজোগুণের দৃষ্টিতে দেখলেও কোন দোষ নেই, কারণ তার মনের একাগ্রতা অনেক উচ্চস্তরের। জীবনে যদি কেউ উন্নতি লাভ করতে চায় তাহলে তার মনকে একটা জায়গাতে কেন্দ্রিত করা দরকার। এখানে অবধূত রজোগুণ আর তমোগুণ থেকে মনকে সরিয়ে পরমাত্মাতে লাগাতে বলছেন। বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষরা এমন তমোগুণ আর রজোগুণের চক্রে পড়ে আছে দেখলে করুণা হয়। তমোগুণ মানে, চুপচাপ শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, খেতে দিলে খাচ্ছে, শুতে বললে শুয়ে পড়ছে, বয়স হয়ে গেছে কি করবে, কিছু করার থাকে না। রজোগুণ মানে একই খবর পাঁচবার পড়বে, পাড়ার বুড়োদের সাথে কোন পার্কে গিয়ে গল্প করবে। ঠাকুর বলছেন, অমুক জায়গায় গেলাম দেখছি বুড়ো গুলো তাস খেলছে, বুঝি এখনও ঈশ্বরের নাম করার সময় হয়নি। তাস খেলা রজোগুণ কিন্তু তমোগুণের আধিক্য লেগে আছে। সত্ত্বগুণের আধিক্য যখন হয় তখন ঈশ্বরের নামগুণগান, ঈশ্বরের কথা পাঠ, ঈশ্বরের

আলোচনা করে। আরেকটু নীচে যখন কোন বিষয়কে নিয়ে পড়াশোনা করা হয়, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ইতিহাস পড়ছে, সেখানে মন পুরোপুরি ডুবে আছে আর জ্ঞান উপলব্ধি হচ্ছে তখন সেটাও সত্ত্বগুণের লক্ষণ। কিন্তু ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণ হল পরমাত্মাতে মনকে কেন্দ্রিত করা। যাঁর মন পরমাত্মাতে গিয়ে স্থির হয়ে যায়, বাহ্য জগতেরও কোন হুঁশ নেই, অন্তর্জগতেরও কোন হুঁশ নেই, অন্তর্জগত বলতে পুরনো যে স্মৃতিগুলো আছে, সেগুলোকে নিয়েও থাকছে না, কল্পনা নিয়ে থাকছে না, শুধু আত্মাকে নিয়ে আছে। বাণ নির্মাতার কাছ থেকে অবধূত এই শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

২২) সর্প

অবধূতের বাইশ নম্বর গুরু হল সর্প। সাপ থেকে দত্তাত্রেয় সন্ন্যাসীর অনেক ধর্ম শিক্ষা পেয়েছেন। *একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ। অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোহল্পভাষণঃ।*।১১/৯/১৪। সন্ন্যাসী সব সময় সাপের মত একা একা বিচরণ করবে। সাপ কখন দুজন মিলে চলে না। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল সাপ নিজের জন্য কখনই বাসা বানায় না, ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ইঁদুরকে খেয়ে তারই গর্তে বাস করতে থাকে। সন্ন্যাসীও তাই কখন নিজের জন্য কোন সংগঠন বা মঠ তৈরী করতে যাবে না। সাপ কখন এক জায়গায় থাকে না, সন্ন্যাসীও কখন এক জায়গায় গেঁড়ে বসে থাকবে না, প্রমাদে যুক্ত হবে না আর নিজের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করবে না। সন্ন্যাসী কোথাও কোন গুহাতে গিয়ে বাস করবে। আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বাহ্য আচরণ দিয়ে যেন তাকে চেনা না যায়।

'In the name of God' বলে একটা খুব বিখ্যাত বই আছে। বর্তমান যিনি পোপ তাঁর ঠিক দুই কি তিনজন পোপ আগে যিনি ছিলেন তাকে কার্ডিনালরা তাদের স্বার্থে কিছু অসুবিধা হওয়াতে স্লো পয়েজন করে খুন করে দিয়েছিল। তাকে হত্যা করার আগে কীভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনাকে কীভাবে কার্যকর করা হল, কীভাবে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল এই নিয়ে পুরো একটা কাহিনীর মত 'In the name of God' বইতে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল। একজন পোপকে, পোপ কোন সামান্য লোক নন, পুরো বিশ্বের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরু, ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্নাসী হয়েছেন ভগবানের নাম করবেন বলে, মাঝখানে সে Priest হলেন, বিশপ, কার্ডিনাল হয়ে হয়ে তারপর পোপ হলেন, আর তাঁর সাগরেদরাই তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে দিল। এটাই হয়, সন্ন্যাসী যখনই বাসা করে নিলেন তখন নানা সমস্যা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলবেই।

সাপকে দেখে অবধূত বলছেন, সন্ন্যাসী কোন মঠ করবে না। কিন্তু স্বামীজীর মত পুরুষ বেলুড় মঠ তৈরী করলেন, সন্ন্যাসীরা মঠের স্কুল কলেজে পড়াচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, মঠে থাকছেন। সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী অবধূতের শিক্ষার বাইরে গেলেন। অবধূতের বাইশ নম্বর গুরুর কথা শোনার পর আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে। আসলে এখানে একক সন্ন্যাসীর কথা বলছেন, একক সন্ন্যাসী যদি মঠ বানায় তখন তাঁর অনেক ঝামেলা এসে যাবে। মঠ স্থাপন করা মানে সম্পত্তি করা। পাঁচজন শিষ্যকে নিয়েই থাকছেন, স্ত্রী পুত্রাদি নিয়ে যে থাকছেন তা নয়। কিন্তু সম্পত্তি হয়ে যাবে, সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য লোকজন লাগবে। বেলুড় মঠ কারুর সম্পত্তি নয়। প্রেসিডেন্ট মহারাজ থেকে নিয়ে আজকের যিনি ব্রহ্মচারী সবাই জানেন, এখানে বাস করা গুহায় বাস করার মতই। যেদিন কোন সন্ন্যাসীকে বলে দেওয়া হবে তোমাকে এই ঘর ছাড়তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে। যেদিন বলে দেবেন এই সেন্টার ছেড়ে অন্য সেন্টারে যেতে হবে, এতদিন সেন্টারে যে নদের হাট বানিয়ে রেখেছিলেন সব ওখানেই ছেড়ে তল্পিতল্পা নিয়ে তাঁকে নতুন সেন্টারে চলে যেতে হবে। স্বামীজীও বলছেন, প্রত্যেকটি সংগঠন এক নতুন ধরণের evil নিয়ে আসে, তা সত্ত্বেও আমাকে এই সংগঠন তৈরী করতে

হবে। কারণ এর দ্বারা যে মঙ্গল হবে, সেটা এই ক্ষতিটুকুর থেকে অনেক গুণ ভালো হবে। Allan Octavian Hume যখন কংগ্রেস দল করেছিলেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন করে বৃটিশ সরকারের কাছে আমরা বিভিন্ন পিটিশানস দেব। কংগ্রেস জনপ্রিয় হল মূলতঃ গান্ধীজী আসার পর। কংগ্রেস দলকে তিনি ভারতে বিরাট সংগ্রামাদি করাতে কাজে লাগালেন কিন্তু যেমনি ভারত স্বাধীন হল তিনি বললেন এখনই কংগ্রেস দলকে তুলে দেওয়া উচিত, কংগ্রেস যেন আর না থাকে। কারণ কংগ্রেস যে কাজের জন্য করা হয়েছিল সেই কাজ হয়ে গেছে, এরপরেও যদি কংগ্রেস থাকে গোলমাল হতে থাকবে। ঠিক তাই হল, এখন কত গোলমাল চলছে। তুলে দিলেও কিছু হত না, কংগ্রেসের নামটা পাল্টে দিয়ে আরেকটা নামে পার্টি করে সাম্রাজ্য চালাত। যে কোন আন্দোলন, কম্যুনিস্ট বলুন, কংগ্রেস বলুন, তৃণমূল বলুন যে কোন জায়গায় একটা নতুন সমস্যা নিয়ে আসে। জাতিপ্রথা যদি তুলে দেওয়া হয় তখন এক নতুন সমস্যা আসবে, যদি জাতিপ্রথা রেখে দেওয়া হয় তখনও আরেক নতুন সমস্যা দেখা দেবে। বেলুড় মঠ যে এসেছে, এও সমস্যা তৈরী করবে, হয়ত এখনও করেনি, সবে একশ বছর হয়েছে। এটা হল প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা হল, এই কথাগুলো অনেক আগেকার কথা, তখনকার দিনে সাধারণত গৃহস্থ ধর্মের সব কিছু পালন করার পর সন্ন্যাসী হত, এরপর জগতের যে ভালো করা, বেলুড় মঠ যে পদ্ধতিতে কাজ করছে, স্কুল চালনা করা, হাসপাতাল চালানো এগুলোর ব্যাপারে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না। এনাদের বক্তব্য একটাই, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া তোমার আর কিছু করার দরকার নেই আর ঈশ্বর চিন্তন করার জন্য তোমার কোন বাড়িতে থাকারও দরকার নেই, কোন মন্দিরের চাতালে, গাছের তলায়, কোন গুহায় থাকলে; সন্ন্যাসীর ঘরবাড়ি থাকলেই সমস্যা হবে।

২৩) মাকড়সা

দত্তাত্রেয় বলছেন এবার আমি মাকড়সার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি বলছি। অবধূতের তেইশতম গুরু মাকড়সা। *একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া। সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ।। ১১/৮/১৬।।* সৃষ্টির ব্যাপারে মাকড়সার উপমা অনেক জায়গায় এসেছে, মুণ্ডকোপনিষদেও এই উপমা নেওয়া হয়েছে, *যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ*। মাকড়সা নিজের ভেতর থেকে তার জাল তৈরী করে বাইরে বের করে দেয়। জালের মধ্যে পোকামাকড় এসে আটকে যায় তখন মাকড়সা সেই জালটা আবার ভেতরে টেনে নেয়। মাকড়সার জালের এক একটা সুতোর প্রচণ্ড শক্তি, মাকড়সার জালের সুতোর মত স্টীলের তার যদি তৈরী করা হয়, স্টীলের তারের থেকেও মাকড়সার জালের সুতো বেশি শক্ত ও ভারী হবে। একই থিকনেসের স্টীলের তার যতটা ওজন নিতে পারবে মাকড়সার জালের তার থেকে বেশি ওজন নেবে। জাল এমন ভাবে তৈরী থাকে যে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন পোকা বিভিন্ন জায়গায় ফেঁসে যায়। মাকড়সা যখন দেখে দুটো চারটে পোকা জালে ফেঁসে গেছে, মাকড়সা তখন জালটাকেই গিলে নেয়। দত্তাত্রেয় বলছেন, মাকড়সার এই দৃশ্য দেখার পর আমি তখন বুঝলাম পরমাত্মা ঠিক এই ভাবেই সৃষ্টি করছেন। পরমাত্মা নিজের ভেতর থেকেই সব কিছু বিস্তার করেন আবার সময় হলে, কল্প শেষ হয়ে গেলে সব আবার নিজের ভেতরে গুটিয়ে নেন। মাকড়সার কাছ থেকে আমি জগতের স্বরূপটা বুঝতে পারলাম। এখানে একটা বড় তফাৎ হল, মাকড়সার জালে যে জিনিস গুলো এসে ফাঁসছে সেগুলো বাইরে থেকে আসছে, কিন্তু সৃষ্টিতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। যিনি ঈশ্বর তিনি জাল রূপে এই জগতের বিস্তার করছেন আর তিনিই জীব রূপে ঐ জালে খেলা করেন। যদিও ঈশ্বরের মধ্যে কোন ধরণের কোন বিভেদ নেই কিন্তু আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যখন দেখি তখন ঈশ্বর, জগৎ, জীব আলাদা আলাদা দেখছি। মাকড়সার ক্ষেত্রে মাকড়সা নিজের ভেতর থেকে জাল ছড়িয়ে দিল, সেই জালের উপর মাকড়সা দৌড়াচ্ছে আর ঐ জালকে আবার গিলে ফেলল। এটা একটা উপমা, মাকড়সার জাল দেখে ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা মনে পড়ে।

আমাদেরও কিছু কিছু জিনিস দেখে অনেক কিছু মনে হয়, আমরা যদি কোন কিছু থেকে আঘাত পেয়ে থাকে, ঐ ধরণের কিছু যদি দেখি তখন পুরনো ব্যাথাটা আবার চাগিয়ে ওঠে। ঠাকুরের প্রচুর এই ধরণের ঘটনা আছে। গঙ্গার উপর দিয়ে মাঝি নৌকা নিয়ে যাচ্ছ, মাঝি বাঁশে বাজাচ্ছে, বাঁশির আওয়াজ শুনে ঠাকুরের মন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণিতে চলে গেল, তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। বাইরে থেকে যদি কোন ইঙ্গিত ইশারা আসে তখন আমাদের ভেতরে যেটা আছে সেটা জেগে ওঠে, ভেতরে যদি কিছু না থাকে তাহলে কিছু হবে না। ঠাকুরের উপমা আছে, একজন লোক নদীর ধারে পড়ে আছে, একটা চোর দেখে ভাবছে সারা রাত চুরি করে এখন ঘুমোচ্ছে, এক মাতাল দেখে ভাবছে, সারা রাত মদ খেয়ে এখন উল্টে পড়ে আছে আর একজন সাধু ভাবছে, আহা বেচারা সারা রাত ধ্যান করে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বহির্জগৎ হল ইঙ্গিত ইশারা মাত্র, কিন্তু আমাদের ভেতরে যেটা আছে তাতে সেটাই জেগে উঠবে। মাকড়সার জাল দেখলে আমাদের মনে হবে, এমন জাল ছড়াব যাতে আরও অনেক লোককে ফাঁসানো যায়। কিন্তু অবধূতের ভেতরটা ঈশ্বরের ভাবে এমন পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে মাকড়াসার জাল দেখে জগতের স্বরূপটা জেগে উঠল। এই জিনিসগুলোকে বৈষ্ণবরা বেশি জনপ্রিয় করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এত কথা চারদিকে দাঁড় করিয়েছেন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের ভাব ছড়িয়ে গেছে, কোন কিছুকে দেখলেই শ্রীকৃষ্ণের ভাবটাই মনে আসে। অবধূত বলছেন, মাকড়াসার জাল দেখে মনে পড়ে কিভাবে সর্ব প্রকাশক এবং অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান ভগবান সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে সুতো দিয়ে সংসার রচনা করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঐ জালের মধ্যে ধারণ করে রেখেছেন। ঐ জালের মধ্যে পড়ে জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রের খেলা চলছে। সবটাই তিনি হয়েছেন, কিন্তু যখন জীব বোধ এসে যায় তখন দেখছেন ভগবানই তাকে সৃষ্টি করেছেন, ভগবানের মধ্যেই থাকে আবার ভগবানের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। মাকড়সার এই দৃশ্য দেখে অবধূতের মনে এই ভাবটা জেগে গেল। যার এই বোধটা এসে যাবে, ভগবানেতেই আমার জন্ম, ভগবানেতেই আবার অবস্থান, ভগবানেই আমার আহার বিহার তখন আর তার কিসের থেকে শোক মোহ আসবে, প্রশ্নই উঠছে না।

২৪) ভ্রমর বা ভৃঙ্গী কীট

কোন একটা জিনিসকে নিয়ে যদি অনেক চিন্তা করা হয় তখন তার সত্তাটা তার মধ্যে চলে আসে। ভ্রমর কীট বা ভৃঙ্গী কীট থেকে দত্তাত্রেয় এই শিক্ষাটাই পেয়েছিলেন। কথামৃতে ভৃঙ্গীকে ঠাকুর বলছেন কুমুরে পোকা। কুমুরে পোকা আরশোলাকে দংশন করতেই বেহুঁশ হয়ে যায়, ঐ আরশোলাকে কুমুরে পোকা নিজের বাসাতে গিয়ে রেখে দেয়। বাসা থেকে বেরিয়ে আসার আগে কুমুরে পোকাটা ডিম পেড়ে আসে, আর বেরোবার সময় বাসার মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দেয়। কিছু দিন পর ডিম থেকে কুমুরে পোকার বাচ্চা বেরিয়ে আসে। বাচ্চার আহার দরকার, তাই আরশোলাকে আগে থেকেই বাচ্চাদের মা রেখে গেছে, আরশোলাটা এখনও মরে যায়নি, বেহুঁশ হয়ে আছে। যদি মরে যেত তাহলে সেটা পচে যেত। আহার মানেই যেটা পচে যায় আর যে খাদ্য যত তাড়াতাড়ি পচে সেই খাদ্য তত আমাদের পক্ষে ভালো। যেমন রুটি, রুটি পচতে অনেক সময় লাগে, সেই তুলনায় ভাত অনেক তাড়াতাড়ি পচে যায়, সেইজন্য ভাত সব সময় ভালো। কাঁচা জিনিস রেখে দিলে পচতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু সেদ্ধ করা জিনিস রেখে দিলে তাড়াতাড়ি পচে যাবে। খাওয়ার নিয়মই হল, খাদ্য পচতে হবে। যে খাদ্য যত তাড়াতাড়ি পচবে সেই খাদ্য আমাদের জন্য তত ভালো। যেমন দই, দই পাতলে দু ঘন্টা পরেই টক হতে শুরু করে, সেইজন্য দই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। দুধ খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, সেইজন্য দুধকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আরশোলা যদি মরে যায় তাহলে পচে যাবে। পচে গেলে বাচ্চাগুলো খাবে কি? সেইজন্য ওদের মা ঠিক ততটাই বিষ ঢেলে দেয়, এ্যানাস্থেসিয়ার মত, যাতে মরে না যায়। ডিম

থেকে বাচ্চা বেরিয়ে এসে আরশোলাটাকে খেতে থাকে। খাওয়া হয়ে গেল বাচ্চাটাও বড় হয়ে গেল এবার সে বাসাটা ভেঙে বেরিয়ে আসে। আমরা কি দেখছি? দেখলাম একটা আরশোলাকে ভেতরে রেখে কুমুরে পোকা বেরিয়ে এল। তারপর কিছু দিন পর সেই আরশোলাটাই কুমুরে পোকা হয়ে বেরিয়ে এল। আসলে কুমুরে পোকার ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ঐ আরশোলাকে খেয়ে বড় হয়ে বেরিয়ে আসছে। যদি ভালো করে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে, ওর বাসার ভেতরে আরশোলার ছোট্ট ডানা পড়ে আছে। ওটা দেখে আরও দৃঢ় হয়ে যায় যে আরশোলা যেটা ভেতরে ছিল তার ডানা থেকে গেছে আর বাকিটা ভৃঙ্গি পোকা হয়ে গেছে। কিন্তু আগেকের দিনে ওনারা ঐ রকম দেখেছেন। তাতে কোন দোষ নেই। উপমা সব সময়ই ভুল হতে পারে, কিন্তু এখানে শিক্ষাটাই বড় কথা। সেইজন্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কখনই উপমা দরকার হয় না, উপমাটা হল জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য। বায়োলজির যে ব্যাখ্যা এখন এসে গেছে তাতে এই উপমাটা অযৌক্তিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, সত্যটা সব সময় সত্যই থাকবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসে যদি থাকে তাহলে দেখা যাবে স্বামীর মধ্যে স্ত্রীর কিছু স্বভাব চলে আসে আর স্ত্রীর মধ্যেও স্বামীর কিছু স্বভাব চলে আসে। খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, কথা বলার ধরণ, হাটা-চলার ভঙ্গি পাল্টে যায়। যে যার সঙ্গ করে সে তার সত্তা পায়। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সত্তা পায়। সেইজন্য এত সাধুসঙ্গের কথা বলা হয়।

ভৃঙ্গী পোকা থেকে অবধূত এই শিক্ষা পেলেন। কি শিক্ষা? *যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্।।*১১/৯/২২। যদি কেউ স্নেহবশতঃ বা দ্বেষবশতঃ কিংবা ভয়বশতঃ একাগ্র ভাবে কোন কিছুকে চিন্তা করতে থাকে তাহলে তার সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়। স্নেহ মানে ভালোবাসা, দ্বেষ মানে যেখান থেকে আমরা সরে আসতে চাইছি। ভয় শব্দটা নিয়ে এসেছেন ঠিকই, ওখানে ইমোশানের একটা জোর রয়েছে বলে ভয় শব্দটা নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ভয় জিনিসটা দ্বেষের মধ্যেই পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে ইমোশান দুটো, রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে অনুরাগ অর্থাৎ ভালোবাসা আর দ্বেষ মানে যেটাকে আমরা পছন্দ করি না। ভালোবাসা, অনুরঞ্জন বা অনুরাগ আবার বেশ কিছু ইমোশানের জন্ম দেয়, যেমন যাকে ভালোবাসি তাকে পাওয়ার ইচ্ছে হয় বা যে জিনিসটাকে ভালোবাসি সেই বস্তুকে পাওয়ার ইচ্ছে করবে, তার প্রতি লোভ হয়, মোহ হয়। পেয়ে যাওয়ার পর একটা মদ হয়, অপরের কাছে যদি আমার ভালো লাগার বস্তু থাকে কিন্তু আমার কাছে নেই তখন মাৎসর্য হয়। দ্বেষ মানে যে জিনিসগুলোকে আমি পছন্দ করি না। দ্বেষও অনেক ধরণের ইমোশান জন্ম দেয়, তার মধ্যে খুব শক্তিশালী ইমোশান হল ভয়। সংস্কৃতে দ্বেষ মানে যেটা কাছে থাকলে আমাকে দুঃখ দেয়, আর যেটা কাছে থাকলে আমাকে সুখ দেয় তাকে রাগ বলে। যোগশাস্ত্রে বলছেন *সুখানশয়ী রাগঃ* আর *দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।* কিন্তু ভয় খুব শক্তিশালী ইমোশান সেইজন্য এখানে ভয় শব্দটা নিয়ে এসেছেন। স্নেহ, দ্বেষ আর ভয় এই তিনটে কারণে যদি কোন কিছুকে বেশি ভাবা হয় তাহলে *তত্তৎসরূপতাম্,* সেই জিনিসের স্বরূপ সে পেয়ে যাবে। এই জিনিসটা থেকেই পরের দিকে একটা ধারণার জন্ম দিল, তাকে বলছেন, বৈর ভাবে সাধন। রাবণের নামে বলা হয় যে সে বৈর ভাবে সাধন করেছিল। আমরা যারই চিন্তন করি না কেন আমরা তার অনুরূপতা পেয়ে যাব, তা তাকে ভালোবেসেই ভাবি, রেগে গিয়েই ভাবি আর ভয়ের কারণেই ভাবি, তার সত্তা আমরা পেয়ে যাব। এর উপমা দিলেন কুমুরে পোকা। ঠাকুর ভাগবত শুনতেন, তিনিও এই উপমাকে কথামৃতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে তা হয় না, আরশোলাকে ভ্রমরের বা কুমুরে পোকার বাচ্চারা খেয়ে নেয়।

চব্বিশ গুরুর কথা বলার পর অবধূত দত্তাত্রেয় বলছেন এই চব্বিশ গুরুই শেষ নয়, এর পরেও আমি অনেক কিছু থেকে শিক্ষা পেয়েছি। যেমন আমার দেহটাও আমার গুরু। এই দেহ থেকে আমি বিবেক বৈরাগ্যের শিক্ষা পেয়েছি। শরীরের জন্ম হচ্ছে, ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে, একদিন শরীরের নাশ হয়ে যাবে। শরীরের এই ধর্ম গুলিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে নিজের দেহের প্রতি আর আসক্তি থাকে না। মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে, এই শরীরটাও থাকবে না, তবে তত্ত্ব বিচার যদি করতে হয় তাহলে এই শরীর ছাড়া সম্ভব নয়। অন্য দিকে আমি জানি আমার শরীরের একদিন নাশ হয়ে যাবে, এই দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। আর আমি সন্ন্যাসী, রাস্থাতেই হয়ত শরীরটা একদিন পড়ে যাবে, তখন শেয়াল, কুকুর এই শরীরকে খাবে, সেইজন্য এগুলো থেকে আমি নির্বিকার থাকি। দত্তাত্রেয় বলছেন, মানুষের শরীরটা বৃক্ষের মত, বেঁচে থাকতে এই শরীর দিয়ে অনেক কিছু করা হয়, মরার আগে বৃক্ষ যেমন বীজ ছেড়ে দিয়ে যায়, সেই বীজ থেকে আবার বৃক্ষ তৈরী হয়, ঠিক তেমনি মানুষ নিজের শরীর থেকে আরও কয়েকটি শরীরের জন্ম দেয়। শরীর এমনই বিচিত্র যে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি তাকে বিভিন্ন দিকে টানছে। একজন পুরুষের যদি অনেক স্ত্রী থাকে, স্ত্রীরা যেমন পুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের শরীরকে নিজেদের দিকে সব সময় টানতে থাকে। জিহ্বা একদিকে টানছে, নাক আরেকদিকে টানছে, সব ইন্দ্রিয়ই টানছে। আর আমরা বোকা বরের মত, দশ বারোটা স্ত্রী জোগাড় করে নেওয়া পুরুষের মত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে আছি। দত্তাত্রেয় সব কিছুকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছেন তিনি সেই রকম শিক্ষা পেয়েছেন। যাদের শেখার আগ্রহ আছে তারা অনেক কিছু থেকেই শিক্ষা লাভ করতে পারে। যাদের শেখার আগ্রহ নেই তাদের কেউ কোন দিন কিছু শেখাতে পারবে না।

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ কেন

অবধূতোপখ্যানের শেষে দত্তাত্রেয় খুব সুন্দর কথা বলছেন *সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্। তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।* ১১/৯/২৮। ভগবান তাঁর নিজের অচিন্ত্য মায়াশক্তি দিয়ে কত বিচিত্র জিনিস রচনা করলেন। বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাছ ইত্যাদি কত রকমের যোনি সৃষ্টি করলেন। *তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ*, এত কিছু রচনা করার পরও ভগবানের নাকি হৃদয় শান্ত হয়নি, তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তখন তিনি মানুষের রচনা করলেন। মানুষ রচনা কেন তিনি করলেন? কারণ আগে যাদের সৃষ্টি করেছিলেন তারা কেউ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু মানুষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে পারে। গুরু নানক বলছেন – যিনি নিরাকার তাঁর ইচ্ছে হল দেহ ধারণ করে নিরাকারকে আস্বাদন করবেন। তাই যিনি নিরাকার তিনি প্রথমে পাথর হলেন। পাথর হয়ে দেখলেন এই দিয়ে ব্রহ্ম চিন্তন করা যাবে না। তারপর তিনি গাছপালা, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ হলেন, এতেও দেখছেন নিরাকারের চিন্তন করা যাচ্ছে না। তখন তিনি মানুষ হলেন। মানুষ হয়ে দেখলেন হ্যাঁ এইবার ব্রহ্ম চিন্তন করে নিরাকারকে আস্বাদ করতে পারবেন। তখন তিনি শান্ত হলেন। এরপর আর নতুন করে কিছু রচনা করার প্রয়োজন রইল না, কারণ উদ্দেশ্য হল নিরাকারকে আস্বাদ করা।

ইদানিং বিজনেস ম্যানেজমেন্টে একটা খুব নামকরা শব্দ এসেছে Unique Selling Point (USP)। একটা ব্র্যাণ্ড বাজারে নতুন এসেছে, এর মত সার্ভিস অন্য কোন ব্র্যাণ্ড দিতে পারবে না, এটাই এর বৈশিষ্ট্য। যেমন মেয়েদের মাথার একটা তেল, এর এমন একটা সুগন্ধ যা অন্য কোন তেল দিতে পারে না। হায়দ্রাবাদে একটা বিরিয়ানির দোকান আছে। তার মালকিন একজন মহিলা। অনেক কর্মচারি মিলে সকাল থেকে বড় বড় হাড়িতে বিরিয়ানির রান্না করতে থাকে। মহিলাটি সারাদিন নিজের মত চুপচাপ বসে কখন মদ খাচ্ছে, কখন সিগারেট টানতে থাকে। শেষ মুহূর্তে বিরিয়ানিটা নামাবার আগে নিজের ঘর থেকে একটা মশলা বার করে এনে

সব কটা হাড়িতে একটু একটু করে ছড়িয়ে দেয়। বলে নাকি, হায়দ্রাবাদ শহরে ঐ বিরিয়ানির কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই। দোকানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব বিক্রী হয়ে যায়। শুধু তাই না, দুবাইয়ের মত মধ্য-প্রাচ্য অনেক শহরে ঐ বিরিয়ানি রপ্তানিও হচ্ছে। কেউ জানেও না ওটা কি মশলা। এটাই Unique Selling Point (USP)। মানুষের USP টা কি? মানুষ যেটাই করে অন্য জীবজন্তু তার থেকে অনেক ভালো করতে পারে। স্বামীজী বলছেন কুকুর যে আনন্দ নিয়ে খাবার খায়, শূয়োর যে আনন্দ নিয়ে নোংরাকে ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে খায়, সেই আনন্দ নিয়ে কি মানুষ কখন খেতে পারে! স্বামীজী বলছেন, তুমি একটা ইলেক্ট্রিসিটি আবিষ্কার করেছ অথচ প্রকৃতি কোটি কোটি ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বিনা তারেই পাঠিয়ে দেয়। তোমার USP টা তাহলে কোথায়? মানুষের USP ঈশ্বর চিন্তন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। সমস্ত পশুপাখি জানোয়ারের মাঝখানে মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের সবার কি কি USP? মানুষ বলবে আমি নির্গুণ ব্রহ্মের আস্বাদ করতে পারি। বাকি সব কিছু সবাই করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের অনুভূতির আনন্দ মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী অনুভব করতে পারবে না।

এখানেই স্বামীজীর মহত্ত্ব, তিনি আমেরিকাতে বক্তৃতাদি দিলেন, যদি তিনি সেখানে বলতেন, ভগবান গাছপালা, পশু, পাখি, পোকামাকড় সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষকে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ করলেন। এই কথা শোনার পর শতকরা নব্বুই জন্য শ্রোতা সভা ছেড়ে বেরিয়ে যেত। কারণ তারা না মানে ভগবানকে, না মানে ভগবানের সৃষ্টিকে, না মানে আমাদের মতবাদকে। স্বামীজী এদিকে গেলেনই না, তিনি ধর্মকে নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন। আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকের এভাবে ব্যাখ্যা করার কারুর ক্ষমতাই নেই। স্বামীজী পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। আহার, নিদ্রা আর মৈথুন প্রত্যেকটি জীব করছে, এমনকি গাছপালাকেও নিজের প্রজাতি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রজনন প্রক্রিয়ায় যেতে হয়, পশুপাখিকেও করতে হয়। নিজের সন্তানের পরিপালন পশুপাখিরাও করে। আমরা বলি জীবসেবাই ধর্ম, কিন্তু অনেক পশু আছে তারাও জীবসেবা করে। এক ধরণের পাখি আছে তাদের সংখ্যা যদি অনেক বেড়ে যায় তখন একসাথে অনেক পাখি আত্মহত্যা করে নেয়। অপরকে বাঁচানোর জন্যও অন্য পশুরা এগিয়ে আসে। আফ্রিকার এক জঙ্গলে একবার একটা সিংহীকে অনেকগুলো মোষ গুঁতিয়ে মেরে দিয়েছে। তারপর দেখা গেলে একটা সিংহের বাচ্চা বনরক্ষীরা যেখান দিয়ে যাতায়াত করে তার পাশের একটা ঝোপের আড়ালে এমন ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখল যাতে বনরক্ষীদের নজরে পড়ে। বনরক্ষীদের নজরে পড়তেই সিংহের বাচ্চাটা কায়দা করে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। বনরক্ষীরা বন্য পশুদের রক্ষার জন্যই কাজ করে, ওরা গুলি করবে না। মাঝে মাঝে সিংহের বাচ্চাটা একটু করে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে ওরা আসছে কিনা। বনরক্ষীরা বুঝে গেল সিংহটা আমাদের কিছু ইশারা করছে। এই করে করে ওদের আড়াইশ তিনশ মিটার নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে বনরক্ষীরা দেখে একটা সিংহী মরে পড়ে আছে। তাকে মোষগুলো গুতিয়ে মেরে দিয়েছে। বনরক্ষীরা বলছে, সিংহের বাচ্চাটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, কারণ সে জানে মানুষ তাকে দেখলেই গুলি করে দিতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা অনুকম্পা এসেছে যে সিংহীটাকে যদি রক্ষা করা যায়, সেতো জানে না যে সিংহীটা মারা গেছে, কিন্তু বুঝেছে মানুষই তাকে সাহায্য করতে পারবে। পশুও তো অপরের সেবা করছে।

তাহলে মানুষের মধ্যে এমন কি গুণ আছে যেটা পশুপাখির মধ্যে নেই? প্রকৃতি সবাইকে দিয়ে সব কিছু করায় কিন্তু মানুষ যেটা পারে সেটা অন্য কোন প্রানী পারে না, তা হল, non reaction, স্বামীজীর কথা, whatever a man can do animal, birds can do equally them, it is only the power of non-reactive which is unique in human beings। Non-reaction মানে কক্ষণ কোন পশু পাখি

হবে না যে নিজের মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে যেখানে reaction হবে না। রিক্সাওয়ালা যদি আমার সাথে অভদ্র ব্যবহার করে আমি তাকে উল্টে গালাগাল না দিতে পারি কিন্তু মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসবে। রিক্সাওয়ালাকে আমি নাও কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারি কিন্তু বাড়িতে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে কিছু বললে তার মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসবেই, সেখানেও যদি কোন প্রতিক্রিয়া না করা হয়, বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায় সবাই সেখানে প্রতিক্রিয়া করবেই। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী নিজের মনকে এমন নিয়ন্ত্রণ করে নেন যে তিনি non-reactionএ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। এই non-reactionটাই মোক্ষ। স্বামীজী মোক্ষকে define করছেন non-reaction, এটাই স্বামীজীর বিশেষত্ব। যেটা একটা fact ওইটাকে দিয়েই explain করছেন। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই non-reactionএর কথাই বলছেন *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ*, সমুদ্রে যখন বিভিন্ন জলরাশি প্রবেশ করে তখন সমুদ্র কোন react করে না, *এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ*, এটাই ব্রহ্মজ্ঞান, এটাই মোক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষর মানে the power to hold your mind back, মন আর react করবে না। এটাই মানুষের বিশেষত্ব, একমাত্র মানুষই এই জগতের সব কিছুতেই non-reaction থাকতে পারে, non-reactionটাই ব্রাহ্মী স্থিতি। যত সে react করবে তত সে পশুপাখির মত আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের মধ্যে মুখ গুজে পড়ে থাকবে। অবধূত এটাই বলছেন মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, একমাত্র মনুষ্য যোনিতেই শরীর আর মনের সাহায্য নিয়ে মনকে non-reactive অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমাদের মনকে নিয়েই সব কিছু, মন বহির্জগতকেও নিচ্ছে, অন্তর্জগতকেও মন নিচ্ছে। বহির্জগতে যখন থাকে তখন আমরা বলি তার মধ্যে এখন রজোগুণ প্রবল আর মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে গেলে সত্ত্বগুণী হয়ে যায়। তমোগুণে থাকলে কোন কাজই করতে চায় না, চুপচাপ পড়ে থাকতেই তার ভালো লাগে। বেশির ভাগ লোকের মনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে মন যখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তখন মনকে যদি বলা হয় এমনটি করা যাবে না, মন তখন আর ওদিকে যাবে না।

বেদান্ত শেখার শেষ কথা হল, *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্*। ভূমা মানে বৃহৎ, বৃহতেই আনন্দ, ভূমা মানে সেই ব্রহ্ম, যেখানে গিয়ে মন ঠিক ঠিক শান্তি পায়। বেদান্তে সাধনার দিকে এগোন বা সিদ্ধিতে পৌঁছান মানে *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ ন সুখম্ নাস্তি অল্পমেব*। ছোটতে কখন সুখ হয় না। সুখ যদি পেতে চাও তাহলে বৃহতে যাও। বৃহৎ মানেই মনকে আরও উপরে নিয়ে যাওয়া। যেদিন আমি কিছু শিখলাম না, মনকে বড় করা গেল না, সেই দিনটা আমার জন্য বৃথা গেল। আমাদের তাই প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক দিন নিজেকে বড় করা, বড় করা মানে মনকে উঁচুতে নিয়ে যাওয়া। যেদিন আমি বিশেষ কিছু একটা করলাম না, বিশেষ কিছু শিখলাম না, মনকে বিশেষ কোন উচ্চাবস্থায় রাখলাম না, চব্বিশটি ঘন্টাই আমার সেদিন বৃথা গেল। যদি গতকালের দিকে ফিরে তাকাই, আমরা কি গতকাল এমন কিছু করেছি যে আজকে আমরা নিজেদের আরও বেশি পবিত্র মনে করছি? গীতা, উপনিষদ বা চণ্ডীর একটা শ্লোক কি মুখস্ত করেছি যা থেকে মনে করছি আমাদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে? নতুন এমন কিছু কি অধ্যয়ন করেছি যে মনে করছি আমাদের জ্ঞান বেড়েছে, চরিত্রের বিকাশ হয়েছে? এমন কোন মানুষের সেবা করেছি যে মনে করতে পারছি আমরা নিজেদের আরও বৃহতের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছি বা মনের মধ্যে উদারতার ভাব জেগেছে? দেখছি কিছুই করিনি, গতকালটা বাদ দিয়ে গত এক মাসেও হয়ত কিছুই করিনি। কোথায় সময়ে গেছে? ঘোর তমোগুণে। ঘোর তমোগুণে এই সংসারকে দিনগত ভাবে আমরা চালাচ্ছি। রজোগুণে বিশেষ চেষ্টা করা হয়, সেখানেও সেই রকম কিছুই নেই। আর সত্ত্বগুণের কোন প্রশ্নই নেই, সত্ত্বগুণে পুরো নির্বিকার থাকে। বেদান্ত আমাদের কাছে দেখতে চাইবে তুমি আরও বৃহৎ হয়েছ কিনা, আরও মহৎ হয়েছ কিনা। মহৎ হওয়ার যে পদ্ধতি, ধাপে ধাপে আমরা যে মহৎ হওয়ার দিকে এগোচ্ছি,

এটাই বেদান্ত। এগিয়ে যাওয়ার শেষ ধাপ হল, ব্রহ্মে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা কি সেই ভাবে চেষ্টা করছি? করছি না। এটা হল একটা দিক।

এর অন্য দিক হল, মন যখন কোন কিছু শেখে বা মনের উপর যখন কোন আঘাত আসে বা প্রতিঘাত যখন হয়, যেমন কুকুরকে একট ঢিল মারা হল, ওখানে একটা আঘাত পড়ল, তখন কুকুরটা একটা প্রতিঘাত করে, প্রতিঘাত স্বরূপ সে একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করে ঐ অশান্তিটাকে ঠিক করে। নিউটনের থার্ড ল বলছে, every action has equal and opposite reaction, equal হবে আর opposite হবে। নিউটনের থার্ড ল যেমন পদার্থ জগতে কাজ করে ঠিক তেমনি মনের জগতেও কাজ করে, কারণ মনটাও একটা পদার্থ। মন সব কিছুতেই প্রতিক্রিয়া করবে, ঘুমের মধ্যে বাইরে থেকে কিছু আসছে না কিন্তু স্বপ্ন খেলা করতে থাকে। আর জাগ্রত অবস্থায় যদি ধ্যান করতে বসে তখনও মন নিজের মত চলতে থাকে, কারণ তখন ভেতর থেকে তার সিগনালস্ গুলো আসতে থাকে। পুকুর শান্ত, একটা পাথর ছুড়লে শান্ত পুকুর অশান্ত হয়ে ওঠে। পুকুরে যদি প্রচুর মাছ থাকে মাছগুলো সব সময় এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে, লাফাতে থাকে, পুকুরের জল তখনও অশান্ত হয়ে ওঠে, সব সময় তরঙ্গ হতে থাকবে। আমাদের মনও ঠিক তাই, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাইরে থেকে ঢিল ছুড়ছে আর ভেতরে যে চুনো থেকে বড় মাছ আছে সেগুলো তোলপাড় মাচিয়ে যাচ্ছে। যেখানে পদার্থ আছে সেখানেই এই তোলপাড় হবে, একটা যে ছোট্ট বালিকণা সেখানেও তাই হবে, যেমনি ওর উপর কোন ক্রিয়া হবে তেমনি সে প্রতিক্রিয়া করবে। গাছাপালা, পশুপাখিতে এই প্রতিক্রিয়াটা আরও ভালো বোঝা যাবে। হয়ত তাদের অস্তিত্বটাই নাশ হয়ে গেল। তফাৎ হল ওরা নিউটনের থার্ড ল পুরোপুরি পালন করে। আমাদের মনও স্প্রিংএর মত চলে, কেউ যদি একটা মন্দ কথা আমাকে বলে পাঁচটা কথা তার মুখের উপর শুনিয়ে দেব, দশ খানা কথা ভাবব যে এই কথাগুলোও বললে ভালো হত, আর পনেরটা কথা স্বপ্নে দেখব। ঋষিদের মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য তাঁকে যদি কেউ কোন কথা বলে তখন উনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমার ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া হতে শুরু হয়ে গেছে। হয়ত একটা দুটো কথা বলেও দিলেন কিন্তু তিনি সচেতন যে আমি কি বলছি। আমাদের মধ্যে এই সচেতনতা থাকে না, যতক্ষণে একটা কথা ছুড়ছে ততকক্ষণেই একটা কথা প্রতিক্রিয়া রূপে মুখ থেকে চড়াং করে বেরিয়ে আসে। ঋষিরা ধীর স্থির থাকেন, অনেক সময় চুপ থেকে যান। চুপ থাকলেও ভেতরে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যাঁরা পরমহংস, অত্যন্ত উচ্চমানের ঋষি, তাঁদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। একটা পাথর পড়লে ছোট্ট যে একটা তরঙ্গ উঠবে সেটাও তাঁদের হয় না। সাধারণ মানুষের এটাই বৈশিষ্ট্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন জীবের ক্ষমতা নেই যে প্রকৃতি তাকে ধাক্কা মারবে আর সে প্রতিক্রিয়া করবে না। নিউটনের নিয়ম সব জায়গাতে প্রযোজ্য হবে, প্রত্যেক পদার্থে প্রযোজ্য হবে, প্রত্যেক প্রানীর জীবনে প্রযোজ্য হবে। ব্যতিক্রম শুধু একটা জায়গাতেই হয়, যিনি পরমহংস হয়ে গেছেন তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, নিউটনের থার্ড ল সেখানে কোন কাজ করে না।

সব কিছু বলার পর অবধূত বলছেন, বুঝলে রাজন্ এক গুরুতে কখন হয় না, অনেক গুরু লাগে। আমার তো চব্বিশ জন গুরু লেগেছিল সব শিক্ষা পেতে। যদু রাজার মূল প্রশ্ন ছিল, মহাশয়, আপনি তো কাজকর্ম করেন না অথচ আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি প্রচণ্ড জ্ঞানী, এই জ্ঞান আপনি কোথা থেকে পেলেন? অবধূত তখন বলছেন, *ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্। ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।।১১/৯/৩১।।* আমাদের শাস্ত্রের শেষ কথা, অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আছেন। *গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ*, এই জিনিসটাকেই ঋষিরা নানান ভাবে গান করেছেন অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করবার বহু পথের কথা বলে গেছেন। ঠাকুর বলছেন ঋষিদের সনাতন ধর্মই থাকবে বাকি সব ধর্ম আসবে যাবে। অনেক মনে করেন বাকি

ধর্ম বলতে ঠাকুর খ্রীশ্চান, ইসলাম এইসব ধর্মের কথা বলছেন, কিন্তু তা নয়। তখনকার দিনে ব্রাহ্ম সমাজ এবং আরও যে নানা রকমের মতের কথা বলা হচ্ছিল, ঠাকুর এখানে তাদেরকে নিয়ে বলছেন। বিশ্বে কয়েকটা ধর্ম মূল ধর্ম, যেমন খ্রীশ্চান, ইসলাম, পার্সি, জহুদি এদিকে জৈন, বৌদ্ধ এগুলো মূল ধর্ম। ইদানিং কালে অনেক বলবে আমাদের মতের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিও ঋষি ছিলেন, যুক্তিতর্ক করতে গেলে তারাও বুঝিয়ে দেবে। আমরা ঐ বিতর্কে যাচ্ছি না। আমরা শুধু পাঁচশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ধর্মকেই নিচ্ছি। আজকে সনাতন ধর্ম বলতে আমরা যে হিন্দু ধর্মকে বলছি, এই সনাতন ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরাট তফাৎ আছে। সব ধর্মই এক কথা বলছে, সত্য মানে এটা। একমাত্র হিন্দু ধর্ম বলছে, ঐ সত্যকে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে একরূপতা নেই। জহুদিরা জানে আমরা এক, খ্রীশ্চানরা জানে আমরা এক, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যতই মারামারি করুক কিন্তু কোরানের নামে, আল্লার নামে সবাই আমরা এক। হিন্দুরা কোন দিন কোন কিছুতে গিয়ে এক হবে না। কেন হবে না, তার কারণ এখানে বলছেন *ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ*, আমাদের যে হাজার হাজার ঋষিরা ছিলেন তাঁরা এই অদ্বৈত ব্রহ্মের পরমতত্ত্বকে বলছেন অদ্বয়, ওখানে কোন ভেদ নেই, ওই একটাই আছে। মুসলমানরাও তাই বলছে, ওই এক আল্লাই আছেন, খ্রীশ্চানরাও একই কথা বলছে, God is one, তাহলে তফাৎটা কোথায়? হিন্দুদের কাছে পরমতত্ত্ব যেটা তিনি অনন্ত, ব্রহ্ম মানেই অনন্ত। ওনারা বলে দিলেন তিনি অনন্ত, আল্লা অনন্ত, গড অনন্ত তখন ওটাই পরিভাষা হয়ে গেল। কিন্তু সনাতন ঋষিদের যে পরম্পরা, ঋষিরা কি করলেন, অনন্তকে অনন্ত ভাবে ব্যক্ত করলেন, ফলে সব বর্ণনাগুলো পাল্টে যায়। কিন্তু সব বর্ণনার মধ্যে সেই অনন্তের ভাবটা থেকে যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে যখন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, যেখানে শ্রীরামচন্দ্রও অনন্ত। দুটো অনন্ত তো কখনই হতে পারে না? এটাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রীশ্চানরা যখন গডকে নিয়ে বর্ণনা করছে, মুসলমানরা যখন আল্লাকে নিয়ে বর্ণনা করছে, ওনারা ঠিক সেইভাবেই বর্ণনা করছে, যেভাবে বেদে বর্ণনা করা হয়। সমস্যা হল, ওদের একজনই ঋষি, যীশু আর মহম্মদ। যীশু আর মহম্মদ যা বর্ণনা করে দিয়ে গেছেন তার বাইরে আর কিছু হবে না। সেই দিক থেকে নিতে গেলে হিন্দু ধর্ম অনেকগুলো ধর্মে পাল্টে যাবে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম জিনিসটাকে সেভাবে দেখে না, ওনাদের বক্তব্য, যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা বলেন ব্রহ্মই কৃষ্ণ হয়েছেন বা কৃষ্ণই ব্রহ্ম হয়েছেন, এগুলো হল দার্শনিক পণ্ডিতদের বিরাট বড় আলোচ্য বিষয়। বেদে যে ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়েছে, তিনি অখণ্ড, সেই অনন্তকে বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন, বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন, গান করেছেন। তাই তাঁর ভাব অনন্ত, একটা পাখির মধ্যেও কেউ সেই অনন্ত ব্রহ্মকে দেখে সাধনা করতে পারে, একটা গাধার মধ্যেও সেই অনন্তকে দেখে গাধারই সাধনা করতে পারে। এতে অবাকেরও কিছু নেই আর ভুলেরও কিছু নেই। এবার যিনি একজন গুরুর কাছে যাবেন, গুরু তাঁকে সেটাই বলবেন যেটাতে তিনি সিদ্ধি পেয়েছেন। কিন্তু পুরো জ্ঞান সেটাতে আসে না। সেইজন্য বলছেন *ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্*, একজন গুরুর কাছ থেকে যদি জ্ঞান নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু জ্ঞান তার পুরো হবে না। ভাগবতের এই শ্লোকটি আমাদের মত করে নিলে তখন হবে, গুরু একজনই হবেন কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে। কিন্তু ভাগবতের যাঁরা ভাষ্যাদি রচনা করেছেন তাঁদের বক্তব্য হল, নিজের পরিস্কৃত বুদ্ধিটাও লাগাতে হয়। এখানে উপগুরু হল বুদ্ধি। নিজের বুদ্ধি লাগালে সেখান থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়া যাবে। কথামৃত পড়ার সময় খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঠাকুরও অনেক জায়গায় বলছেন, অমুক জায়গায় ওরকমটি দেখে আমার এই রকমটি মনে হল। ঠাকুর যখন বলছেন, আমার এই রকমটি মনে হল, তখন ওটাই উপগুরু হয়ে যাবে। এই ধরণের জিনিস আমাদের সবারই হয়, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। যত সাধনা করবে তত তার মন পরিষ্কার হবে, মন যত পরিষ্কার হবে মনের গ্রহণ করার ক্ষমতা তত বাড়বে। মনের গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়লে নানান কথা যে শুনছে, নানান ভাব যে দেখছে, সেখান

থেকে সে অনেক কিছু শিক্ষণীয় জিনিস গ্রহণ করতে পারবে। গুরু সব সময় যে শিক্ষা দেন, ওই শিক্ষাটা হল পরমতত্ত্বের শিক্ষা। জগৎ চালানোর শিক্ষা গুরু কোথা থেকে দেবেন! যেমন ঠাকুর বলছেন, অনন্ত আকাশ, পাখি উড়ে যাচ্ছে। তার মানে, তার কোন শেষ নেই যত জ্ঞান লাভ করবে তত সে জিনিসটাকে দেখতে পারবে। সোনা জিনিসটাকে জানতে হলে আমি যদি একজন রসায়নবিদের কাছে যাই বা একজন সুবর্ণকারের কাছে গিয়ে সোনা দেখে নিলে জেনে যাব সোনা কাকে বলে। কিন্তু সোনা দিয়ে কত রকমের গহনা বানানো যেতে পারে তার ইতি করা যাবে না। ঠিক তেমনি গুরুর কাছে পরমতত্ত্বটা জেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ঐ পরমতত্ত্বের যে বিভিন প্রকাশ এই সংসারে আমরা দেখছি, এই প্রকাশের ইতি করা যায় না। ঐ জিনিসটাকে জানার জন্য আমাদের একাধিক গুরুর প্রয়োজন। অনেক গুরুর কাছে গেলে ঠিক সেভাবেও শিক্ষা পাওয়া যাবে না, শেষ পর্যন্ত নিজের ভেতর থেকেই শিক্ষাটা আসে, তার জন্য দরকার পরিশ্রুত মন, মন যত পরিষ্কার হবে, মন যত বিস্তার লাভ করবে, মন থেকে তত শিক্ষা পাওয়া যাবে। এটাই এই অধ্যায়ের, অবধূত গীতার শেষ কথা। আমার কত গুরু ছিল, কোন কোন গুরুর কাছ থেকে কি কি শিক্ষা পেয়েছি আমি তোমাকে বলছি। এই হল অবধূতের চব্বিশ গুরুর মূল তাৎপর্য।

সেইজন্য মানুষকে সব সময় পরমার্থ সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। পরমার্থ সাধনের জন্য চাই উন্নতমানের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ মানুষ কোথায় পাবে? তার নিজের ভেতর থেকেই সে শিক্ষা পাবে। সব সময় সজাগ ও সচেতনতার দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকালেই পরমার্থ সাধনের অনেক রসদ পেয়ে যেতে পারে। দত্তাত্রেয়র মধ্যে এই স্বচ্ছ ও সজাগ দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এটাই হল চব্বিশ গুরুর মূল কথা।